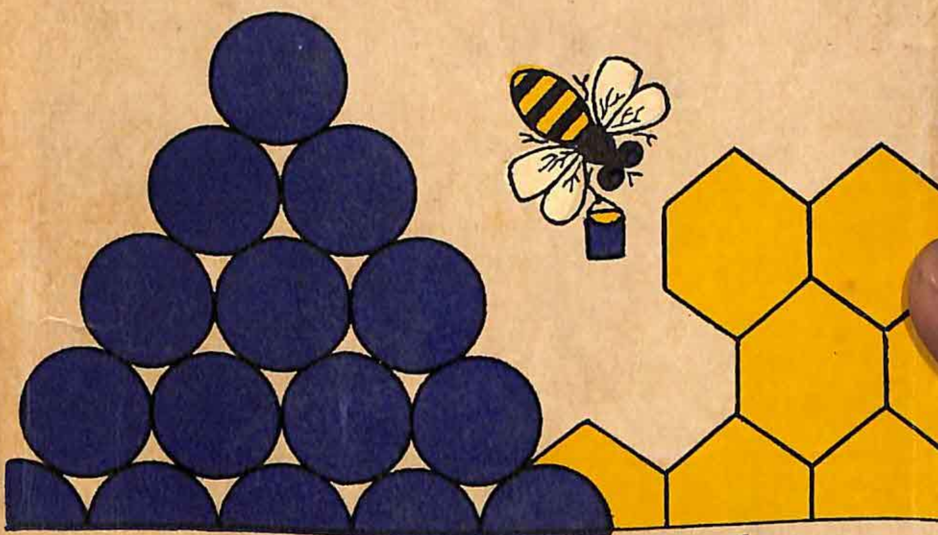
২য় খণ্ড সকলের জন্য পদার্থবিদ্যা

ল. লানদাউ আ. কিতাইগারোদস্কি



কেলাসের গঠন

ল. লানদাউ
আ. কিতাইগারোদস্কি

কেলাসের গঠন

অনুবাদ : শান্তি শেখর সিংহ

মীর প্রকাশন মস্কো
মনীষা গ্রন্থালয় কলিকাতা

Физика для всех

Книга 2

Л. Д. Ландау
А. И. Китайгородский

Молекулы

Издательство «Наука»

На языке бенгали

চতুর্থ রুশ সংস্করণের ভূমিকা

এই বইটির নামকরণ করা হয়েছে 'কেলাসের গঠণ'। লেভ ল্যাণ্ডাও এবং আলেকজাণ্ডার কিটাইগোরোড্স্কি রচিত "পদার্থবিদ্যা—সকলের জন্য" নামে পূর্বে প্রকাশিত একটি বইয়ের দ্বিতীয়াংশ থেকে অনেকগুলি অধ্যায় এই বইয়ের মধ্যে অবিকৃত অবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই বইটির মধ্যে প্রধানতঃ বস্তুর গঠনকে বিভিন্ন দিক থেকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। তবে আলোচনার সময়ে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক ডিমক্রিটসের পরমাণুর অবিভাজ্যতা সম্পর্কের ধারণাটি আপাততঃ রাখা হয়েছে। অবশ্য অণুর গতি সম্পর্কিত সমস্যাগুলিকেও আলোচনা করা হয়েছে, কারণ সেগুলিই তাপীয় গতি সম্পর্কে আধুনিক ধারণার ভিত্তি। দশান্তর (phase transition) সম্পর্কিত সমস্যাগুলির বিষয়েও এই পুস্তকে মনোনিবেশ করা হয়েছে।

"পদার্থবিদ্যা—সকলের জন্য" বইটির পূর্বতন সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পরবর্তী বৎসরগুলিতে, অণুর গঠন এবং তাদের মিথষ্ক্রিয়া (interaction) সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিমধ্যে এমন অনেক আবিষ্কার হয়েছে যার ফলে অণুর গঠন এবং তার ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে যে ফাঁক ছিল তা অনেকাংশে পূরণ হয়ে গেছে। এজন্য বর্তমান পুস্তকে আমি বেশ কিছু নতুন বিষয় সংযোজন করতে প্ররোচিত হয়েছি।

আমি মনে করি, সাধারণ তথ্য-বিশিষ্ট প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকগুলিতে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন বা কার্বনডাইঅক্সাইডের হ'তে অধিকতর জটিল অণুগুলি সম্পর্কে বিশেষ তথ্য সংযোজন করা অনেক পূর্বেই উচিত ছিল। এখনো পর্যন্ত পদার্থ-বিদ্যার অধিকাংশ শাখার লেখক পরমাণুবিন্যাসে জটিলতর অণুগুলি সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন নি। কিন্তু এই সব অতিকায় অণুগুলি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন সংশ্লেষিত দ্রব্য হিসেবে সুপরিচিত হয়েছে। প্রোটিন অণু এবং নিউক্লিক অ্যাসিড-এর ভাষা অনুসারে জীবন্ত বস্তুর কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে আণবিক জীববিজ্ঞান নামে বিজ্ঞানের নতুন এক শাখারও পত্তন করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংক্রান্ত সমস্যাগুলিও বস্তুতঃ এযাবৎ অহেতুক বর্জিত হয়ে এসেছে। এই সব বিক্রিয়াগুলি অণুগুলির পারস্পরিক সংঘাত এবং তার ফলে সৃষ্ট পুনর্বিন্যাসের মতো ভৌত প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

নিউক্লিয় বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করা নিঃসন্দেহে অনেক বেশী সহজ হয় যদি ছাত্র বা পাঠক ইতিমধ্যেই অণুর ক্ষেত্রে অনুরূপ ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অবহিত হয়ে থাকেন।

পূর্বতন "পদার্থবিদ্যা—সকলের জন্য" বইটির কতকগুলি অংশ এই সিরিজের পরবর্তী বইগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা বেশী যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছে। যেমন আণবিক বর্ণবিদ্যা সংক্রান্ত অধ্যায়ে শব্দবিজ্ঞান সম্পর্কে বিষদ আলোচনা না করে এই পুস্তক কেবলমাত্র সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে সঙ্গে যুক্ত তড়িৎচুম্বকীয় প্রপঞ্চ (phenomenan) প্রসঙ্গের, তরঙ্গ সম্পর্কীয় আলোচনাকে আপাততঃ মুলতুবি রাখা হয়েছে।

"পদার্থবিদ্যা—সকলের জন্য" সিরিজের নতুন সংস্করণের চারটি বই (ভৌত-বস্তু, কেলাসের গঠণ, ইলেকট্রন এবং ফোটন ও নিউক্লিয়াস) সামগ্রিকভাবে পদার্থবিদ্যার বুনিয়াদী বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোকপাত করবে।

এপ্রিল ১৯৭৮ এ. আই. কিটাইগোরোড্স্কি

বিষয়সূচী

চতুর্থ মুদ্রণ সংস্করণের ভূমিকা

৬. আণবিক বলবিদ্যা

৭. অণুর পরিবর্তন

৮. তাপগতিবিদ্যার বা থার্মোডিনামিক্সের নীতিসমূহ

৯. অতিকায় অণু

১· বিশ্বজগতের সংগঠক উপাদানসমূহ

মৌল (Elements) ঃ

আমাদের চারপাশের জগৎ কি দিয়ে তৈরী ? আমরা এই প্রশ্নের প্রথম যে উত্তর পাই তার উৎপত্তি 2500 বছরেরও বেশী আগে প্রাচীন গ্রীস দেশে।

প্রথম দৃষ্টিতে উত্তরগুলি আমাদের কাছে যৎপরোনাস্তি আশ্চর্যজনক বলে মনে হবে এবং প্রাচীন ঋষিদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা পাঠকদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হলে প্রয়োজন হবে দিস্তে দিস্তে কাগজ খরচ করার—যেমন থেলিজ (Thales) ঘোষণা করেছিলেন সবকিছুর উপাদানই জল, অন্যাক্সিম্যান্ডর (Anaximander) বলেছিলেন বিশ্বজগৎ বায়ু থেকে সৃষ্ট আবার হেরক্লিটস (Heraclitus) মনে করতেন সব কিছুর উৎপত্তি হয়েছে আগুন থেকে। এইসব ব্যাখ্যার অসামঞ্জস্য-তার জন্যে পরবর্তী কালে "জ্ঞানের পূজারীরা" (এইভাবেই ফিলজফার শব্দটি অনূদিত হয়) বাধ্য হয়েছিলেন মৌলিক উপাদানের সংখ্যা অর্থাৎ প্রাচীন অর্থে মৌলের সংখ্যা বাড়াতে। এমপেডক্লিজ (Empedocles) ঘোষণা করলেন সর্বমোট চারটি মৌলের উপস্থিতির কথা ঃ মাটি, জল, বাতাস এবং আগুন। এই সব অনুমানে শেষ সংশোধন আনলেন অ্যারিস্টটল (Aristotle)।

অ্যারিস্টটলের মতে, সব বস্তুই একটিমাত্র উপাদানে গঠিত, কিন্তু এই উপাদান বিভিন্ন গুণ অর্জন করতে পারে। এই ধরনের অবস্তু মৌলের সংখ্যা চার ঃ শীতল, উষ্ণ, আর্দ্র এবং শুষ্ক। জোড়বন্দী অবস্থায় কোন বস্তুতে আরোপিত হলে অ্যারিস্টটলের মৌলগুলিই এমপেডক্লিজের মৌলগুলিকে উৎপন্ন করে। যেমন শুষ্ক এবং শীতল বস্তু থেকে মাটি ; শুষ্ক এবং উষ্ণ থেকে আগুন ; আর্দ্র এবং শীতল থেকে জল এবং পরিশেষে আর্দ্র এবং উষ্ণ বস্তু থেকে বাতাস।

তবু কতগুলি প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধে দেখা দেওয়ায় প্রাচীন দার্শনিকরা এই চারটি মৌলের সঙ্গে এক অতিরিক্ত 'স্বর্গীয় অতিসত্ত্বা' যোগ করেন। এই অতিসত্ত্বাকে এমন একজন ঈশ্বর-পাচক ভাবা চলে যার কাজ বিভিন্ন মৌলকে একসঙ্গে পাক করা। নিঃসন্দেহে ভগবানের দোহাই দিয়ে যে কোন রকম সন্দেহজনক ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করা চলে।

কিন্তু বহুদিন—প্রায় অষ্টাদশ শতক যাবৎ কেউই সন্দিহান হয়ে এ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে সাহস পায়নি। অ্যারিস্টটলের মতামতগুলিকে গীর্জা স্বাগত

জানাতো এবং এর যথার্থতা সম্পর্কে যে কোনো সন্দেহকে অসিদ্ধ বলে গণ্য করতো।

কিন্তু তবু সন্দেহের কথা উঠলো। সেগুলি এল অ্যালকেমি থেকে। সুদূর অতীত সম্পর্কে পুঁথিপত্র পড়ে যেটুকু জানতে পারা যায় তাতে প্রতীয়মান হয় যে সে যুগেও মানুষ জানতো আমাদের চারপাশের সমস্ত বস্তু একে অন্যাতে রূপান্তরিত হয়। দহন, তাপপ্রয়োগে আটকে যাওয়া (Sintering) কিম্বা ধাতুর গলন ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলিও জানা ছিল।

মনে হতে পারে যে উপরোক্ত বিষয়গুলি অ্যারিস্টটলের বক্তব্যের বিরোধী নয়। পরিবর্তনের সময় মৌলগুলির শুধুমাত্র তথাকথিত 'মাত্রায়' পরিবর্তন ঘটছে। সমস্ত বিশ্বজগৎ শুধুমাত্র চারটি মৌল দিয়ে গঠিত হয়ে থাকলে একটি বস্তুর অন্যাতে পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনাও অত্যন্ত বেশী। আমাদের শুধুমাত্র প্রয়োজন একটি বস্তুকে অন্য বস্তু থেকে পাওয়ার গোপন তত্ত্ব খুঁজে বের-করা।

সত্যই সোনা তৈরী করার কিম্বা যে 'পরশমণি' তার অধিকারীকে সম্পদ, শক্তি আর অনন্ত যৌবন দান করে সেই 'পরশমণি' খুঁজে বের করার সমস্যা দারুণ আকর্ষণীয়। সোনা তৈরী করার এবং এক বস্তুকে অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত করার ক্ষমতাবিশিষ্ট 'পরশমণির' বিজ্ঞানকে প্রাচীন আরববাসী অ্যালকেমি বলে উল্লেখ করতো।

শতাব্দীর পর শতাব্দী অসংখ্য মানুষের মেহনত এই সমস্যা সমাধানের জন্যে ব্যয়িত হয়েছে। অ্যালকেমিস্টরা সোনা তৈরী করার পদ্ধতি শিখতে পারেনি, খুঁজে বের করতে পারেনি কোনো 'পরশমণিকে', কিন্তু সেই ব্যর্থতা তারা পূর্ণ করেছে বস্তুর পরিবর্তন সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে। আবার শেষ পর্যন্ত সেই সব সংগৃহীত তথ্যই অ্যালকেমির মৃত্যুবাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে বহু মানুষের কাছে এটা স্পষ্ট হয়েওঠে যে মৌলিক পদার্থ বা মৌলের সংখ্যা চারের তুলনায় অনেক অনেক বেশী। দেখা যায় যে পারা, সীসা, গন্ধক, সোনা, অ্যান্টিমনি ইত্যাদি এমন ধরনের পদার্থ যা বিয়োজিত করা যায় না ; কারুর পক্ষেই বলা সম্ভব নয় যে এগুলি বিভিন্ন মৌল দিয়ে গড়ে উঠেছে। বরং সকলেই এগুলিকে পার্থিব মৌলগুলির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করতে বাধ্য হয়েছে।

1661 খ্রীস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে রবার্ট বয়েল (1627—1691) 'সন্দেহবাদী রসায়নবিদ' নামে একটি বই প্রকাশ করেন। এই বইতে মৌল সম্পর্কে এক সম্পূর্ণ নতুন সংজ্ঞা দেখতে পাওয়া যায়। মৌলকে আর অ্যালকেমিস্টদের মতো এক কাল্পনিক অবস্তু বলে গণ্য করা হল না। সব মৌলকেই গ্রহণ করা হল পদার্থ বলে, যা বিভিন্ন বস্তুর সংগঠক উপাদান। এই বক্তব্য মৌলের আধুনিক সংজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

বয়েলের দেওয়া মৌলের তালিকা দীর্ঘ নয়। কিন্তু তার তালিকায় অন্যান্য সঠিক মৌলের মধ্যে আগুনও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এমনকি রসায়নশাস্ত্রের জনক হিসেবে খ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী অ্যান্তন লোরাঁ ল্যাভোয়াসিয়ের (1743—1794) তালিকাতেও প্রকৃত মৌলগুলির পাশাপাশি স্থান পেয়েছিল 'তাপদায়ী' এবং 'আলোকদায়ীর' মতো অবোধ্য জিনিস। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে জ্ঞাত মৌলের সংখ্যা ছিল পনেরটি। শতাব্দী পূর্ণ হওয়ার সময়েই সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় পঁয়ত্রিশটিতে। অবশ্য একথা সত্য যে এগুলির মধ্যে কেবলমাত্র তেইশটি ছিল প্রকৃত অর্থে মৌল, অবশিষ্টগুলি হয় অস্তিত্ববিহীন কিম্বা কষ্টিক সোডা আর কষ্টিক পটাশের মতন পদার্থ, যা পরে যৌগ বলে প্রমাণিত হয়।

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগের আগেই রসায়নশাস্ত্রের বইগুলিতে পঞ্চাশটির বেশী মৌলের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

শ্রুতকীর্তি রুশ বৈজ্ঞানিক ডিমিত্রি মেণ্ডেলিফের (1834-1907) পর্যায়সূত্র পরবর্তী কালে অনাবিষ্কৃত মৌলগুলির সন্ধানের গবেষণায় বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এই মুহূর্তে ঐ সূত্র সম্পর্কে বেশী বলা বাড়াবাড়ি হবে। শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে এই সূত্রের সাহায্যে মেণ্ডেলিক অনাবিষ্কৃত মৌলগুলি সম্পর্কে কোন দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করা উচিত তা দেখিয়ে গেছেন।

বিংশ শতক সুরু হওয়ার সাথে সাথেই প্রকৃতিতে প্রাপ্ত মৌলগুলির প্রায় সব কটিকেই আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছিল।

পরমাণু ও অণু (Atoms and Molecules)

প্রায় 2000 বছর আগে প্রাচীন রোমে একটি মৌলিক কবিতা রচিত হয়। কবিতার লেখক রোমান কবি লুক্রিশিয়স। কবিতাটির নাম 'দ্রব্যের রূপ সম্পর্কে'।

কবিতাটিতে লুক্রিশিয়স ছন্দোবদ্ধ ভাষায় বিশ্ব জগৎ সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক ডিমক্রিটসের মতামত ব্যক্ত করেন।

মতামতগুলি কি? সেগুলি অতিক্ষুদ্র, অদৃশ্য কণিকা সম্পর্কে বর্ণনা, যা দিয়ে আমাদের এই গোটা জগৎটা গড়ে উঠেছে। বহু প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করার পর ডিমক্রিটস সেগুলি সম্পর্কে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছিলেন।

উদাহরণ স্বরূপ জলের বিষয়টি নেওয়া যাক। উপযুক্ত মাত্রায় উত্তপ্ত করলে তা বাষ্পীভূত হয়ে অদৃশ্য হয়। কিভাবে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা চলে? স্পষ্টতঃ জলের ঐ ধর্ম ও তার আভ্যন্তরীণ গঠনের ওপর নির্ভরশীল।

কিম্বা ধরা যাক ফুলের গন্ধের বিষয়টি, কেন আমরা দূর থেকে ফুলের গন্ধ পাই?

এই ধরনের বিভিন্ন প্রশ্ন সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে ডিমক্রিটস নিশ্চিৎ হন যে

বস্তুকে কঠিন বলে মনে হলেও আসলে তা অতিক্ষুদ্র কণিকা দিয়ে তৈরী। বিভিন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে এই ধরনের কণিকার রূপও বিভিন্ন, কিন্তু সেগুলি এতোই ছোট যে চোখে দেখা যায় না। আর সে জন্যেই সব বস্তু আমাদের কাছে কঠিন বলে প্রতীয়মান হয়।

এই ধরনের অতিক্ষুদ্র কণিকা, যাদের আর বিভাজন করা যায় না এবং যাদের সমবায়ে জল এবং অন্যান্য সব দ্রব্য গড়ে উঠেছে, ডিমক্রিটস তাদের নাম দেন পরমাণু বা অ্যাটম (গ্রীক atomos শব্দের অর্থ অবিভাজ্য থেকে নেওয়া)।

চব্বিশ শতক পূর্বের এই সব প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পরবর্তী বহুকাল বিস্মৃত অবস্থায় ছিল। এক হাজার বছরেরও বেশী সময় বিজ্ঞান-জগৎকে দাবিয়ে রেখেছিল অ্যারিস্টটলের ভুল শিক্ষার প্রভাব।

প্রত্যেক পদার্থকেই অন্য পদার্থে পরিণত করা চলে, এই ঘোষণা করে অ্যারিস্টটল সুস্পষ্টভাবে পরমাণুর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেন। তিনি শেখান, যে কোনো বস্তুকেই অন্তহীন বিভাজন করা চলে।

1647 খ্রীস্টাব্দে ফরাসী বিজ্ঞানী গ্যাসেন্দি (1592—1655) একটি বই প্রকাশ করেন যার মধ্যে তিনি সাহসের সঙ্গে অ্যারিস্টটলের ভুল শিক্ষাকে অস্বীকার করে ঘোষণা করেন যে জগতের সব পদার্থই অতি ক্ষুদ্র অবিভাজ্য কণিকা বা পরমাণু দিয়ে গঠিত হয়েছে। এক ধরনের পরমাণু অন্য ধরনের পরমাণুর তুলনায় ভর, আকার ও আয়তনে ভিন্ন।

প্রাচীন অ্যাটমিস্টদের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে গ্যাসেন্দি তাঁদের মতামতকে আরও বিকশিত করেন। তিনি ব্যাখ্যা করে দেখান কিভাবে বিশ্বজগতে কোটি কোটি বিভিন্ন বস্তু উৎপন্ন হতে পারে এবং হয়েছে। এজন্য তিনি জোর দিয়ে বলেন, অনেক বেশী সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর প্রয়োজন নেই। কেননা পরমাণু আসলে বাড়ি তৈরী করার উপাদানের মতো জিনিস। ইঁট, তক্তা আর খুঁটির মতো মাত্র তিনটি বিভিন্ন দ্রব্যের সাহায্যে অসংখ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের বাড়ি তৈরী করা সম্ভব। মূলতঃ একই উপায়ে প্রকৃতি কয়েক ডজন বিভিন্ন পরমাণুর সাহায্যে হাজার হাজার ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য তৈরী করেছে। অধিকন্তু প্রত্যেক দ্রব্যের মধ্যে বিভিন্ন পরমাণু জোটবদ্ধ হয়ে থাকে। গ্যাসেন্দি এই সব জোটের নাম দিয়েছিলেন অণু বা মলিকিউল অর্থাৎ ক্ষুদ্রভর (ল্যাটিন ভাষায় moles শব্দের অর্থ ভর)।

বিভিন্ন দ্রব্যের অণু তাদের সংগঠক পরমাণুর সংখ্যা এবং চরিত্রের ভিত্তিতে বিভিন্ন। এটা বোঝা মোটেই শক্ত নয় যে কয়েক ডজন বিভিন্ন প্রকার পরমাণু থেকে অসংখ্য প্রকার পরমাণু এবং অণুর জোট গড়ে উঠতে পারে। এজন্যেই আমরা আমাদের চারপাশে এতো বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য দেখতে পাই।

তবু গ্যাসেন্দির মতামতের মধ্যেও এমন অনেক কিছু আছে যা ভুল। যেমন তিনি বিশ্বাস করতেন যে উত্তাপ, শীতলতা, স্বাদ এবং গন্ধেরও বিশেষ ধরনের পরমাণু আছে। সমসাময়িক অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মতো তিনিও পুরোপুরি অ্যারিস্টটলের প্রভাব মুক্ত হয়ে উঠতে পারেন নি এবং তাঁর অবস্তু মৌলগুলিকে মেনে নিয়েছিলেন।

রুশ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা এম. ভি. লোমনোসভের লেখার মধ্যে পাওয়া নিম্নলিখিত ধারণাকে পরবর্তী কালে পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত করা হয়েছে।

লোমনোসভ লিখেছিলেন যে অণু সমসত্ত্ব কিম্বা অসমসত্ত্ব দু ধরনেরই হতে পারে। প্রথমক্ষেত্রে অণুর মধ্যে একই প্রকার পরমাণু উপস্থিত থাকে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে অণু তৈরী হয় যেসব পরমাণু দিয়ে তারা পরস্পরের থেকে আলাদা। যদি কোনো পদার্থ সমসত্ত্ব অণু দিয়ে গড়ে ওঠে তাহলে নিশ্চয়ই তা সরল পদার্থ। কিন্তু যদি পদার্থটির সংগঠক অণু বিভিন্ন প্রকার পরমাণু দিয়ে তৈরী হয় তাহলে সেটির, লোমনোসভ নাম দিয়েছিলেন যৌগিক পদার্থ।

এখন আমরা সুস্পষ্টভাবে জেনেছি যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুর সত্য সত্যই ঐ ধরনের গঠন থাকে। উদাহরণ হিসেবে অক্সিজেন গ্যাসের কথা বিবেচনা করা যাক, এর প্রত্যেকটি অণু একই ধরনের দুটি অক্সিজেন পরমাণু দিয়ে তৈরী। সুতরাং এটি একটি সরল পদার্থের অণু। কিন্তু যদি অণুর সংগঠক পরমাণুগুলি বিভিন্ন ধরনের হয়, তাহলে তা রাসায়নিক যৌগ। এর অণু সেই সব রাসায়নিক মৌলের পরমাণু দিয়ে তৈরী যে মৌলগুলি সংযুক্ত হয়ে যৌগটি গঠন করেছে। বিষয়টিকে অন্যভাবেও বলা চলে ঃ সমস্ত সরল পদার্থ একই রাসায়নিক মৌলের পরমাণু দিয়ে গড়ে উঠেছে, কিন্তু যৌগিক পদার্থ গড়ে উঠেছে দুই বা ততোধিক মৌলের পরমাণু দিয়ে।

পরমাণু সম্পর্কে আলোচনা করে তার অস্তিত্বের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন বেশ কয়েকজন চিন্তাবিদ। ইংরাজ বিজ্ঞানী জন ডালটন (1766—1844) সঠিক উপায়ে পরমাণুকে বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করে বিজ্ঞান গবেষণার বিষয়বস্তুতে পরিণত করেন। ডালটন দেখান যে এমন কিছু রাসায়নিক নিয়মানুবর্তিতা আছে যেগুলিকে কেবলমাত্র পরমাণু সম্পর্কিত প্রত্যয়ের সাহায্যেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

ডালটন পরবর্তী যুগে পরমাণুর ধারণা বিজ্ঞানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবু বহুকাল যাবৎ এমন কিছু বিজ্ঞানীর সাক্ষাৎ পাওয়া যেত যাঁরা পরমাণুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন। এমনকি গত শতাব্দী শেষ হওয়ার সময়েও তাঁদের মধ্যে একজন লিখেছিলেন যে, কয়েক দশক পরে পরমাণুকে লাইব্রেরীর ধুলো ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এখনকার দিনে ঐ ধরনের মন্তব্য কৌতুককর মনে হতে পারে। বর্তমানে

আমরা পরমাণুর 'জীবন' সম্পর্কে এতো বেশী তথ্য জানি যে, পরমাণু সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করাটা কৃষ্ণসাগরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করার সামিল হয়ে দাঁড়ায় !

বিজ্ঞানীরা পরমাণুদের আপেক্ষিক ভর নির্ণয় করেছেন। প্রথমের দিকে হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরকে পারমাণবিক ভরের একক হিসেবে গণ্য করা হত। এই মাপকাঠিতে নাইট্রোজেনের ভর দাঁড়ায় প্রায় 14, অক্সিজেনের প্রায় 16 এবং ক্লোরিনের প্রায় 35·5। পরবর্তী কালে পারমাণবিক ভরের তুলনামূলক একককে সামান্য পরিবর্তিত করা হয় এবং অক্সিজেনের পারমাণবিক ভরকে গ্রহণ করা হয় 16·0000 হিসেবে। এই এককে হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভর দাঁড়ায় 1·008।

অবশ্য পরমাণুর তুলনামূলক ভরের চেয়ে তার চরম ভর অর্থাৎ প্রকৃত ভরই বেশী আগ্রহের উদ্রেক করে। এজন্যে যে কোনো এক ধরনের চরম ভর নির্ণয় করাই যথেষ্ট। হাইড্রোজেন অথবা অক্সিজেনের বদলে কার্বনকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করাটাই সর্বাধুনিক রেওয়াজ। এখনো পর্যন্ত গবেষকরা পরমাণুর চরম ভর নির্ণয়ের প্রণালীকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন যা নিম্নলিখিত উপায়ে করা হয়। তাঁরা কার্বন আইসোটোপ ^{12}C এর ভরকে পুরোপুরি বারোটি পারমাণবিক ভর এককের (amu) সমান হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তারপর পরমাণুর চরম ভর নির্ণয়ের পদ্ধতির নির্ভুলতার দিকে দৃক্‌পাত না করে ধরে নেন,

$$1\ \text{amu} = 1{\cdot}662 \times 10^{-24}\ \text{গ্রাঃ}$$

যাই হোক এই মান সঠিক মানের চেয়ে খুব বেশী আলাদা নয়। সম্ভবতঃ সেজন্য তাঁরা অধিক সাবধানী, যেহেতু এখন (যখন) সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে 10 লক্ষ ভাগের একভাগ ভগ্নাংশকেও সঠিকভাবে মাপা যায়। বিগত শতকে পরিমাপ করার পদ্ধতিতে বিপুল অগ্রগতি ঘটেছে। 1875 সালে 1 amu এর মানের নির্ভুলতার গণ্ডী ছিল শতকরা 30% এর মধ্যে।

একটি পরমাণুর ভরের পরিমাণকে আমরা কিভাবে গ্রামে নির্ণয় করি ? অবশ্যই এমন কোনো দাঁড়িপাল্লা তৈরী করা যায় নি যাতে একটা পরমাণু রেখে অতি ক্ষুদ্র বাটখারার সাহায্যে ওজন করা সম্ভব। একশো বছর আগের মতো এখনও পদার্থবিদ্‌রা এই উদ্দেশ্যে পরোক্ষ উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু এই সব পদ্ধতি প্রত্যক্ষ পরিমাপ প্রণালীর তুলনায় কোনো মতেই কম নির্ভর যোগ্য নয়। তা বলে ওজন নির্ণয় করার প্রণালীকে পুরোপুরি বর্জন করাও যায় না। আমরা পাল্লার ওপর একটি মাত্র ^{12}C পরমাণু না রেখে ঐ পরমাণু দিয়ে তৈরী একটা বল রেখে ওজন করি (আসলে আমরা কিছুটা ভিন্নভাবে অগ্রসর হই, কিন্তু কথা হল ওজন করার বিষয়টিকে সহজভাবে ব্যাখ্যা করা আর তাই আশা করি

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ওয়াকিবহাল পাঠকেরা এই সরলীকৃত বর্ণনা মার্জনা করবেন)। বলের আয়তন আর ভর জানার পর আমরা তার ঘনত্ব নির্ণয় করতে পারি। যা ওজন করা হচ্ছে তা যেন এক নিখুঁত কেলাস হয়। এমন বস্তু পাওয়া খুব সহজ নয় তবে মোটামুটি সাধ্যের মধ্যে। তাহলে পরীক্ষার সাহায্যে বের করা ঘনত্বকে আমরা নিম্নলিখিত সমীকরণের আকারে লিখতে পারি ঃ

$$P = \frac{ZmA}{V}$$

যেখানে $mA = amu$, এককে প্রকাশিত পরমাণুর ভর

V = কেলাসের একক কোষের আয়তন

Z = একক কোষে উপস্থিত পরমাণুর সংখ্যা

শেষের দুটির মান এক্সরশ্মির সাহায্যে গঠন প্রণালী বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায়, যা চতুর্থ বইয়ের মধ্যে আলোচিত হয়েছে।

আমি গল্পের শুরুতেই শেষের কথা টেনে আনছি বলে পাঠকদের অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত হবে না। পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত বই কমপক্ষে দুবার পড়া উচিত।

উপরোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে আমরা খুব সূক্ষ্মভাবে পারমাণবিক ভর একক পরিমাপ করতে পারি। ঐ এককের সর্বাধুনিক নির্ণীত মান

$1\ amu = (1{\cdot}66043 \pm 0{\cdot}00031) \times 10^{-24}$ গ্রাম

এবার আমরা পাঠকদের এই মানের অপরিসীম ক্ষুদ্রতা সম্পর্কে কল্পনা করতে অনুরোধ জানাব। ধরুন আপনি পৃথিবীর প্রত্যেক অধিবাসীর কাছ থেকে একশো কোটি সংখ্যক অণু চাইলেন। এভাবে আপনি সর্বমোট কতখানি বস্তু সংগ্রহ করতে পারবেন? এক গ্রামের মাত্র একশো কোটি ভাগের এক ভাগ ভারের কাছাকাছি।

কিম্বা আর একটি তুলনা দেখুন ঃ পৃথিবী একটি আপেলের তুলনায় যতগুণ বেশী ভারী, আপেলটির ভার একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর তুলনায় প্রায় ততগুণ বেশী ভারী।

পারমাণবিক ভর এককের অন্যোন্যককে অ্যাভোগেড্রোর সংখ্যা বলা হয়।

$$N_A = \frac{1}{1amu} = 6{\cdot}0220943 \times 10^{23}$$

এই বিশাল অঙ্কের সংখ্যাটির তাৎপর্য নিম্নরূপ। ধরুন আমরা কোনো পদার্থের অণু বা পরমাণুর আপেক্ষিক ভর M এর সমসংখ্যক গ্রামে প্রকাশিত ভর নিয়েছি, যেমন কার্বনের ^{12}C আইসোটোপের 12 গ্রাম। একেই সংক্ষেপে বলা হয় আমরা এক মোল পদার্থ নিয়েছি (অনুগ্রহ করে সিরিজের প্রথম বইয়ে আমরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক একক বা SI একক সম্পর্কে আলোচনাকালে মোলের

যে সংজ্ঞা দিয়েছিলাম, তা মিলিয়ে দেখুন)। এক মোল পদার্থের ভর MmA এর সমান। সুতরাং 12 গ্রাম কার্বনের মধ্যে কার্বন পরমাণুর সংখ্যা এবং সঙ্গে সঙ্গে এক মোল যে কোনো পদার্থে উপস্থিত পরমাণু, অণু অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কণিকার সংখ্যা

$$\frac{M}{MmA}=N_A$$

যেখানে N_A অ্যাভোগেড্রোর সংখ্যা

অনেক দিন পর্যন্ত পদার্থবিদ্‌রা পদার্থের পরিমাণ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। যতদিন পর্যন্ত আমরা শুধুমাত্র পরমাণু অথবা অণু নিয়ে আলোচনা করেছি ততদিন পর্যন্ত মোলকে গ্রামে প্রকাশিত আণবিক (বা পারমাণবিক) ভর হিসেবে গ্রহণ করাই যথেষ্ট ছিল।

কিন্তু পরবর্তী কালে আয়ন, ইলেকট্রন, মেসন এবং আরও অনেক নতুন নতুন কণিকা আবির্ভূত হয়েছে। পদার্থবিদ্‌রা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন যে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক কণিকার জোটকে সবসময়ে ভরের মাধ্যমে প্রকাশ করা সুবিধাজনক নয়। ফলে ভরের পরিমাণজ্ঞাপক মোলের একক নির্দ্ধারিত হয়েছে। যখন আমরা এক মোল ইলেকট্রনের কথা বলি, কিম্বা এক মোল সীসা পরমাণু-কেন্দ্রকের, তখন আমরা তাদের ভরের কথা ভাবি না (যা আপনারা পরে দেখতে পাবেন, তাদের গতিবেগের ওপর নির্ভর করে) বিবেচনা করি শুধুমাত্র তাদের সংখ্যাকে। তবে মোলের পূর্বোক্ত সংজ্ঞা এখনো সঠিক কেননা যে কোন প্রকার N_A সংখ্যক পরমাণু বা অণুর ভর যথাক্রমে তাদের গ্রামে প্রকাশিত পারমাণবিক বা আণবিক ভরের সমান। অ্যাভোগেড্রোর সংখ্যার মানেও বদলে যায় নি, শুধুমাত্র তার আর একটি নতুন নাম হয়েছে ঃ $mole^{-1}$।

উত্তাপ কি (What Heat is)

একটি উষ্ণ বস্তু থেকে শীতল বস্তুর প্রভেদ কি? ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত প্রশ্নটির জবাবে নিম্নলিখিত উত্তর দেওয়া হত ঃ 'একটি উষ্ণ বস্তুর' মধ্যে শীতল বস্তুর তুলনায় বেশী তাপদায়ী সামগ্রী (বা ক্যালোরিক) আছে, ঠিক যেমন বেশী নোনতা ঝোলের মধ্যে নুনের পরিমাণ বেশী। কিন্তু 'ক্যালোরিক' কি? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হত ঃ 'ক্যালোরিক হচ্ছে উত্তাপের মর্মবস্তু, আগুনের মৌলরূপ'। রহস্যজনক এবং অবোধ্য। কার্যতঃ উত্তরটি দাঁড়ায়, 'দড়ি কি' এই প্রশ্নের জবাবে যদি কেউ বলে 'দড়ি হচ্ছে দড়িত্বের সরল রূপ'—ঠিক সেই রকম।

ক্যালোরিক মতবাদের পাশাপাশি উত্তাপ সম্পর্কে অন্য একটি মতবাদও প্রচলিত ছিল। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ঐ মতবাদটিকে বিকশিত করেন।

ফ্রানসিস বেকন তাঁর বই 'Novum Organum' এ লেখেন যে: 'উত্তাপ মূলতঃ গতি ছাড়া আর কিছুই নয়···পদার্থের অতিক্ষুদ্র কণিকার বিভিন্নরূপ গতির সাহায্যেই উত্তাপ গড়ে ওঠে।'

রবার্ট হুক তাঁর 'Micrographia' বইয়ে ঘোষণা করেন: 'উত্তাপ পদার্থের অংশগুলির অবিরাম গতি···। এমন কোনো পদার্থ নেই যার কণিকাগুলি স্থির।'

এই বিষয়ে অতি সুস্পষ্ট বিবৃতি রয়েছে লোমনোসভের লেখা (1745) 'Reflections on the Cause of Heat and Cold' এর মধ্যে। এই লেখার মধ্যে ক্যালোরিকের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বলা হয় 'পদার্থের কণিকাগুলির আভ্যন্তরীণ গতির ফলেই উত্তাপের উৎপত্তি।'

অষ্টাদশ শতকের শেষে কাউণ্ট ফন রুমফোর্ড আরও বেশী বিশদভাবে বলেন: 'পদার্থের সংগঠক কণিকাগুলি যত বেশী প্রবলভাবে গতিশীল হয়, পদার্থটি তত বেশী উত্তপ্ত হয়ে ওঠে; ঠিক যেমন একটি ঘণ্টা যত বেশী দ্রুত স্পন্দিত হয়, তত বেশী উচ্চগ্রামে ওঠে তার শব্দ।'

সময়ের বহু অগ্রগামী এই সব অনুমানের মধ্যেই লুকিয়ে আছে উত্তাপ সম্পর্কে আধুনিক ধারণার ভিত্তি।

অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় সম্পূর্ণ পরিষ্কার আর শান্ত দিনের মুখ। গাছের পাতা স্তব্ধ হয়ে আছে, কাঁচের মত স্বচ্ছ জলের বহির্তল আন্দোলিত করার মতো সামান্যতম ঢেউও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সমস্ত পরিবেশ এক অনড় গতিহীনতার পায়ে মাথা নত করে শিলীভূত। দৃশ্য জগত সম্পূর্ণ স্থির। কিন্তু অণু-পরমাণুর জগতে কি ঘটছে?

এবিষয়ে আধুনিক পদার্থবিদদের অনেক কিছু বলার আছে। কখনো, কোনো অবস্থাতেই, ঐ জগৎ গড়ে তুলেছে যে অদৃশ্য কণিকার দল, তারা সম্পূর্ণ স্থির হয়ে থাকতে পারে না।

কিন্তু তাহলে কেন আমরা তাদের গতি দেখতে পাই না? কণিকার দল ছুটে বেড়াচ্ছে, কিন্তু পদার্থটি স্থির হয়ে আছে। কি করে তা সম্ভব?

আপনারা কি কখনো ডাঁসের ঝাঁককে বাতাসে ভাসতে দেখেছেন? যখন বাতাস বইছে না, মনে হয় ঝাঁকটি যেন একই জায়গায় স্থির হয়ে বাতাসে ভাসছে। কিন্তু ঝাঁকের মধ্যে অব্যাহত আছে দারুণ চাঞ্চল্য। শতশত পতঙ্গ ডানদিকে উড়ে যাচ্ছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমসংখ্যক উড়ে আসছে বাঁদিকে। সামগ্রিকভাবে ঝাঁকটি একটি জায়গায় একই আকার বজায় রেখে স্থির হয়ে আছে।

অণু-পরমাণুর অদৃশ্য গতিও একই রকম এলোমেলো, লক্ষ্যহীন। যদি কতগুলি অণু একটি জায়গা ছেড়ে চলে যায়, সমসংখ্যক অণু এসে সেই জায়গা

দখল করে। কিন্তু যেহেতু আগন্তুক অণুগুলি বিদায়ী অণুগুলির চেয়ে কোনো দিক থেকেই আলাদা নয়, বস্তুটি ঠিক আগের মতো অবস্থাতেই থাকে। কণিকার বিশৃঙ্খল এলোমেলো গতি দৃশ্য জগতের ধর্মকে কোনোভাবেই পরিবর্তিত করে না।

'যাই বলুন, এসব কি অলস জল্পনা নয়?' পাঠক হয়তো আমাদের জিজ্ঞেস করবেন। এই সব বক্তব্য যত সুন্দর হোক না কেন, কোন দিক দিয়ে ক্যালোরিক মতবাদের চেয়ে বেশী যুক্তিগ্রাহ্য? কেউ কি কখনো বস্তুকণিকার অন্তহীন তাপীয় গতিকে নিজের চোখে দেখেছে?

হ্যাঁ, কণিকার তাপীয় গতি দেখতে পাওয়া যায়, সামান্য সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে। প্রক্রিয়াটিকে শতাধিক বছর আগে প্রথম লক্ষ্য করেন ইংরাজ উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী রবার্ট ব্রাউন (1773-1858)।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে একটি উদ্ভিদের আভ্যন্তরীণ গঠন পরীক্ষা করার সময় তিনি লক্ষ্য করেন যে উদ্ভিদ রসের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র অনেকগুলি কণিকা এলোমেলোভাবে সকল দিকে অবিরাম ঘোরাফেরা করছে। বিজ্ঞানীর কৌতূহল হল: কোন বল ঐ কণিকাগুলিকে সচল করেছে? ওগুলি কি এক ধরনের জীবন্ত বস্তু? বিজ্ঞানী ঠিক করলেন অতিক্ষুদ্র মাটির কণিকা জলে প্রলম্বিত অবস্থায় রেখে সেই ঘোলা জল পরীক্ষা করে দেখবেন। কিন্তু দেখা গেল নিঃসন্দেহে জীবনহীন ঐসব কণিকাগুলিও স্থির নয়, তারাও এলোমেলোভাবে অবিশ্রান্ত ঘোরাফেরা করছে। যে কণিকা যত বেশী ছোট সে তত দ্রুত ছুটছে। উদ্ভিদবিজ্ঞানী বহুক্ষণ জলবিন্দুটি পরীক্ষা করলেন কিন্তু তবু কণিকাগুলির ঘোরাফেরা বন্ধ হয়েছে দেখতে পেলেন না। মনে হল কোনো অদৃশ্য শক্তি যেন সবসময়ে তাদের ঠেলা দিচ্ছে।

কণিকাদের ব্রাউনিয়ান গতি আসলে এক ধরনের তাপীয় গতি। ছোট বড় কণিকায়, জোটবদ্ধ অণুতে, একক অণু বা পরমাণুতে তাপীয় গতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

শক্তি অবিনশ্বর (Energy is Conserved Forever)

তাহলে দেখা যাচ্ছে এই বিশ্বজগৎ গতিশীল পরমাণু দিয়ে গড়া। পরমাণুর ভর আছে, গতিশীল পরমাণুর আছে গতিশক্তি। যদিও একটি পরমাণুর ভর চিন্তা করা যায় না এতো কম। সুতরাং তার শক্তির পরিমাণও অত্যন্ত কম, কিন্তু পরমাণু সংখ্যায় কোটি কোটি।

এবার আমরা পাঠকদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, যদিও আমরা পূর্বে শক্তির সংরক্ষণ সূত্রের বিষয়ে বলেছিলাম, তবু তা যথেষ্ট সার্বজনীন সংরক্ষণ সূত্র ছিল না। পরীক্ষার সাহায্যে সরলরৈখিক এবং কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণ প্রমাণ

করা যায়, কিন্তু শক্তি সংরক্ষিত হয় শুধুমাত্র আদর্শ অবস্থায়—ঘর্ষণ বাধার অনুপস্থিতিতে। কিন্তু বাস্তবে শক্তি সবসময়েই কমে যায়।

কিন্তু আমরা এর আগে পরমাণু বাহিত শক্তি সম্পর্কে কোনো কথা বলিনি। স্বাভাবিকভাবে এই ধারণার উদ্রেক হয় যে যেখানে আমরা প্রথম দৃষ্টিতে শক্তির পরিমাণ কমে যেতে দেখি, সেখানে হয়তো কিছু পরিমাণ শক্তি পরমাণুর মধ্যে সঞ্চালিত হয় এমন এক পদ্ধতিতে, যা খালি চোখে ধরা পড়ে না।

পরমাণুও বলবিদ্যার নিয়মগুলির অধীন। অবশ্য একথা ঠিক যে পরমাণুর বলবিদ্যা (এ বিষয়ে আপনারা এই সিরিজের অন্য এক বইয়ে জানতে পারবেন) কিছুটা বৈচিত্র্যপূর্ণ, কিন্তু সেজন্যে যান্ত্রিকশক্তির সংরক্ষণ সূত্রের সাপেক্ষে বস্তুর বিশেষ কিছু ইতর-বিশেষ হয় না—পরমাণু বৃহদাকার বস্তুগুলির তুলনায় মোটেই স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার করে না।

সুতরাং শক্তি সংরক্ষণের পূর্ণাঙ্গ ছবি একমাত্র তখনই ফুটে উঠতে পারে, যদি আমরা বস্তুর যান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে বস্তুটির এবং তার পরিবেশের আভ্যন্তরীণ শক্তি হিসেবের মধ্যে গ্রহণ করি। শুধুমাত্র তাহলেই সংরক্ষণ সূত্র সার্বজনীন সূত্র হয়ে উঠতে পারে।

একটি বস্তুর মোট শক্তির মধ্যে কি কি আছে ? ইতিমধ্যেই আমরা সংক্ষেপে তার প্রথম উপাদানের কথা বলেছি—তা হল পরমাণুগুলির মোট গতিশক্তি। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, পরমাণুগুলি নিজেদের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া করে। তাই এই মিথষ্ক্রিয়ার স্থিতিশক্তিকেও হিসেবের মধ্যে ধরতে হবে। তাহলে একটি স্থির বস্তুর মোট শক্তি দাঁড়াচ্ছে, তার কণিকাগুলির গতিশক্তি এবং কণিকাগুলির মিথষ্ক্রিয়ার স্থিতিশক্তির যোগফলের সমান।

একটি বস্তুর মোট যান্ত্রিকশক্তি যে বস্তুটির মোট শক্তির অংশমাত্র, তা উপলব্ধি করা কঠিন নয়। কেননা একটি বস্তু স্থির অবস্থায় থাকলেও তার অণুগুলির ছুটোছুটি এবং মিথষ্ক্রিয়া বন্ধ হয় না। একটি স্থির বস্তুতে উপস্থিত কণিকা-গুলির তাপীয় গতি এবং কণিকাগুলির পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া একত্রিতভাবে বস্তুটির আভ্যন্তরীণ শক্তি হিসেবে গণ্য হয়। সুতরাং কোনো বস্তুর মোট শক্তি তার আভ্যন্তরীণ শক্তি আর যান্ত্রিকশক্তির যোগফলের সমান।

কোনো বস্তুর অভিকর্ষজ শক্তি তার যান্ত্রিক শক্তির একটি অংশ, যা বস্তুটির ভিতরকার কণিকা এবং পৃথিবীর মিথষ্ক্রিয়ার ফল অর্থাৎ স্থিতিশক্তি।

আভ্যন্তরীণ শক্তি সম্পর্কে বিবেচনা করার সময় আমরা আর শক্তিকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখি না। লক্ষ লক্ষ গুণ বিবর্দ্ধিত করে এমন উত্তল কাঁচ দিয়ে জগৎটাকে দেখলে আমরা এক বিরল শৃঙ্খলার দৃশ্য দেখতে পাবো। যান্ত্রিক শক্তির কোনো ক্ষয় হচ্ছে না, শুধুমাত্র তার রূপান্তর ঘটছে বস্তু কিম্বা তার

পরিবেশের অভ্যন্তরে। কার্য কি অন্তর্হিত হচ্ছে? না! শক্তি কেবল অণুদের আপেক্ষিক গতি বাড়াচ্ছে কিম্বা বদলে দিচ্ছে তাদের পারস্পরিক বিন্যাস।

অণু যান্ত্রিক শক্তির সংরক্ষণ সূত্র মেনে চলে। অণুর রাজ্যে কোনো ঘর্ষণ বলের অস্তিত্ব নেই। অণুর জগৎ শুধু স্থিতিশক্তির গতিশক্তিতে এবং তার বিপরীত রূপান্তরের প্রক্রিয়া দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। বৃহদ্‌কায়দের জগতে যেখানে অণু দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়, কেবলমাত্র সেখানেই মনে হয় 'শক্তি অদৃশ্য হচ্ছে।'

যদি কোনো ঘটনায় যান্ত্রিক শক্তি সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে অন্তর্হিত হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট বস্তু বা তার পরিবেশের আভ্যন্তরীণ শক্তি সমপরিমাণে বেড়ে যায়। অন্যভাবে বললে, যান্ত্রিক শক্তি কোনোরকম ক্ষয় ছাড়া সম্পূর্ণভাবে অণু বা পরমাণুর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

শক্তির সংরক্ষণ সূত্র পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে কঠোর হিসাব-রক্ষকের কাজ করে। যে কোনো প্রক্রিয়ায় শক্তির আগমন আর নির্গমনকে পুরোপুরি সমান হতেই হবে। যদি কোনো পরীক্ষায় তা না হয় তাহলে তার একমাত্র অর্থ গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু আমাদের নজর এড়িয়ে গেছে। এই সব ক্ষেত্রে শক্তির সংরক্ষণ সূত্র আমাদের নির্দেশকের ভূমিকা নেয়ঃ হে গবেষক, আরও একবার তোমার পরীক্ষা চালাও, মাপজোক করার নির্ভুলতা আরও বাড়াও, হিসেব গরমিল হওয়ার কারণ খোঁজো! এইপথে অনুসন্ধান চালিয়ে এবং শক্তির সংরক্ষণ সূত্রের ওপর সবসময়ে পরিপূর্ণ আস্থা রেখে পদার্থবিদ্‌রা বারে বারে নতুন নতুন গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছেন।

ক্যালোরি (Calorie)

আমরা এ পর্যন্ত শক্তির দুরকম এককের সাক্ষাৎ পেয়েছি—আর্গ এবং কিলোগ্রাম—বল—মিটার। মনে হতে পারে দুটি এককই যথেষ্ট। কিন্তু সনাতন পদ্ধতিতে তাপীয় প্রক্রিয়া পরিমাপের জন্যে তৃতীয় অপর একটি একক—ক্যালোরির ব্যবহার হয়ে আসছে।

পরে আমরা দেখব ক্যালোরির ব্যবহার সত্ত্বেও শক্তি পরিমাপের এককের সম্ভাব্য সব রূপ নিঃশেষিত হয়ে যায় নি।

অবশ্য প্রত্যেক বিশেষ ক্ষেত্রে শক্তির নিজস্ব বিশিষ্ট একক ব্যবহার করা চলে। কিন্তু বিষয়টি যদি সামান্য জটিল হয়ে শক্তির এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তনকে সূচিত করে, তাহলে বিভিন্ন একক দুর্বোধ্যভাবে তালগোল পাকিয়ে যেতে পারে।

তাই হিসেব সহজ করার জন্য SI সিস্টেমে কার্য, শক্তি কিম্বা তাপ পরিমাপে একটি মাত্র একক—জুল—ব্যবহার করা হয়। তবু প্রচলিত প্রথার শক্তি এবং SI সিস্টেমে ব্যবহৃত একক যে দীর্ঘ সময় পরে একমাত্র ব্যবহার্য এককে পরিণত

হবে, সেই দীর্ঘতার কথা বিবেচনা করে, আমাদের পক্ষে বিদায়ী একক অর্থাৎ 'ক্যালোরি' সম্পর্কে আরও ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হওয়া সুবিধাজনক।

এক গ্রাম জলকে $14{\cdot}5^0c$ থেকে $15{\cdot}5^0c$ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করার জন্যে প্রয়োজনীয় তাপকে ছোট ক্যালোরি (cal) বলে। এই এককের সঙ্গে 'ছোট' শব্দটিকে ব্যবহার করতেই হবে, কেননা অনেক সময়ে লোকে ছোট ক্যালোরির হাজার গুণ বড় অন্য একটি 'বড় ক্যালোরি' এককও ব্যবহার করে (অনেক সময় বড় ক্যালোরিকে Kcal বা কিলোক্যালোরি হিসেবেও বলা হয়)।

ক্যালোরি এবং কার্যের যান্ত্রিক এককের যেমন আর্গ বা কিলোগ্রাম—বল—মিটারের সম্পর্ক জলকে যান্ত্রিকভাবে উত্তপ্ত করে নির্দ্ধারণ করা যায়। বহুবার এই ধরনের পরীক্ষা চালানো হয়েছে। যেমন সজোরে জল আলোড়িত করে তার উষ্ণতা বাড়ানো যায়। উষ্ণতা বাড়ানোর জন্য ব্যয়িত যান্ত্রিক কার্যকে খুব নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যায়। এই ধরনের পরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে,

$$1 \text{ cal} = 0{\cdot}427 \text{ Kgf—m} = 4{\cdot}18 \text{J}$$

যেহেতু শক্তি এবং কার্যের একক একই, তাই কার্যকেও ক্যালোরি এককে প্রকাশ করা যায়। এক কিলোগ্রাম ভারকে এক মিটার উপরে তোলার জন্যে 2·35 cal শক্তি ব্যয় করা প্রয়োজন। শুনতে অদ্ভুত লাগে আর বাস্তবেও একটি বোঝা তোলার সঙ্গে জলকে উষ্ণ করার প্রক্রিয়ার তুলনা করা অসুবিধাজনক। তাই বলবিদ্যার ক্ষেত্রে ক্যালোরি একক ব্যবহার করা হয় না।

ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকটি কথা (Some History)

শক্তির সংরক্ষণ সূত্র কেবল তখনি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় যখন উত্তাপের যান্ত্রিক চরিত্র বহুলাংশে বোঝা গেছে এবং প্রযুক্তিবিদ্যা উত্তাপ এবং কার্যের মধ্যে তুল্যতা স্থাপনের প্রশ্ন উপস্থিত করতে পেরেছে।

উত্তাপ এবং কার্যের মধ্যে পরিমাণগত সম্পর্ক স্থাপনের প্রথম পরীক্ষা চালান স্যার বেঞ্জামিন টমসন (কাউণ্ট ফন রুমফোর্ড) (1753—1814)। তিনি কামান উৎপাদন করার একটি কারখানায় কাজ করতেন। বন্দুকের নল খোদাই করার সময় উত্তাপ বেরোয়। কি করে তা মাপা সম্ভব? উত্তাপ পরিমাপের জন্য কি ধরনের মাপকাঠি ব্যবহার করা উচিত? রুমফোর্ডের মনে হল খোদাই করার জন্যে কৃত কার্য, যে পরিমাণ জল যত ডিগ্রীতে উত্তপ্ত হচ্ছে, তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই অনুসন্ধানই সম্ভবতঃ উত্তাপ ও কার্যের যে একই সাধারণ মাপকাঠি থাকতে পারে, তার প্রথম সুনির্দিষ্ট প্রকাশ।

শক্তির সংরক্ষণ সূত্র আবিষ্কারের দিকে পরবর্তী পদক্ষেপ হল এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা: যে পরিমাণ কার্য অন্তর্হিত হয় তার তুল্যাঙ্ক পরিমাণ উত্তাপ

আবির্ভূত হয়। এইভাবে উত্তাপ এবং কার্যের একই সাধারণ মাপকাঠি খুঁজে পাওয়া গেল।

তথাকথিত 'উত্তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক' সম্পর্কে প্রথম সংজ্ঞা দেন ফরাসী পদার্থবিদ সাদি কারনট (1796—1832)। এই অনন্য সাধারণ প্রতিভাবান বিজ্ঞানী 1832 খ্রীস্টাব্দে মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে মারা যাওয়ার সময় একটি পাণ্ডুলিপি রেখে গিয়েছিলেন যা দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পরে প্রকাশিত হয়। কারনটের আবিষ্কার অজ্ঞাত থেকে যাওয়ার ফলে বিজ্ঞানের বিকাশকে প্রভাবিত করতে পারে নি। কারনট তাঁর গবেষণায় হিসেব করে দেখিয়েছিলেন যে এক ঘনমিটার জলকে এক মিটার ওপরে তোলার জন্যে যে শক্তি ব্যয়িত হয়, তা এক কিলোগ্রাম জলকে 2·7 ডিগ্রীতে (সঠিক অঙ্ক 2·3 ডিগ্রী) উত্তপ্ত করার জন্যে প্রয়োজনীয় উত্তাপের ঠিক সমান।

হাইলব্রোনের ডক্টর জুলিয়াস রবার্ট ফন মায়ার (1814-1878) 1842 খ্রীস্টাব্দে তাঁর প্রথম গবেষণার কাজ প্রকাশ করেন। যদিও মায়ার আমাদের পরিচিত পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত প্রত্যয়গুলিকে সম্পূর্ণ নতুন নামে অভিহিত করবেন. তবু সতর্কভাবে তাঁর লেখা পড়লে বোঝা যায় যে শক্তির সংরক্ষণসূত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর লেখার মধ্যে উপস্থাপিত হয়েছে। মায়ার আভ্যন্তরীণ শক্তি (তাপীয়), অভিকর্ষজ স্থিতিশক্তি এবং বস্তুর গতিজনিত শক্তিকে পৃথকভাবে সনাক্ত করেন। তিনি শক্তির বিভিন্ন রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যে বিশুদ্ধ তত্ত্বগত দিক থেকে শক্তির সংরক্ষণ সূত্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন। এই কথিত ধারণা-কে পরীক্ষামূলক দেখিবার জন্য এইসব বিভিন্ন শক্তি পরিমাপের এক সাধারণ মাপকাঠি দরকার। মায়ার হিসেব করে দেখান যে, এক কিলোগ্রাম জলকে এক ডিগ্রী উষ্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় উত্তাপ এক কিলোগ্রাম ভারকে তিনশো পঁয়ষট্টি মিটার উপরে তোলার জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তির তুল্যমূল্য।

তিন বছর পরে মায়ার তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশিত গবেষণামূলক নিবন্ধে শক্তির সংরক্ষণ সূত্রের সার্বজনীনতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখান যে রসায়নবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান এবং মহাজাগতিকবিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রশ্নে এই সূত্রকে ব্যবহার করা সম্ভব। শক্তির বিভিন্ন জ্ঞাত রূপের সঙ্গে মায়ার চুম্বক, তড়িৎ এবং রাসায়নিক শক্তিকেও যুক্ত করেন।

শক্তির সংরক্ষণ সূত্র আবিষ্কারের অনেকখানি কৃতিত্ব খ্যাতনামা ইংরেজ পদার্থ-তত্ত্ববিদ জেমস প্রেসকট জুলের (ইংলণ্ডের স্যালফোর্ডে এক মদ্য প্রস্তুতকারক) (1818-1889) প্রাপ্য। তিনি মায়ারের থেকে স্বতন্ত্রভাবে গবেষণার কাজ চালিয়েছিলেন।

অনির্দেশবাদী দর্শনের দিকে ঝোঁক ছিল মায়ারের এক বৈশিষ্ট্য, কিন্তু জুলের



হেরমান হেল্‌মোলংস (1821—1894)—বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী হেল্‌মোলংস অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, গণিত এবং শরীরবিদ্যার ক্ষেত্রে গবেষণার কাজ চালিয়েছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম শক্তির সংরক্ষণ সূত্রের গাণিতিক ব্যাখ্যা দিয়ে সূত্রটির সার্বজনীনতা প্রতিষ্ঠিত করেন। থার্মোডিনামিক্সের ক্ষেত্রে তাঁর অনবদ্য অবদান আছে: তিনিই প্রথম রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে থার্মোডিনামিক্স প্রয়োগ করেন। তরলের ঘূর্ণ্যমান গতি সম্পর্কে গবেষণা করে তিনি হাইড্রো-ডিনামিক্স এবং এরোডিনামিক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। শব্দ বিজ্ঞান এবং তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্বের ক্ষেত্রেও তিনি মূল্যবান গবেষণা করেন। হেলমোলংস সঙ্গীতের পদার্থতাত্ত্বিক মতবাদ বিকশিত করেন। পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণায় তিনি উচ্চাঙ্গ মৌলিক গাণিতিক পদ্ধতি ব্যবহার করে গেছেন।

মৌলিক প্রবণতা ছিল প্রক্রিয়া সম্পর্কিত পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের দিকে। জুল প্রকৃতি সম্পর্কে এক একটি প্রশ্ন উত্থাপন করতেন এবং তারপর তাদের উত্তর খুঁজতেন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বিশেষ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে জুল একের পর এক সব পরীক্ষা চালিয়ে গেছেন একটিমাত্র উদ্দেশ্য মাথায় রেখে, তা হল তাপীয়, রাসায়নিক, তড়িৎ কিম্বা যান্ত্রিক সব ধরনের শক্তির একটি সাধারণ মাপকাঠি খুঁজে বার করে দেখানো যে এইসব প্রক্রিয়াতে শক্তি সংরক্ষিত হয়। জুল তাঁর ধারণাকে নিম্নলিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন ঃ 'সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া ভিন্ন প্রকৃতিতে কার্যসম্পাদনকারী বলের বিনাশ ঘটতে পারে না।'

1843 খ্রীস্টাব্দের 24শে জানুয়ারি জুল তাঁর গবেষণার প্রথম ফল প্রকাশ করেন। এবং সেই বছরেরই আগস্ট মাসে তিনি উত্তাপ এবং কার্যের এক সাধারণ মাপকাঠি উদ্ভাবন করার বিবরণ দেন। তিনি দেখান যে এক কিলোগ্রাম জলকে এক ডিগ্রী পরিমাণ উত্তপ্ত করার জন্যে প্রয়োজনীয় উত্তাপ এক কিলোগ্রাম ভারকে চারশো ষাট মিটার ওপরে তোলার জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তির তুল্যমূল্য।

পরবর্তী বছরগুলিতে জুল এবং আরও অনেক গবেষক তাপীয় তুল্যাঙ্কের আরও সুবিধাজনক মান নির্ণয়ের জন্য এবং শক্তির সংরক্ষণ সূত্রের পরিপূর্ণ সার্বজনীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেন। চল্লিশের দশকের শেষাংশে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, কার্যকে যেভাবেই উত্তাপে রূপান্তরিত করা হোক না কেন, সবসময়েই ব্যয়িত কার্য উদ্ভূত উত্তাপের সমানুপাতিক। যদিও জুল শক্তির সংরক্ষণ সূত্রের পরীক্ষামূলক ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তবু তাঁর গবেষণা পত্রগুলির মধ্যে কোথাও এই সূত্র সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে রূপদান করা হয়নি।

এবিষয়ে কৃতিত্ব জার্মান পদার্থবিদ্ হেলমোলৎসের প্রাপ্য। 1847 সালের 23শে জুলাই বার্লিন পদার্থবিদ্যার সমিতিতে হেলমোলৎস শক্তির সংরক্ষণ সূত্রের নীতি সম্পর্কে এক বক্তৃতা দেন। শক্তির সংরক্ষণ সূত্রের বলবিদ্যামূলক ভিত্তিকে এই বক্তৃতার মধ্যেই সর্বপ্রথম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উপস্থিত করা হয়। বিশ্বজগৎ পরমাণু দিয়ে গড়ে উঠেছে। পরমাণুর গতিশক্তি এবং স্থিতিশক্তি আছে। বাহ্যিক প্রভাব ছাড়া একটি বস্তু বা সিস্টেমের সংগঠক কণিকাগুলির গতিশক্তি এবং স্থিতিশক্তির যোগফল পরিবর্তিত হতে পারে না। শক্তির সংরক্ষণ সূত্রের যে রূপরেখা আমরা কয়েক পৃষ্ঠা আগে উপস্থিত করেছি, তা হেলমোলৎসেরই রচনা।

হেলমোলৎসের গবেষণার পরে, অন্যান্য পদার্থবিদ্রা শক্তির সংরক্ষণ সূত্রকে শুধুমাত্র পরীক্ষার সাহায্যে পুনঃ প্রমাণ করেছেন কিম্বা অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। এইসব গবেষকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলশ্রুতি হিসেবে পঞ্চাশের

দশকের শেষেই শক্তির সংরক্ষণ সূত্র সর্বত্র প্রকৃতিবিজ্ঞানের এক মৌলিক নীতি হিসেবে স্বীকৃত হয়।

বিংশ শতকে এমন সব প্রক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হতে থাকে, যা শক্তির সংরক্ষণ সূত্র সম্পর্কে সন্দেহের মেঘ জমিয়ে তোলে। যাই হোক পরবর্তী কালে এই ধরনের আপাতঃ ব্যতিক্রম সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যাখ্যার সন্ধান পাওয়া যায়। এখনো পর্যন্ত শক্তির সংরক্ষণসূত্র সগৌরবে সব ধরনের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে।

২. বস্তুর গঠন

অণুমধ্যস্থিত বন্ধন (Intramolecular Bonds)

অণু গড়ে ওঠে অনেকগুলি পরমাণু দিয়ে। পরমাণুগুলি অণুর মধ্যে যে বলের দ্বারা আবদ্ধ তার নাম রাসায়নিক বল।

দুইটি তিনটি বা চারটি পরমাণু দিয়ে গড়া অণু দেখতে পাওয়া যায়। প্রোটিন অণুর মতো বৃহত্তম অণুগুলির মধ্যে কয়েক দশ, কয়েক শ এমনকি কয়েক হাজার পরমাণুও থাকতে পারে।

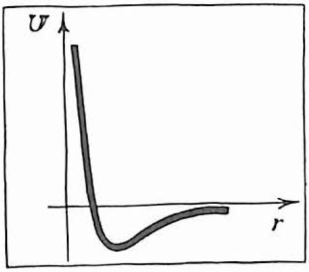
অণুর জগৎ অত্যন্ত বিচিত্র। এযাবৎ বিভিন্ন অণু দ্বারা গঠিত লক্ষ লক্ষ বস্তুকে রাসায়নবিদ্‌রা প্রাকৃতিক দ্রব্যাদি থেকে নিষ্কাশন করেছেন কিম্বা লেবরেটারিতে প্রস্তুত করেছেন।

অণুর ধর্ম শুধুমাত্র কোনো কোনো মৌলের কতসংখ্যক পরমাণু তার মধ্যে উপস্থিত আছে তার ওপর নির্ভর করে না, যে ক্রম বা গঠনবিন্যাসের দ্বারা পরমাণুগুলি সংযুক্ত তার উপরও নির্ভর করে।

অণু কেবল ইঁটের গাদা নয়, এমন এক জটিল স্থাপত্য যার মধ্যে প্রতিটি ইঁটের নিজস্ব স্থান এবং সম্পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট পরিমণ্ডল থাকে। অণুর পরমাণুর গঠন কম বা বেশী মাত্রায় দৃঢ় হতে পারে। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই প্রত্যেক পরমাণু একটি সাম্য অবস্থানের চারিদিকে স্পন্দিত হয়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তাপীয় গতির ফলে অণুর কয়েকটি অংশ অপর অংশের চারিদিকে আবর্তিত হয়ে মুক্ত অণুতে বিভিন্ন বিচিত্র গঠন উৎপন্ন করে।

এবার পরমাণুদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে আরও বিশদভাবে আলোচনা করা যাক। চিত্র 2.1 তে একটি দ্বিপরমাণুক অণুর স্থিতিশক্তির লেখচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এর একটি বৈশিষ্ট্যসূচক আকার আছে, লেখটি প্রথমে নীচের দিকে নেমেছে তারপর আবার উপর দিকে উঠে মধ্যে একটি 'কূপ' উৎপন্ন করেছে এবং তারও পরে ধীরে ধীরে উঠে পরমাণুদের মধ্যবর্তী দূরত্বের নির্দেশক আনুভূমিক অক্ষের দিকে গিয়েছে।

আমরা জানি যে, যে অবস্থায় স্থিতিশক্তির মান নিম্নতম, সেটাই সুস্থিত অবস্থা। পরমাণু যখন অণুর অংশ গঠন করে, তখন তা স্থিতিশক্তির কূপের মধ্যে 'বসে' থাকে এবং নিজের সাম্য অবস্থানের চারিদিকে অল্পমাত্রার তাপীয় স্পন্দন উৎপন্ন করে।



চিত্র 2.1

উল্লম্ব অক্ষ থেকে কূপের তলদেশ পর্যন্ত দূরত্বকে সাম্য অবস্থানের দূরত্ব বলে মনে করা চলে। তাপীয় গতি যদি থামিয়ে দেওয়া যায় তাহলে পরমাণুগুলি এই দূরত্বে অবস্থান করবে।

স্থিতিশক্তির লেখচিত্র থেকে আমরা পরমাণুদের পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া সম্পর্কে সমস্ত বিশদ বিবরণ পাই। কোনো কোনো দূরত্বে কণিকাগুলি পরস্পরকে আকর্ষণ করছে বা বিকর্ষণ করছে, কণিকাগুলি যখন পরস্পরের কাছে আসছে কিম্বা দূরে চলে যাচ্ছে, মিথষ্ক্রিয়ার তীব্রতা বাড়ছে না কমছে, এই সব তত্ত্বই স্থিতিশক্তির লেখচিত্র পরীক্ষা করে পাওয়া যায়। কূপের তলদেশের বামদিকের বিন্দুগুলি বিকর্ষণের এবং ডানদিকের বিন্দুগুলি আকর্ষণের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। লেখচিত্রটি কতখানি খাড়াই, তা দেখেও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত টানা যায়ঃ লেখচিত্রটি যত বেশী খাড়াই, বলও তত বেশী।

যখন পরমাণুগুলি পরস্পর থেকে অনেক দূরে থাকে তখন তারা আকর্ষিত হয়; এই আকর্ষণী বল পারস্পরিক দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত দ্রুত হারে কমতে থাকে। যখন পরমাণুগুলি পরস্পরের দিকে এগোয় তখন আকর্ষণী বল বাড়তে থাকে এবং তার মান সর্বোচ্চ হয় যখন পরমাণুগুলি খুব কাছাকাছি এসে পড়ে। এর পরেও যদি তারা আরও নিকটবর্তী হয় তাহলে আকর্ষণ কমতে থাকে এবং সাম্য অবস্থানের দূরত্বে পৌঁছলে মিথষ্ক্রিয়ার বল সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়। পরমাণুগুলি সাম্য অবস্থানের দূরত্বের চেয়েও কাছাকাছি এসে পড়লে, বিকর্ষণী বলের আবির্ভাব ঘটে এবং তা শীঘ্রই পরমাণুগুলির আরও নিকটবর্তী হওয়া প্রায় অসম্ভব করে তোলে। পরমাণুগুলির সাম্য অবস্থানের দূরত্ব (এরপর আমরা সংক্ষেপ করার জন্যে শুধু দূরত্ব শব্দটি ব্যবহার করব) বিভিন্ন পরমাণুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন।

বিভিন্ন পরমাণুজোড়ের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র উল্লম্ব অক্ষ এবং কূপের তলদেশের মধ্যকার দূরত্বই আলাদা নয়, কূপের গভীরতাও ভিন্ন হয়।

কূপের গভীরতার একটি সরল অর্থ আছে: কূপ থেকে গড়িয়ে বাইরে আসতে হলে, কূপের গভীরতার সমান মানের শক্তির প্রয়োজন! সুতরাং কূপের গভীরতাকে কণিকাগুলির পারস্পরিক বন্ধনশক্তি বলা চলে।

একটি অণুর ভিতরকার পরমাণুগুলির পারস্পরিক দূরত্ব এতো কম যে, তাদের মাপার জন্যে যথোপযুক্ত একক বেছে নেওয়া দরকার, তা নাহলে তাদের মান 0·000000012 সেমি. এর মতো অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। এই মানটি অক্সিজেন অণুর।

পারমাণবিক জগতের দূরত্ব মাপার উপযুক্ত এককে আঙ্গস্ট্রম (Angstrom) বলা হয় (যে সুইডিস বিজ্ঞানীর সম্মানে এককটির এই নামকরণ করা হয়েছে, তাঁর নাম আসলে আঙ্গস্ট্রোয়েম (Angström); বিষয়টি মনে রাখার জন্যে A অক্ষরের ওপরে একটি ছোট বৃত্ত আঁকা হয়)।

$1\mathring{A} = 10^{-8}$ সেমি. অর্থাৎ এক সেণ্টিমিটারের দশ কোটি ভাগের একভাগ।

অণুর ভিতরকার পরমাণুদের পারস্পরিক দূরত্ব $1\mathring{A}$ থেকে $4\mathring{A}$ এর মধ্যে। অক্সিজেন অণুর মধ্যে সাম্য অবস্থানে পরমাণুগুলির দূরত্ব, যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, এই এককে 1·2A।

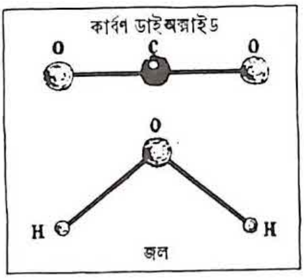
পরমাণুগুলির পারস্পরিক দূরত্ব, দেখতেই পাচ্ছেন খুব কম। যদি বিষুব-রেখা বরাবর একটি দড়ি জড়িয়ে পৃথিবীকে বেষ্টন করা হয়, তাহলে সেই "বেল্টটির" দৈর্ঘ্য আপনার হাতের তালুর প্রস্থের থেকে যতগুণ বড় হবে, আপনার হাতের তালুর প্রস্থ পরমাণুগুলির পারস্পরিক দূরত্বের তুলনায় ততগুণ।

বন্ধন শক্তি মাপার জন্যে সাধারণ ক্যালোরি একক ব্যবহার করা হয়, কিন্তু তা একটি মাত্র অণুর বন্ধনশক্তি নয়, (যার মান অত্যন্ত নগণ্য) তা হল এক মোলের অর্থাৎ গ্রামে প্রকাশিত তুলনামূলক আণবিক ভরের বন্ধনশক্তি।

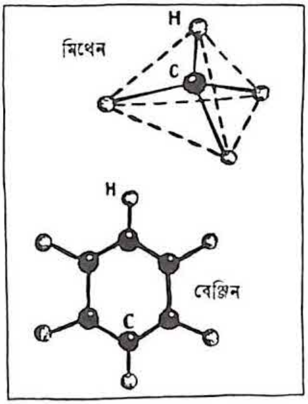
স্পষ্টত: মোল প্রতি বন্ধনশক্তিকে অ্যাভোগেড্রোর সংখ্যা ($N_A = 6{\cdot}023 \times 10^{23}\ mol^{-1}$) দিয়ে ভাগ করলে একক অণুর বন্ধনশক্তি পাওয়া যায়।

অণুর মধ্যে পরমাণুগুলি যে বন্ধনশক্তি দিয়ে আবদ্ধ তার মান আন্তঃ-পরমাণুক দূরত্বের মতোই অল্পমাত্রায় পরিবর্তনশীল হতে পারে।

পূর্বোক্ত অক্সিজেনের ক্ষেত্রে বন্ধনশক্তি 116000 cal/mol, হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে 103000 cal/mol ইত্যাদি।



চিত্র 2.2



চিত্র 2.3

আমরা আগেই বলেছি যে, অণুর মধ্যে পরমাণুগুলি পরস্পরের মধ্যে পুরোপুরি নির্দিষ্ট বিন্যাস বজায় রেখে জটিল কাঠামো গঠন করে।

কতগুলি সরল উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা যাক। CO_2 (কার্বন-ডাই অক্সাইড) অণুর মধ্যে কার্বন পরমাণুকে মধ্যে রেখে তিনটি পরমাণুই একটি সরলরেখা বরাবর বিন্যস্ত। H_2O (জল) অণুর আকার কৌণিক, অক্সিজেনের স্থান কোণটির শীর্ষবিন্দুতে (কোণটির পরিমাণ 105°)।

NH_3 (অ্যামোনিয়া) অণুতে নাইট্রোজেন পরমাণুর স্থান এক ত্রিতলক পিরামিডের শীর্ষবিন্দুতে, CH_4 (মিথেন) অণুতে কার্বন পরমাণু একটি সুসম চতুস্তলকের (tetrahedron) কেন্দ্রে অবস্থিত।

C_6H_6 (বেঞ্জিন) এর কার্বন পরমাণুগুলি একটি সমবাহু ষড়ভুজ গঠন করে। ষড়ভুজটির প্রত্যেক শীর্ষবিন্দুতে হাইড্রোজেন পরমাণু সংযুক্ত। সব পরমাণুর অবস্থানই একটি মাত্র তলে।

চিত্র 2.2 এবং 2.3 এ উপরোক্ত অণুগুলির ভিতরকার পরমাণুগুলির বিন্যাস দেখানো হল। সরলরেখার সাহায্যে বন্ধন সূচিত হয়েছে।

একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া হল ; আগে একই ধরনের অণু ছিল কিন্তু পরে অন্যান্য ধরনের অণুর আবির্ভাব ঘটল। কতগুলি বন্ধন ভেঙ্গে গেল, আবার নতুন কতগুলি বন্ধন গড়ে উঠল। পরমাণুগুলির ভিতরকার বন্ধন ভেঙ্গে ফেলার

জন্য কার্য সম্পাদন করার (চিত্র 2.1 দেখুন) প্রয়োজন, ঠিক যেমন কিছু কার্য করার দরকার হয় একটি বলকে গড়িয়ে কূপ থেকে তোলার জন্যে। বিপরীত ক্রমে নতুন বন্ধন সৃষ্টি হওয়ার সময় শক্তি নির্গত হয়, ঠিক যেমন হয় একটি বল গড়িয়ে কূপের মধ্যে পড়ার সময়।

কোনটি বড়, বন্ধন ভেঙ্গে ফেলার শক্তি, না বন্ধন গড়ে ওঠার শক্তি ? প্রকৃতিতে আমরা এই দু ধরনের বিক্রিয়ারই সাক্ষাৎ পাই।

অতিরিক্ত শক্তিটুকুকে বলা হয় তাপীয় ফল কিম্বা আরও নির্দিষ্টভাবে 'পরিবর্তনের (বিক্রিয়ার) তাপ'। বিক্রিয়ার তাপ সাধারণতঃ মোল প্রতি কয়েক অযুত (1 অযুত = 10 লক্ষ) ক্যালোরি। রাসায়নিক সমীকরণে অনেক সময় বিক্রিয়ার তাপকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

উদাহরণ স্বরূপ যে বিক্রিয়ায় গ্রাফাইট-রূপী কার্বন দহিত হয় অর্থাৎ অক্সিজেনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তার কথা বিবেচনা করা যাক।

$$C + O_2 = CO_2 + 94\ 250\ \text{cal}$$

সমীকরণটির অর্থ, যখন কার্বন অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন 94250 ক্যালোরি শক্তি নির্গত হয়ে থাকে। এক মোল কার্বন ও এক মোল অক্সিজেনের আভ্যন্তরীণ শক্তির যোগফল যা হবে তা হল এক মোল কার্বন-ডাই অক্সাইডের আভ্যন্তরীণ শক্তি ও 94 250 ক্যালোরির যোগফলের সমান।

সুতরাং এইসব সঙ্কেতের স্বচ্ছ অর্থ, আভ্যন্তরীণ শক্তির মানের পরিপ্রেক্ষিতে বীজগণিতের সমীকরণ লেখা।

যেসব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ উপায়ে বিক্রিয়ার তাপ পরিমাপ করা অসুবিধাজনক, সেসব ক্ষেত্রে এই ধরনের সমীকরণের সাহায্যে সেগুলিকে হিসেব করা যায়। একটি উদাহরণ দেখুন ঃ যদি কার্বনকে (গ্রাফাইট) হাইড্রোজেনের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায় তাহলে অ্যাসিটিলিন উৎপন্ন হতে পারে।

$$2C + H_2 = C_2H_2$$

বিক্রিয়াটি অবশ্য ঠিক এইভাবে হয় না। তবু এর সাহায্যে তাপীয় ফল বের করা যায়। আমরা তিনটি জানা বিক্রিয়া থেকে শুরু করি।

(1) কার্বনের জারণ ঃ

$$2C + O_2 = 3CO_2 + 188000\ \text{cal}$$

(2) হাইড্রোজেনের জারণ ঃ

$$H_2 + \tfrac{1}{2}O_2 = H_2O + 68000\ \text{cal}$$

(3) অ্যাসিটিলিনের জারণ ঃ

$$C_2H_2 + \tfrac{5}{2}O_2 = 2CO_2 + H_2O + 312000\ \text{cal}$$

উপরোক্ত তিনটি সমতায় প্রতিষ্ঠিত লেখাকে, অণুর বন্ধনশক্তি সম্পর্কে

সমীকরণ হিসেবে গণ্য করা চলে। তাহলে আমরা এগুলিকে বীজগণিতের সমীকরণের মতো ব্যবহার করতে পারি। প্রথম দুটির যোগফল তৃতীয় সমীকরণ থেকে বিয়োগ করে পাই :

$$2C + H_2 = C_2H_2 - 56000 \text{ cal}$$

সুতরাং আমাদের আলোচ্য বিক্রিয়াটি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে 56000 ক্যালোরি উত্তাপ শোষিত হবে।

ভৌত এবং রাসায়নিক অণু (Physical and Chemical Molecules)

বস্তুর গঠন সম্পর্কে গবেষকরা পূর্ণাঙ্গ ধারণা গড়ে তুলতে পারার আগে পর্যন্ত এই ধরনের কোনো পার্থক্য করা হত না। অণু বলতে বোঝাত সরল অর্থে অণু, অর্থাৎ কোনো বস্তুর ক্ষুদ্রতম প্রতিনিধি। ভাবা হত এর বেশী আর কিছু বলার নেই। কিন্তু ব্যাপারটি ঠিক সেরকম নয়।

এ পর্যন্ত আমরা যে সব অণুর বিষয়ে আলোচনা করেছি সেগুলি দুই অর্থেই অণু। কার্বন-ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া এবং বেঞ্জিনের (যেগুলি পূর্বে আলোচিত হয়েছে) এবং প্রায় সব জৈব যৌগের (যেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি) অণুই শক্তিশালী বন্ধনে যুক্ত পরমাণু দিয়ে গড়া। এই বন্ধনগুলি গলন, বাষ্পীভবন কিম্বা দ্রবীভূত হওয়ার ফলে ভেঙ্গে যায় না। যে কোনো অবস্থান্তরে বা ভৌত ক্রিয়ায় অণুগুলি স্বতন্ত্র কণিকা বা অতিক্ষুদ্র ভৌত সত্ত্বা হিসেবে কাজ করে।

কিন্তু সবক্ষেত্রে এমনটি হয় না। অধিকাংশ অজৈব যৌগের ক্ষেত্রে আমরা অণু শব্দকে কেবলমাত্র রাসায়নিক অর্থে ব্যবহার করি। এমনকি খাদ্যলবণ, ক্যালসাইট কিম্বা সোডার মতন অতিপরিচিত যৌগগুলির ক্ষেত্রেও উপরোক্ত ক্ষুদ্রতম কণিকার কোনো রকম অস্তিত্বই নেই। এদের কেলাসের মধ্যে ঐ ধরনের স্বতন্ত্র কণিকাকে খুঁজে পাওয়া যায় না (এই বিষয়টি আরও কয়েক পৃষ্ঠা পরে আলোচিত হবে) ; আর যখন তাদের দ্রবীভূত করা হয় তখন অণুগুলি ভেঙ্গে পরমাণুতে পরিণত হয়।

চিনি জৈব বস্তু। সুতরাং এক কাপ মিষ্টি চায়ে দ্রবীভূত চিনি আণবিক রূপে অবস্থান করে। কিন্তু নুনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। নোন্‌তা জলের মধ্যে আমরা সাধারণ খাদ্যলবণের (সোডিয়াম ক্লোরাইড) একটি অণুকেও খুঁজে পাই না। এই 'অণু' (আমরা শব্দটিকে এক্ষেত্রে উদ্ধৃতির মধ্যে ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছি) জলের মধ্যে পরমাণুরূপে (সঠিকভাবে বললে 'আয়নে' অর্থাৎ তড়িৎযুক্ত পরমাণুতে, যে বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে) থাকে।

বাষ্প সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য ; আর গলিত অবস্থার ক্ষেত্রে অণুগুলির একাংশ মাত্র স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারে।

ভৌত অণুর ক্ষেত্রে যে বন্ধন বল পরমাণুগুলিকে একত্রিত করে রাখে, আমরা তাকে যোজন বল (Valence force) বলি। আন্তঃ-আণবিক বল যোজ্যতা সংক্রান্ত বল নয়। দুধরনের বলের ক্ষেত্রেই মিথষ্ক্রিয়ার সাধারণ লেখচিত্র 2.1. চিত্রে প্রদর্শিত আকারের মতো। তফাৎ শুধু স্থিতিশক্তি কূপের গভীরতায়। যোজন বলের ক্ষেত্রে কূপটি শতগুণ বেশী গভীর।

অণুর মিথষ্ক্রিয়া (Interaction of Molecules)

অণুগুলি যে পরস্পরকে আকর্ষণ করে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যদি ক্ষণিকের জন্যেও তারা তা না করে, তাহলে তরল বা কঠিন পদার্থ অণুতে বিয়োজিত হয়ে যাবে।

অণুগুলি যে পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এই তত্ত্বও সন্দেহাতীত, কেননা তা না হলে তরল বা কঠিন পদার্থ অতি সহজে সঙ্কুচিত হত।

অণুগুলির মধ্যে যে বল ক্রিয়া করে তা পূর্বে উল্লিখিত পরমাণুদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলেরই অনুরূপ। পরমাণুদের জন্যে আমরা যে স্থিতিশক্তির লেখচিত্র এঁকেছিলাম তা আন্তঃআণবিক মিথষ্ক্রিয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ করে। তবু এই দুই ধরনের মিথষ্ক্রিয়ার মধ্যে মৌলিক প্রভেদও আছে।

উদাহরণ হিসেবে অক্সিজেন অণুর মধ্যে সাম্য অবস্থানে থাকা দুটি অক্সিজেন পরমাণুর ভিতরকার দূরত্বের সঙ্গে কঠিনীকৃত অক্সিজেনের মধ্যে সাম্য অবস্থানে আসার আগে দুটি পাশাপাশি আকর্ষণশীল অক্সিজেন অণুর সংগঠক পরমাণুর মধ্যবর্তী দূরত্ব তুলনা করা যাক। তফাৎটা ভালোভাবেই চোখে পড়েঃ একই অক্সিজেন অণুর ভিতরকার পরমাণু দুটির দূরত্ব 1.2Å, অথচ দুটি ভিন্ন অণুতে অবস্থিত অক্সিজেন পরমাণুগুলি 2·9Å পর্যন্ত কাছাকাছি আসে।

অন্যান্য পরমাণুর ক্ষেত্রেও একই ধরনের ফলাফল লক্ষ্য করা যায়। একই অণুর ভিতরকার পরমাণুদের চেয়ে আলাদা অণুর ভিতরকার পরমাণুগুলি দূরে অবস্থান করে। সুতরাং একটি অণু থেকে পরমাণু পৃথক করার চেয়ে একটি অণুকে অন্য অণু থেকে পৃথক করা বেশী সহজ ঃ তাছাড়া দূরত্বের তুলনায় শক্তির প্রভেদ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। যেখানে অণুর সংগঠক অক্সিজেন পরমাণুদের আলাদা করার জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি প্রায় 100Kcal/mol, সেক্ষেত্রে অক্সিজেন অণুদের পরস্পর থেকে আলাদা করার জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি মাত্র 2Kcal/mol এরও কম।

তাই অণুদের স্থিতিশক্তি লেখচিত্রে, স্থিতিশক্তি কূপ উল্লম্ব অক্ষ থেকে অনেক বেশী দূরে অবস্থিত, তাছাড়া কূপের গভীরতাও কম।

কিন্তু এগুলিতেই অণুর সংগঠক পরমাণুদের মিথষ্ক্রিয়া এবং অণুদের পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার সব প্রভেদ শেষ হয়ে যায় না।

রসায়নবিদ্‌রা দেখিয়েছেন যে, একটি অণুর মধ্যে আবদ্ধ পরমাণুদের সংখ্যা সবসময়ে নির্দিষ্ট। যদি দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু পরস্পর সংযুক্ত হয়ে হাইড্রোজেন অণু গঠন করে থাকে, তাহলে কোনো তৃতীয় পরমাণু এসে তাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না। জলের অণুর মধ্যে একটি অক্সিজেন পরমাণু দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে সংযুক্ত এবং অন্য কোনো পরমাণুকে তাদের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া অসম্ভব।

আন্তঃআণবিক মিথষ্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের কোনো কিছুর সাক্ষাৎ পাই না। প্রতিবেশী একটি অণুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে আনার পর কোনো অণু তার এই 'আকর্ষণী বলকে' বিন্দুমাত্র হারায় না। আরও নতুন নতুন প্রতিবেশীর অবির্ভাব ঘটতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত স্থান সঙ্কুলান হয়।

'স্থান সঙ্কুলান হয়' কথার অর্থ কি? অণু কি সত্যি সত্যি আপেল কিম্বা ডিমের মতো জিনিস? একদিক দিয়ে চিন্তা করলে অবশ্যই এই ধরনের তুলনা সঠিক: অণু নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন বিশিষ্ট ভৌতকণিকা। অণুদের মধ্যবর্তী সাম্য অবস্থানের দূরত্ব তাদের আয়তনের মাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাপীয় গতি দেখতে কেমন (What Thermal Motion Looks Like)

'জীবিত অবস্থার' মধ্যে অণুগুলির মিথষ্ক্রিয়ার মান তুলনামূলকভাবে বেশী বা কম হতে পারে।

পদার্থের তিন অবস্থার—গ্যাসীয়, তরল এবং কঠিন—মধ্যে প্রভেদের কারণ তাদের মধ্যে আণবিক মিথষ্ক্রিয়ার ভূমিকার তফাৎ।

বিজ্ঞানীরা বিশেষ চিন্তা করেই গ্যাস নামকরণ করেছিলেন (নামটির উৎস গ্রীক শব্দ chaos অর্থাৎ বিশৃঙ্খলা)।

বাস্তবেও বস্তুর গ্যাসীয় অবস্থা, কণিকাগুলির পারস্পরিক বিন্যাস এবং গতিতে পূর্ণাঙ্গ বিশৃঙ্খল এবং লক্ষ্যহীন অবস্থার প্রকাশ। এমন কোনো অণুবীক্ষণ যন্ত্র নেই যার সাহায্যে গ্যাসীয় অণুগুলির গতি দেখতে পাওয়া সম্ভব, কিন্তু তা সত্ত্বেও পদার্থবিদ্‌রা এই অদৃশ্য জগতের জীবন যথেষ্ট পুঙ্খানু-পুঙ্খভাবে বর্ণনা করতে পারেন।

সাধারণ অবস্থায় (বায়ুমণ্ডলীয় চাপে এবং ঘরের উষ্ণতায়) এক ঘন সেন্টি-মিটার বায়ুর মধ্যে বিপুল সংখ্যক—প্রায় 2.5×10^{19} সংখ্যক, অণু বর্তমান।

প্রত্যেক অণুর অধিকৃত আয়তন $4 \times 10^{-20} cm^3$, অর্থাৎ এমন একটি ক্ষুদ্র ঘনকের আয়তনের সমান যার বাহুর দৈর্ঘ্য প্রায় 3.5×10^{-7} cm বা 35A। কিন্তু এক একটি অণুর প্রকৃত আয়তন আরও অনেক কম। যেমন বায়ুর প্রধান উপাদান অক্সিজেন বা নাইট্রোজেন অণুর প্রকৃত আয়তনের গড় 4Å।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, অণুগুলির মধ্যবর্তী গড় দূরত্ব অণুর প্রকৃত মাপের চেয়ে প্রায় দশগুণ বড় এবং তার অর্থ অণু পিছু বায়ুর গড় আয়তন অণুর প্রকৃত আয়তনের চেয়ে প্রায় হাজার গুণ বেশী।

কল্পনা করা যাক এমন এক সমতলভূমি যার উপর এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে মুদ্রা ফেলা হয়েছে এবং গড়ে প্রতি বর্গমিটার ভূমির উপর একশো মুদ্রা রয়েছে। তার মানে আপনারা যে বই পড়ছেন তার পৃষ্ঠার মাপের সমান জায়গায় একটি বা দুটি মুদ্রা পড়েছে। এই হচ্ছে গ্যাস অণু যেভাবে বিন্যস্ত তার আনুমানিক চিত্র।

গ্যাসের প্রতিটি অণু অবিরাম তাপীয় গতির অবস্থায় থাকে।

একটি একক অণুকে বিবেচনা করা যাক। এই মুহূর্তে এটি দ্রুতবেগে ডানদিকে যাচ্ছে। যদি অণুটি তার গতিপথে কোনো বাধার সম্মুখীন না হয় তাহলে সে সমবেগে সরলরেখা পথে চলতেই থাকবে। কিন্তু অণুটির গতিপথ তার অসংখ্য প্রতিবেশীর ভীড়ে ভারাক্রান্ত। সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী, আর এই ধরনের সংঘর্ষের ফলে ধাক্কা খাওয়া বিলিয়ার্ড বলের মতো অণুগুলি পরস্পর থেকে দূরে ছিট্কে যাবে। আলোচ্য অণুটি কোন দিকে যাবে? তার গতি বাড়বে না কমবে? সব কিছুই সম্ভব ঃ কেননা সংঘর্ষগুলি যে কোনো ধরনের হতে পারে। ধাক্কা লাগতে পারে সামনের দিকে কিম্বা পিছনের দিকে, ডাইনে কিম্বা বাঁয়ে, জোরেও লাগতে পারে কিম্বা লাগতে পারে আস্তে। স্পষ্টতঃ এই ধরনের অনিয়মিত কিন্তু অবিরাম এলোমেলো সংঘর্ষের জন্য আমাদের আলোচ্য অণুটি যে পাত্রে গ্যাস রাখা হয়েছে সেই পাত্রের ভিতরকার সব অঞ্চল দিয়েই যাতায়াত করতে বাধ্য হবে।

সংঘর্ষের মধ্যে না গিয়ে গ্যাস অণু কতদূর পর্যন্ত এগোতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর অণুর মাপ আর গ্যাসটির ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল। অণুর মাপ যত বড় হবে এবং পাত্রের মধ্যে অণুর সংখ্যা যত বাড়বে, তত বেশী ঘন ঘন সংঘর্ষ ঘটতে থাকবে। সাধারণ অবস্থায় সংঘর্ষ না ঘটিয়ে একটি অণু যে গড় দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে—যাকে বলা হয় গড় মুক্ত পথ (mean free path)—তার মান হাইড্রোজেন অণুর ক্ষেত্রে 11×10^{-6} cm বা 1100 Å এবং অক্সিজেন অণুর ক্ষেত্রে 5×10^{-6} cm বা 500 Å। 5×10^{-6} cm দূরত্ব

(এক মিলিমিটারের বিশ হাজার ভাগের একভাগ) খুবই ছোট মাপ, কিন্তু আণবিক মাপের তুলনায় কোন মতেই ছোট নয়। অক্সিজেন অণুর 5×10^{-6}cm গড় মুক্ত পথ, অণুগুলি বিলিয়ার্ড বলের মাপের হলে দশ মিটার দূরত্বের সঙ্গে তুলনীয় হত।

গ্যাসের গঠনে অণুগুলি অনেক দূরে দূরে থাকে এবং তাদের মধ্যে সংঘর্ষও হয় কদাচিৎ, কিন্তু তরলের গঠনে অবস্থা মৌলিক ভাবে ভিন্ন। তরলের মধ্যে একটি অণুর অত্যন্ত কাছে সব সময়ে অন্য অনেক অণু উপস্থিত থাকে। যে ভাবে আলু ঠাসা থাকে বস্তার মধ্যে, ঠিক সে ভাবে তরলের মধ্যে থাকে অণু। অবশ্য একটা তফাৎ সত্যি আছে: তরলের ভিতরকার অণুগুলি সব সময়ে এলোমেলো বিশৃঙ্খল তাপীয় গতিতে চঞ্চল। তরলের অণুগুলি সব সময়ে বেশী ভীড় করে থাকে বলে সেগুলি গ্যাসের অণুর মতন অত নির্বাধায় ঘোরাফেরা করতে পারে না। প্রত্যেকেই একই প্রতিবেশীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে 'সময় গোণে' এবং অত্যন্ত ধীরে ধীরে তরল অধিকৃত আয়তনের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। তরল যত বেশী সান্দ্র হয়, ঘোরাফেরা করার গতিও হয় তত ধীর। কিন্তু জলের মতো 'প্রবাহশীল' তরলেও একটি অণু যে সময়ে 3 Å দূরত্ব অতিক্রম করে সেই একই সময়ে একটি গ্যাস অণু দ্বারা অতিক্রান্ত দূরত্বের পরিমাণ 700 Å।

কঠিন পদার্থের অণুগুলির পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার বল অটলভাবে তাদের তাপীয় গতির মোকাবিলা করে। কঠিন পদার্থের মধ্যে সব সময়ে অণুগুলির অবস্থান প্রায় নির্দিষ্ট। তাপীয় গতির একমাত্র ফল এই যে, অণুগুলি তাদের সাম্য অবস্থানের চারিদিকে অনবরত স্পন্দিত হয়। অণুর স্থানচ্যুতির এই অনীহাকেই আমরা কাঠিন্য বলি। বস্তুতঃ অণুগুলি যদি প্রতিবেশী পরিবর্তন না করে তাহলে বস্তুর আলাদা আলাদা অংশগুলি পরস্পরের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ বলে ধরা চলে।

বস্তুর সঙ্কোচন ক্ষমতা (Compressibility of Bodies)

বৃষ্টির ফোঁটা যেমন ছাদে আঘাত করে, তেমনি গ্যাসের অণুগুলি এসে আঘাত করে পাত্রের দেওয়ালের গায়ে। এই আঘাতের সংখ্যা অত্যধিক এবং এই সব আঘাতের যোগফলই সৃষ্টি করে সেই চাপ যা ইঞ্জিনের পিষ্টন ঘোরায়, গোলা বিস্ফোরিত করে কিম্বা বেলুন ফুলায়। আণবিক আঘাতের ধারাপ্রপাত— এর ফলেই সৃষ্ট বায়ুমণ্ডলীয় চাপ, এর ফলেই লাফায় ফুটন্ত চায়ের কেটলির ঢাকা, এই বলই রাইফেল থেকে বুলেট ছোটায়।

গ্যাসীয় চাপ কিসের সঙ্গে সম্পর্কিত? স্পষ্টতঃ অণুর আঘাত যদি

বেশী জোরালো হয়, তাহলে চাপও বাড়ে। আবার এটা বোঝাও শক্ত নয় যে, চাপের পরিমাণ সেকেণ্ড পিছু আঘাত সংখ্যার ওপরও নির্ভর করে। পাত্রের মধ্যে অণুর সংখ্যা যত বেশী হয়, আঘাত ঘটে তত ঘন ঘন এবং চাপও ততই বেড়ে যায়। সুতরাং কোনো গ্যাসের চাপ P প্রথমতঃ তার ঘনত্বের সঙ্গে সমানুপাতিক।

যদি গ্যাসের ভর নির্দিষ্ট হয়, তাহলে তার আয়তন কমালে ঘনত্ব সেই অনুপাতে বাড়ে। তাই বদ্ধপাত্রে কোনো গ্যাসের চাপ তার আয়তনের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতে বদলায়। কিম্বা অন্যভাবে বলা যায় যে, চাপ এবং আয়তনের গুণফল একটি ধ্রুবক।

PV = ধ্রুবক

এই সরল সূত্রটি প্রথম আবিষ্কার করেন ইংরেজ বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল (1627-91) ও ফরাসী বিজ্ঞানী এদ্‌মে মারিয়ৎ (1620—84)। বয়েলের সূত্র (মারিয়তের সূত্র নামেও পরিচিত) ভৌতবিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রথম পরিমাণগত সূত্রগুলির অন্যতম। অবশ্য কেবলমাত্র নির্দিষ্ট তাপমাত্রাতেই এই সূত্র কার্যকর।

গ্যাসকে যত বেশী সঙ্কুচিত করা যায় বয়েলের সূত্র থেকে তার বিচ্যুতি ঘটে তত বেশী। অণুগুলি পরস্পরের কাছাকাছি আসে এবং তাদের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া উৎপন্ন হয়ে গ্যাসটির আচরণ পরিবর্তিত করে।

বয়েলের সূত্র কেবল সেই সব ক্ষেত্রেই সিদ্ধ হয়, যখন গ্যাস-অণুগুলির মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার বলের প্রভাবজনিত ব্যতিচার নগণ্য। তাই বয়েলের সূত্রকে আদর্শ-গ্যাস সূত্র বলে।

'গ্যাস' শব্দের গুণবাচক বিশেষণ হিসেবে 'আদর্শ' শব্দটির ব্যবহার কিছুটা কৌতুককর মনে হতে পারে। আদর্শ শব্দের মানে নিখুঁত, অর্থাৎ যার থেকে শ্রেষ্ঠতর কিছু থাকতে পারে না।

একটি ছবি বা মডেল যত সরল হয়, পদার্থবিদ্‌দের কাছে তা ততই আদর্শ স্থানীয় হয়ে ওঠে। হিসেব সরলতর হয় এবং ভৌত প্রক্রিয়াগুলিকে বেশী সহজে আর পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। 'আদর্শ গ্যাস' শব্দটিকেও তাই গ্যাসের সরলতম চিত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। বেশ নিম্নচাপে গ্যাসের আচরণ আদর্শ গ্যাসের আচরণের মতো।

তরল পদার্থ গ্যাসের চেয়ে কম সঙ্কুচিত হয়। তরলের ভিতরকার অণুগুলি ইতিমধ্যেই গায়ে গায়ে লেগে গেছে। সঙ্কোচনের মানে কেবল 'জোটবন্দী' হওয়ার বন্ধনের উন্নতি এবং অতি উচ্চচাপের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অণুগুলির ওপরেও চাপ সৃষ্টি। যে মাত্রায় বিকর্ষণী বল তরলের সঙ্কোচনের পথে বাধা সৃষ্টি করে,

তা নিম্নলিখিত তথ্য থেকে বোঝা যাবে। এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপ থেকে দুই বায়ুমণ্ডলীয় চাপে চাপবৃদ্ধি ঘটলে গ্যাসের আয়তন অর্ধেক হয়ে যায়, যেখানে সমপরিমাণ চাপবৃদ্ধিতে জলের আয়তন কমে $\frac{1}{20000}$ অংশ এবং পারদের $\frac{1}{250000}$ অংশ।

এমনকি মহাসাগরের গভীর স্তরের বিপুলচাপও জলকে লক্ষ্যণীয় মাত্রায় সংকুচিত করে না। বস্তুতঃ জলের দশমিটার স্তম্ভ প্রায় এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপ সৃষ্টি করে। সুতরাং দশ কিলোমিটার গভীর জলে উদ্ভুত চাপের পরিমাণ প্রায় 1000 বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমান। এই চাপে জলের সঙ্কোচনের মাত্রা $\frac{1000}{20,000}$ অর্থাৎ মাত্র $\frac{1}{20}$ অংশ।

কঠিনের সঙ্কোচন ক্ষমতা এবং তরলের সঙ্কোচন ক্ষমতার মধ্যে তফাৎ খুব সামান্য। এটা বোঝা খুব শক্ত নয়, কেননা উভয় ক্ষেত্রেই অণুগুলি গায়ে গায়ে লেগে থাকে এবং আরও বেশী সংকুচিত করতে হলে ইতিমধ্যেই প্রবলভাবে বিকর্ষণ-শীল অণুগুলিকে আরও বেশী কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। 50—100 হাজার বায়ুমণ্ডলীয় চাপের মতো অতি উচ্চ চাপ সৃষ্টি করতে পারলে ইস্পাতের আয়তনকে হাজার ভাগের একভাগ এবং সীসার আয়তনকে সাত ভাগের একভাগ সংকুচিত করা যায়।

এই সব উদাহরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে পার্থিব অবস্থার মধ্যে কঠিন পদার্থকে আমরা উল্লেখযোগ্যভাবে সংকুচিত করতে পারি না।

কিন্তু মহাজগতে এমন স্থানও আছে যেখানে বস্তু অকল্পনীয় উচ্চবলের প্রভাবে সংকুচিত হয়। জ্যোতির্বিদরা এমন সব নক্ষত্র আবিষ্কার করেছেন যার মধ্যে বস্তুর ঘনত্ব $10^6 g/cm^3$ পর্যন্ত পেঁছেছে! সাদা বামন (সাদা তাদের আলোর রঙের জন্য এবং বামন তাদের ক্ষুদ্র আয়তনের জন্য) নামে পরিচিত এইসব নক্ষত্রের ভিতরকার চাপ অবশ্যই কল্পনাতীত উচ্চমাত্রার।

পৃষ্ঠটান (Surface Tension)

জলে ডুব দিয়ে ওঠার পর কি কারুর শরীর শুকনো থাকতে পারে? নিশ্চয়ই পারে, যদি সে ডুব দেওয়ার আগে এমন কিছু মেখে থাকে যা জলে ভেজে না।

একটি আঙুলে ভালো করে প্যারাফিন মোম ঘষে তারপর সেটি জলে ডোবান। জল থেকে আঙুল তুলে নেওয়ার পর দেখবেন তার গায়ে দু তিন ফোঁটার বেশী জল লেগে নেই। একটু নাড়ুন, সেই কয়েক ফোঁটাও ঝরে যাবে৷

এই বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা বলি, জল প্যারাফিন মোমকে ভেজায় না। প্রায় সব কঠিন বস্তুর ক্ষেত্রে পারদও অনুরূপ ব্যবহার করে; চামড়া, কাঁচ বা কাঠ পারদে ভেজে না।

জলের আচরণ অনেক বেশী গোলমেলে। কতগুলি বস্তুকে জল খুব ভালো ভাবে ভেজায়, আবার কতগুলিকে স্পর্শ করে না। জল তৈলাক্ত তলকে ভেজায় না কিন্তু পরিষ্কার কাঁচকে ভালোভাবে ভিজিয়ে দেয়। জল, কাঠ, কাগজ কিম্বা পশমকেও ভেজায়।

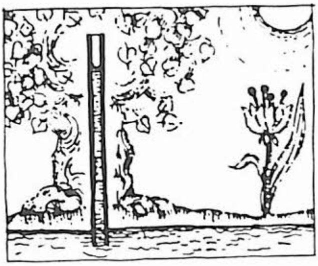
একটি পরিষ্কার কাঁচের প্লেটে এক ফোঁটা জল ফেললে তা ছড়িয়ে গিয়ে অগভীর ডোবার ক্ষুদ্র সংস্করণে পরিণত হয়। কিন্তু যদি ঐ একই জলবিন্দু একটি প্যারাফিন মোমের খণ্ডের উপর ফেলা হয়, তাহলে বিন্দুটি প্রায় গোলকাকৃতি একটি বিন্দুই থাকবে, শুধু অভিকর্ষের জন্যে গোলক আকৃতি যাবে সামান্য চেপ্টে।

যে সব পদার্থ অন্য প্রায় সব পদার্থের গায়ে লেগে থাকতে চায়, তাদের একটি হল কেরোসিন। কাঁচ বা ধাতুর গা বরাবর প্রবাহিত হওয়ার ক্ষমতা আছে বলে কেরোসিন ভালোভাবে ছিপি না আটকানো পাত্র থেকে উপ্‌ছে বেরিয়ে আসে। চল্‌কে বেরোনো একটুখানি কেরোসিন একজনকে অনেকক্ষণ দুর্গন্ধে ভরপুর করে রাখতে পারে: কেরোসিন অনেকখানি তল অধিকার করে, এগোয় ফাটল ধরে আর জামাকাপড়ের মধ্যে চুঁইয়ে যায়। তাই কেরোসিনের দুর্গন্ধ দূর করা এতো শক্ত।

বস্তুকে ভেজানোর অক্ষমতা ব্যবহার করে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক প্রক্রিয়া করা যায়। একটি ছুঁচে ভালো করে গ্রীজ মাখিয়ে খুব সাবধানে জলের উপরতলে শুইয়ে দিন। ছুঁচটি ডুবে যাবে না। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে ছুঁচ জলের তলকে নীচে নামিয়ে দিয়ে উৎপন্ন শূন্যস্থানে শান্তভাবে শুয়ে আছে। অবশ্য ছুঁচটিকে জলপাত্রের তলায় পাঠানোর জন্যে যৎসামান্য চাপই যথেষ্ট। এজন্যে প্রয়োজন ছুঁচের কেবল একটি অংশকে জলের বহির্তলের নীচে নামানো।

এই কৌতূহলোদ্দীপক ধর্মের সাহায্য নিয়ে অনেক জলজ পতঙ্গ নিজেদের পা না ভিজিয়ে জলের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলাফেরা করে।

ভেজানোর ক্ষমতা ব্যবহার করে আকরিককে 'ভাসন পদ্ধতির' সাহায্যে পরিশোধন করা হয়। 'ভাসনের' মানে 'বহির্তলে নিয়ে আসা।' পদ্ধতিটির সারাংশ এইরকম। ভালোভাবে গুঁড়ো করা আকরিককে একটি জলপূর্ণ পাত্রে নেওয়া হয়। তারপর যোগ করা হয় অল্প বিশেষ ধরনের তেল; এমন তেল যা আকরিক কণিকাগুলিকে ভেজায় কিন্তু খনিজমল-এর (আকরিকের সঙ্গে মিশে



চিত্র 2.4

থাকা পাথর এবং অপ্রয়োজনীয় খনিজ এই নামে পরিচিত) কণিকাগুলিকে ভেজায় না। মেশানোর পরে আকরিকের কণিকাগুলি তেলের পাতলা আস্তরণে আবৃত হয়।

এরপর আকরিক, তেল আর জলের মিশ্রণের নীচে বায়ু চালনা করা হয়। এর ফলে সেখানে তৈরী হয় অসংখ্য ছোট ছোট বাতাসের বুদ্‌বুদ্‌ বা ফেনা। বুদ্‌বুদ্‌গুলি বহির্তলে উঠে আসে। তেলে আবৃত কণিকাগুলি বাতাসের বুদ্‌বুদের গায়ে আট্‌কে থাকে—এই নীতিই ভাসন পদ্ধতির ভিত্তি। বড় বুদ্‌বুদ বেলুনের মতো ছোট কণিকাকে বয়ে ওপরে নিয়ে আসে।

আকরিক ফেনার আকারে জলের বহির্তলে জমা হয় আর খনিজমল পড়ে থাকে পাত্রের তলায়। ফেনাকে সরিয়ে পরবর্তী ধাপে "গাঢ়ীকৃত আকরিকে" পরিণত করা হয়, যার মধ্যে খনিজমলের পরিমাণ কমে আগের এক দশমাংশে দাঁড়ায়।

বিভিন্ন তলের মধ্যে সংসঞ্জন বল অর্থাৎ পরস্পর আটকে থাকার বল তরলের সমোচ্চশীলতা ধর্মকে অগ্রাহ্য করতে পারে। এই কথার সত্যতা খুব সহজেই প্রমাণ করা যায়।

যদি একটি সূক্ষ্ম কাঁচের নল (যার ব্যাস এক মিলিমিটারের ভগ্নাংশ) জলে ডোবানো হয়, তাহলে তরলের সমোচ্চশীলতা ধর্ম অগ্রাহ্য করে নলটির মধ্যে জল ঢুকে ভিতরের জলতলকে বাইরের পাত্রের জলতলের চেয়ে আরও উঁচু করে তুলবে (চিত্র 2.4)।

ঠিক কি ঘটে ? জলের যে স্তম্ভ উঁচুতে উঠে আছে তার ভারকে ধরে রাখে কোন বল ? এই উঁচুতে ওঠার প্রক্রিয়া ঘটার কারণ কাঁচ ও জলের মধ্যের সংসঞ্জন বল।

বিভিন্ন তলের পারস্পরিক সংসঞ্জন বল পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যদি যথেষ্ট সূক্ষ্ম কোনো নলের মধ্যে তরল উঁচুতে ওঠে। নলের ব্যাস যত ছোট হয়, তত ওপরে ওঠে নলের ভিতরকার তরল এবং তত স্পষ্টতর হয়ে ওঠে প্রক্রিয়াটি। তল সম্পর্কীয় এইসব প্রক্রিয়াগুলির নাম, নলের নামের সঙ্গে সম্পর্কিত। এইসব নল, যাদের ব্যাস এক মিলিমিটারের ভগ্নাংশ মাত্র, তারা কৈশিক নল নামে পরিচিত (যার অর্থ কেশ বা চুলের মতো সূক্ষ্ম)। সূক্ষ্ম নলের মধ্যে তরলের উঁচুতে ওঠার প্রক্রিয়াকে কৈশিকতা বলে।

কিন্তু কৈশিকনল কত উঁচুতে তরলকে তুলতে পারে ? দেখা যায় যে এক মিলি-মিটার ব্যাসযুক্ত কৈশিক নলের মধ্যে জল 1.5 মিলিমিটার উঁচুতে ওঠে। 0.01 মিলিমিটার ব্যাসযুক্ত কৈশিক নলের মধ্যে জল উঠবে আগের তুলনায় ব্যাস যত ভাগ কমেছে ততগুণ বেশী, অর্থাৎ 15 সেন্টিমিটার।

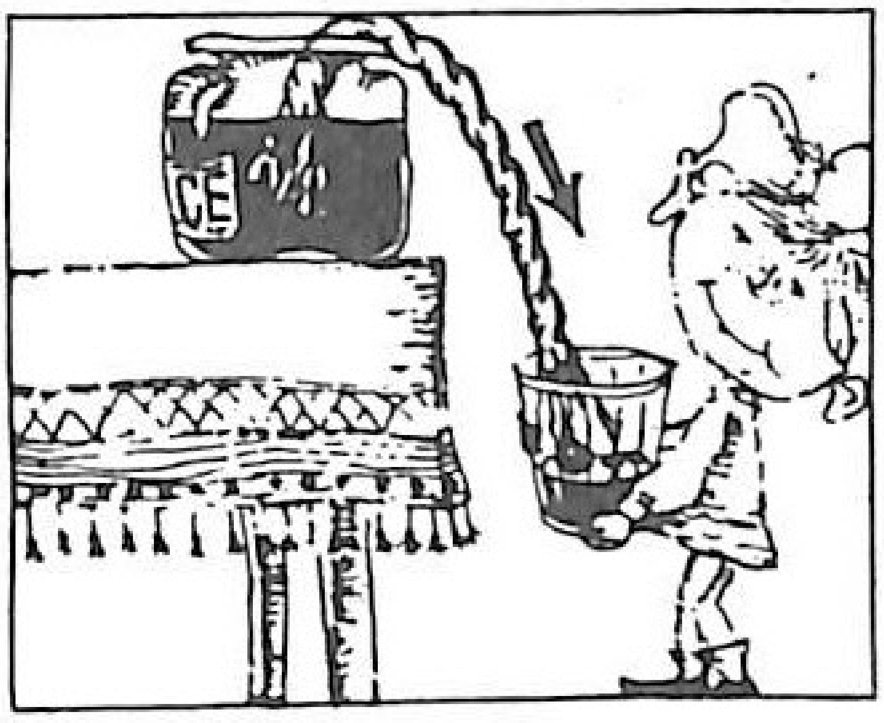
অবশ্য তরলের এই উঁচুতে ওঠার প্রক্রিয়া কেবল তখনি ঘটে যখন তরলটি নলটিকে ভিজিয়ে দিতে পারে। অনুমান করা শক্ত নয় যে পারদ কাঁচের নলের মধ্যে উঁচুতে উঠতে পারবে না। বাস্তবে দেখা যায় যে কাঁচের নলের মধ্যে পারদের তল উপরে না উঠে বরং নীচে নেমে আসছে। পারদ কাঁচের সংস্পর্শ সম্পর্কে এতোই 'অসহিষ্ণু' যে, সে অভিকর্ষজ বল মেনে নিয়ে সর্বনিম্ন পরিমাণ সংযোগ তল বজায় রাখার চেষ্টা করে।

এমন অনেক সামগ্রী আছে যারা অতি সূক্ষ্ম নলের সমবায়ের মতো কাজ করে। এই সব সামগ্রীর মধ্যে সবসময়ে কৈশিকনল প্রক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদ কিম্বা বৃক্ষের মধ্যে দীর্ঘনালী আর সুড়ঙ্গযুক্ত প্রত্যঙ্গ আছে। এই সব নালীর ব্যাস মিলিমিটারের শতাংশেরও কম। এজন্যে কৈশিক বল মাটির জলীয় অংশকে অনেক উঁচুতে তুলতে এবং সমস্ত উদ্ভিদ দেহে জল সরবরাহ করতে পারে।

ব্লটিং পেপার খুব দরকারি জিনিস। হয়তো আপনি কাগজে কালি ফেলেছেন আর চাইছেন কাগজটা উল্টোতে। কিন্তু যতক্ষণে কালিটা শুকোয় ততক্ষণ অপেক্ষা করার অবকাশ আপনার নেই। আপনি একটি ব্লটিং পেপার নিয়ে তার একটা ধার কালির বিন্দুটির মধ্যে ডোবালেন এবং কালি অভিকর্ষের বিরুদ্ধে উপরদিকে দ্রুত ব্লটিং পেপারের মধ্যে চলে এল।

কৈশিক প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যসূচক একটি ঘটনা ঘটল। অণুবীক্ষণের ভিতর দিয়ে দেখলে আপনি ব্লটিং পেপারের গঠন দেখতে পাবেন। কাগজের তন্তুগুলি জালের মতো পরস্পর জড়িয়ে রয়েছে আর তাদের মধ্যে রয়েছে লম্বা, পাতলা অনেক নালী। এই নালীগুলিই কৈশিক নলের কাজ করে।

সলতের মধ্যেও এই ধরনের দীর্ঘ নালী বা সুড়ঙ্গ থাকে। লণ্ঠনের সলতের



চিত্র 2.5

নালী বেয়ে কেরোসিন ওপরে ওঠে। সলতের সাহায্যে সাইফনও করা যায়, যদি সলতের একটি প্রান্ত আধভরা জলের পাত্রে ডুবিয়ে অন্যপ্রান্তটিকে প্রথম প্রান্ত থেকে নীচুতে ঝুলিয়ে রাখা হয় (চিত্র 2.5)।

কাপড় রং করার পদ্ধতিতেও অনেক সময়, সুতোয় উপস্থিত সুড়ঙ্গগুলির ভিতর দিয়ে কাপড়ের তরল পদার্থ শোষণ করার ক্ষমতার সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

আমরা এখনো পর্যন্ত এই কৌতূহলোদ্দীপক প্রক্রিয়ার আণবিক কৌশল সম্পর্কে কোনো কিছু বলিনি।

আন্তঃআণবিক মিথষ্ক্রিয়ার সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থের তলটান-এর তফাৎ চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

কাঁচের তলের উপর পারদ-বিন্দু ছড়িয়ে পড়ে না। এর কারণ, পারদ পরমাণুগুলির পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার শক্তি পারদ পরমাণু এবং কাঁচের ভিতরকার সংসঞ্জন শক্তির চেয়ে বেশী। একই কারণে পারদ কাঁচের কৈশিক নল বেয়ে ওপরে ওঠে না।

জলের ব্যাপারটা আলাদা। দেখা গেছে যে জল অণুর ভিতরকার হাইড্রোজেন পরমাণু অতি সহজে কাঁচের ভিতরকার অক্সিজেন পরমাণুতে সংলগ্ন বা সংসঞ্জিত হতে পারে। জল-কাঁচের আন্তঃআণবিক বল, জল-জলের আন্তঃআণবিক বলের চেয়ে বেশী। তাই কাঁচের তলের উপর জল পাতলা আস্তরণ গড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং কাঁচের কৈশিক নল বেয়ে উপরে ওঠে।

বিভিন্ন যুগলের তলটান কিম্বা আরও সঠিকভাবে সংসঞ্জন বল (চিত্র 2.1 তে স্থিতিশক্তি কূপের গভীরতা) পরিমাপ করে অথবা হিসাব করে বের করা সম্ভব। কিন্তু কিভাবে তা করা হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয় থেকে অনেকদূর সরে যাব।

কেলাস এবং তার আকার (Crystals and Their Shape)

অনেকে মনে করেন যে কেলাস মাত্রেই সুন্দর দুষ্প্রাপ্য পাথর। এগুলি সাধারণতঃ বিভিন্ন রঙের, স্বচ্ছ এবং সর্বোপরি সুন্দর জ্যামিতিক আকৃতির হয়ে থাকে। সাধারণতঃ কেলাস আদর্শ সমতল ক্ষেত্র এবং নিখুঁত সরলরেখা দ্বারা বেষ্টিত বহুতলক। আশ্চর্য সুষম গঠন এবং সমতল সীমান্তে রঙের সমারোহের জন্য কেলাস নয়ন তৃপ্তিকর।

এগুলির মধ্যে রয়েছে সৈন্ধব লবণ বা খাদ্য লবণ অর্থাৎ প্রাকৃতিক সোডিয়াম ক্লোরাইড। প্রকৃতিতে এই যৌগকে ঘনকাকৃতি (cubical) বা আয়তাকার চৌপল (rectangular parallelepiped) কেলাসের আকারে দেখতে পাওয়া যায়। ক্যালসাইট কেলাসের আকারও সরল—স্বচ্ছ তির্যক্‌কোণী চৌপল (oblique-angled parallelepiped)। কোয়ার্টজের কেলাস অনেক বেশী জটিল। প্রত্যেকটি ছোট কেলাসের বিভিন্ন আকারের অনেকগুলি করে তল আছে, যেগুলি বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বাহুতে মিলিত।

যাই হোক কেলাসকে কোনো মতেই যাদুঘরে জমিয়ে রাখার জিনিস বলে মনে করা উচিত নয়। কেলাস রয়েছে আমাদের চতুর্দিকে। যে সব কঠিন পদার্থ দিয়ে আমরা ঘরবাড়ি কিম্বা যন্ত্র নির্মাণ করি, যে সব সামগ্রীকে আমরা প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করি, প্রায় সব কিছুই কেলাস দিয়ে গড়া। কিন্তু কেন আমরা এগুলিকে দেখতে পাই না? এর কারণ প্রকৃতিতে আমরা খুব কমই এমন সামগ্রীর মুখোমুখি হই যা একটিমাত্র কেলাস দিয়ে গড়া (কিম্বা যাকে বলা হয় এককেলাসী)। অধিকাংশ সময়েই এমন ধরনের সামগ্রীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যেগুলি অতি ক্ষুদ্র—মিলিমিটারের সহস্রাংশের মাত্রা বিশিষ্ট—দৃঢ়বদ্ধ কেলাসের সমাহার। এই ধরনের গঠন কেবলমাত্র অণুবীক্ষণের সাহায্যেই দেখতে পাওয়া যায়।

যে সব বস্তু অতি ক্ষুদ্র কেলাসিত কণার সমাহার, তাদের বহু কেলাসী বা polycrystalline বলে (গ্রীক polys শব্দের অর্থ বহু)।

অবশ্যই বহুকেলাসী বস্তুকেও কেলাস শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা উচিত। তাহলে প্রতীয়মান হবে যে আমাদের চারপাশের প্রায় সব কঠিন পদার্থই কেলাস। বালি আর গ্রানাইট পাথর, তামা আর লোহা, ওষুধের দোকানের স্যালল (salol) আর রং, এ সব কিছুই কেলাস।

ব্যতিক্রম আছে ; কাঁচ কিম্বা প্লাস্টিক ছোট ছোট কেলাস দিয়ে তৈরী নয়। এই ধরনের কঠিন পদার্থকে অনিয়তাকার (amorphous) বলে।

সুতরাং কেলাস সম্পর্কে অনুশীলন করার অর্থ আমাদের চারপাশের প্রায় সব বস্তু সম্পর্কে অনুশীলন করা। স্বভাবতঃই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

একক কেলাসকে সহজেই তাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখে সনাক্ত করা যায়। মসৃণ তল এবং সরলরৈখিক প্রান্ত কেলাসের বৈশিষ্ট্য; নিয়মানুগ আকৃতি নিঃসন্দেহে কেলাসের নিয়মানুগ আভ্যন্তরীণ গঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত। যদি কোনো কেলাস একটি অভিমুখে বিশেষভাবে দীর্ঘ হয়, তাহলে তার অর্থ, কেলাসটির আভ্যন্তরীণ গঠনেও উক্ত অভিমুখে কোনো না কোনো বিশেষত্ব আছে।

কিন্তু কল্পনা করুন যন্ত্রের সাহায্যে একটি বড় কেলাস কেটে একটি বল তৈরী করা হয়েছে। বলটি হাতে নিয়ে আমরা কি আমাদের হাতে কাঁচের বল নেই, কেলাস আছে, এই স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে পারি? কেলাসের বিভিন্ন তল বিভিন্ন মাত্রায় বিকশিত হয় বলে অনুমান করা যায় যে, কেলাসের ভৌতধর্মও বিভিন্ন অভিমুখে বিভিন্ন। এই বিভিন্নতা কেলাসের দৃঢ়তা, তড়িৎ পরিবহণ ক্ষমতা এবং অন্যান্য বহু ধর্মে পরিস্ফুট হয়ে থাকে। কেলাসের এই বৈশিষ্ট্যকে তার ধর্মের anisotropy অর্থাৎ বিষমসারকতা বা বিষমদৈশিকতা অর্থাৎ বিষমসারক বা বিষমদৈশিক বলে। Anisotropic বা বিষমদৈশিক শব্দের অর্থ বিভিন্ন অভিমুখে ধর্মের বিভিন্নতা।

কেলাস anisotropic বা বিষমদৈশিক; কিন্তু অনিয়তাকার বস্তু, তরল এবং গ্যাসীয় পদার্থ isotropic বা সমদৈশিক অর্থাৎ তাদের ধর্ম সকল অভিমুখেই সমান (গ্রীক isos শব্দের অর্থ সমান এবং tropos শব্দের অর্থ ঘোরানো)। কেলাসের এই anisotropic বা বিষমদৈশিক ধর্মের সাহায্যেই আমরা বুঝতে পারি কোনো নির্দিষ্ট আকারহীন স্বচ্ছ বস্তু কেলাস কিম্বা কেলাস নয়।

এবার ধাতুতত্ত্বের যাদুঘরে গিয়ে একই পদার্থের কয়েকটি এককেলাসীয় কেলাস পর্যবেক্ষণ করা যাক। এমন হতে পারে যে নিয়মানুগ এবং অনিয়মানুগ দু-ধরনের নমুনাই প্রদর্শনের জন্যে রাখা আছে। কয়েকটি কেলাসকে খণ্ডাংশের মতো আবার কতগুলির ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকভাবে বিকশিত তল দেখতে পাওয়া যাবে।

এবার নমুনাগুলির সংগ্রহ থেকে আদর্শস্থানীয় কয়েকটিকে বেছে নিয়ে তাদের ছবি আঁকা যাক। চিত্র 2.6 এ প্রদর্শিত ছবিগুলির মতো আমরা কয়েকটি ছবি পাব। এক্ষেত্রেও উদাহরণ হিসেবে কোয়ার্টজকে বেছে নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য পদার্থের কেলাসের মতো কোয়ার্টজও একই 'জাতির (kind)' বিভিন্ন সংখ্যক তল এবং একই সঙ্গে তলগুলির বিভিন্ন সংখ্যক 'জাতি (kind)' উৎপন্ন করতে পারে। যে সব ক্ষেত্রে তাদের সমাকৃতি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না, সেসব ক্ষেত্রেও এই সব ছোট কেলাসদের আকৃতি ঘনিষ্ট আত্মীয়ের মতো,



চিত্র 2.6

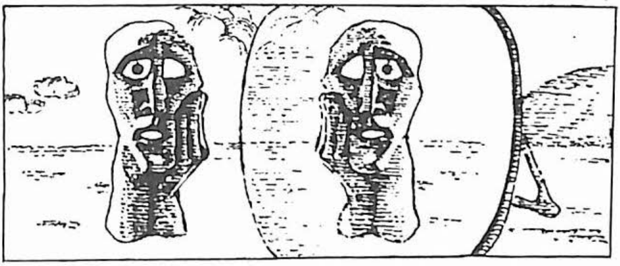
কোনো কোনো ক্ষেত্রে যমজ ভাইয়ের মতো পরস্পরের অনুরূপ। কিসের জন্য তাদের এই সাদৃশ্য ?

চিত্র 2.6 এর দিকে ভালো করে লক্ষ্য করুন। এগুলি বিভিন্ন কোয়ার্টজ কেলাসের নিদর্শন। এদের সকলেই ঘনিষ্ট 'আত্মীয়'। এদের সম্পূর্ণভাবে সমাকৃতি করতে হলে বিভিন্ন তলকে ঘষে এমনভাবে ছোট করে ফেলতে হবে যাতে ছোট হয়ে যাওয়া তলটি প্রাথমিক তলের সমান্তরাল অবস্থানে থাকে।

দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে II নং কেলাসকে এই প্রণালীতে I নং কেলাসের পুরোপুরি সমাকৃতিতে পরিণত করা যায়। এটা সম্ভব হয় এজন্যে যে সদৃশ তলগুলির মধ্যবর্তী কোণগুলির পরিমাণ সমান, যেমন, A এবং B-এর মধ্যবর্তী কোণ B এবং C এর মধ্যবর্তী কোণের সমান, ইত্যাদি।

কোণগুলির ক্ষেত্রে এই সমতাই কেলাসগুলির 'পারিবারিক' সাদৃশ্যের কারণ। যখন বিভিন্ন তলকে সমান্তরালভাবে ঘষে ছোট করা হয় তখন কেলাসের রূপ বদলায়, কিন্তু বিভিন্ন তলের মধ্যবর্তী কোণের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে।

যখন কেলাস বড় হতে থাকে তখন বিভিন্ন অনিয়মিত কারণে তার তলগুলির মধ্যে কয়েকটিতে অন্যগুলির তুলনায় পরমাণু বা অণুর নতুন স্তর বেশী সহজে যুক্ত হতে পারে। তাই বিভিন্ন অবস্থায় সৃষ্ট কেলাসের মধ্যে অনেক সময়ে



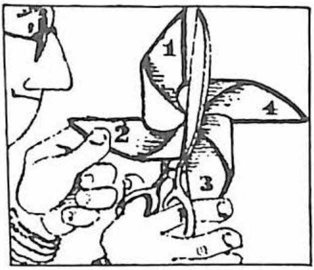
চিত্র 2.7

রূপের বিভিন্নতা দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের অনুরূপ তলগুলির মধ্যবর্তী কোণের পরিমাণ সমানই থাকে। কেলাসের রূপ (কিম্বা যাকে বলা হয় habit) কেমন হবে তা দৈবযোগের (chance) উপর নির্ভর করে কিন্তু তার বিভিন্ন তলের মধ্যবর্তী কোণের পরিমাণ নির্ভর করে তার আভ্যন্তরীণ গঠনের উপর (কেন যে এমন হয় তা আপনারা পরে জানতে পারবেন)।

কেলাস কেবলমাত্র তার তলের মসৃণতার জন্যেই আকারহীন বস্তু থেকে স্বতন্ত্র নয়। কেলাসের প্রতিসাম্যও (symmetry। থাকে। আমরা যে অর্থে শব্দটিকে ব্যবহার করব তা কতকগুলি দৃষ্টান্তের সাহায্য নিলে স্পষ্ট হবে।

চিত্র 2.7 তে আয়নার সামনে রাখা একটি মূর্তি (যা ইস্টার দ্বীপের বিখ্যাত মূর্তির কথা মনে করিয়ে দেয়) রয়েছে। আয়নায় প্রতিফলিত হয়েছে মূর্তিটির একটি নিখুঁত নকল (আসলে আয়নার প্রতিবিম্ব)। ধরুন একজন ভাস্কর উপরোক্ত মূর্তি এবং তার প্রতিবিম্বের অনুরূপ দুইটি প্রতিমূর্তিকে পৃথকভাবে গড়ে তুললেন। সেক্ষেত্রে সৃষ্ট যুগল ভাস্কর্য প্রতিসম বস্তুর নিদর্শন হবে। এর মধ্যে থাকবে দুটি সমান অংশ, একটি অপরটির আয়নার প্রতিবিম্ব এবং একজনের বাঁহাত অন্যের ডান হাতের তুল্য এই অর্থে যারা পরস্পর সমান।

ধরা যাক চিত্র 2.7 এর অনুরূপ একটি আয়না স্থাপন করা হয়েছে। তাহলে ভাস্কর্যটির ডানদিকের অংশ তার প্রতিবিম্বের বামদিকের অংশের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যাবে। এই ধরনের প্রতিসম সংজ্ঞায় আয়নাটি একটি উল্লম্ব প্রতিসাম্যতল, যা দুই অংশের মাঝামাঝি অবস্থিত। প্রতিসাম্যতল যদিও কাল্পনিক, তবু



চিত্র 2.8

প্রতিসম বস্তু পরীক্ষা করার সময়ে আমরা সুস্পষ্টভাবে তাকে অনুভব করতে পারি।

প্রাণীদেহে প্রতিসামাতল দেখতে পাওয়া যায়। বাহ্যিক প্রতিসাম্যের একটি উল্লম্বতল মানুষের ক্ষেত্রেও আছে। প্রাণীজগতের প্রতিসাম্য অবশ্য কোনো ক্ষেত্রেই পূর্ণাঙ্গ হয় না এবং সাধারণভাবে বলা যায় আমাদের চারপাশের জগতে আদর্শ প্রতিসাম্য বলে কিছু নেই। একজন স্থপতি দুটি আদর্শ প্রতিসম অংশে বিভক্ত বাড়ির নক্শা তৈরী করতে পারেন। কিন্তু বাড়ি তৈরীর কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর, যত নিখুঁতভাবেই সে কাজ করা হোক না কেন, প্রতিক্ষেত্রেই আপনি দুটি প্রতিসম অংশের মধ্যে কিছু না কিছু তফাৎ খুঁজে পাবেন ঃ হয়তো একটির কোনো এক জায়গায় দেখা যাবে এক ফাটল যা অন্যটির ক্ষেত্রে নেই।

অনেক বেশী নিখুঁত প্রতিসাম্য খুঁজে পাওয়া যায় কেলাসদের জগতে, যদিও সে ক্ষেত্রেও আদর্শ প্রতিসাম্য বিরল। খালি চোখে দেখা যায় না এমন ফাটল, আঁচড়ের দাগ কিম্বা অন্যান্য গলদ সবসময়েই আপাত দৃষ্টিতে সর্বসম তলগুলির মধ্যে অতি সামান্য তফাৎ গড়ে তোলে।

চিত্র 2.8 তে বাচ্চাদের খেলনা 'পিনগাঁথাপাখা' প্রদর্শিত হল। এর মধ্যেও প্রতিসাম্য আছে, কিন্তু আপনি কোনোভাবেই এর ভিতর দিয়ে একটি প্রতিসাম্য তল আঁকতে পারবেন না। তাহলে এই খেলনার মধ্যে প্রতিসাম্যতা কোনখানে ? প্রথমতঃ এর প্রতিসম অংশগুলিকে বিবেচনা করা যাক। কতগুলি আছে ? স্পষ্টতঃ চারটি। কিসের জন্য এদের সাম্যতা ? এটিও বোঝা সহজ। পিনগাঁথা পাখাটিকে এক সমকোণে, অর্থাৎ এক সম্পূর্ণ পাকের একচতুর্থাংশ ঘোরানো যাক। এখন 1 নং ডানা ঘুরে 2 নং ডানার জায়গায়, 2 নং 3 নং এর, 3 নং 4 নং এর এবং 4নং 1 নং এর জায়গায় এসেছে।

পিন গাঁথা পাখার নতুন অবস্থানকে পুরোন অবস্থান থেকে আলাদা করা যায় না। এক্ষেত্রে আমরা বলি আকৃতিটির একটি প্রতিসাম্য অক্ষ কিম্বা আরও সঠিকভাবে চারমাত্রার প্রতিসাম্য অক্ষ আছে, কেননা এটি সম্পূর্ণ পাকের এক চতুর্থাংশ ঘুরলে নিজের পুরোন অবস্থানের সঙ্গে সর্বতোভাবে মিলে যায়।

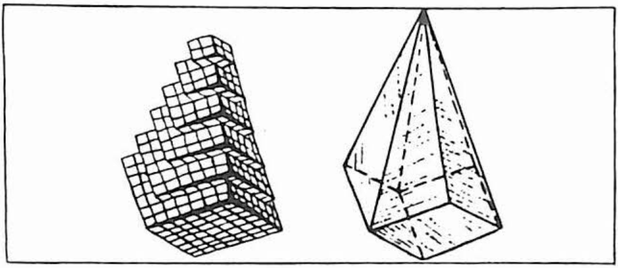
সুতরাং ঘূর্ণায়মান বা আবর্তন প্রতিসাম্য অক্ষ বলতে আমরা বুঝি এমন এক কাল্পনিক সরলরেখা যার চারদিকে কোনো বস্তুকে সম্পূর্ণ পাকের এক ভগ্নাংশ পরিমাণ ঘোরালে নতুন অবস্থান পুরনো অবস্থানের সঙ্গে সর্বতোভাবে মিলে যায়। আবর্তন প্রতিসাম্যের মাত্রার (আলোচ্য ক্ষেত্রে চারমাত্রা) সাহায্যে বোঝা যায় যে উপরোক্ত সর্বতোভাবে মিলে যাওয়ার ঘটনা ঘটে একটি সম্পূর্ণ পাকের এক চতুর্থাংশ ঘোরালে। সুতরাং চারবার এই ধরনের আবর্তন প্রতিসাম্য ঘটার পর বস্তুটি তার প্রাথমিক অবস্থানে ফিরে আসবে।

কেলাসের জগতে কি আমরা সব ধরনের প্রতিসাম্যের সাক্ষাৎ পাই ? পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তা পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ কেলাসের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র যে সব আবর্তন প্রতিসাম্য অক্ষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, সেগুলি হল দুই, তিন, চার এবং ছয় মাত্রার। এটি কোনো দৈবযোগের বিষয় নয়। কেলাস গবেষকরা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, বিষয়টি কেলাসের আভ্যন্তরীণ গঠনের উপর নির্ভরশীল। সেজন্য কেলাস প্রতিসাম্যের বিভিন্ন জাতির বা শ্রেণীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম—মাত্র 32 টি।

কেলাসের গঠন (Structure of Crystals) ;

সুষম গঠনের কোনো কেলাসকে দেখতে এতো সুন্দর কেন ? এর তলগুলি এতো মসৃণ আর উজ্জ্বল যে দেখে মনে হয় দক্ষ জহুরী পালিস করে দিয়েছে। কেলাসের বিভিন্ন অংশ, একে অন্যের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে, এক চমৎকার সুষম আকার গড়ে তুলেছে। সুদূর অতীত থেকেই মানুষ কেলাসের এই অসাধারণ সুষম আকারের কথা জানে। কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিতদের কেলাসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা, কেলাসের সৌন্দর্য আর মহিমায় উদ্দীপ্ত কবিদের লেখা গাথা আর উপকথার বর্ণনা থেকে খুব বেশী ভিন্ন ছিল না। অনুমান করা হত যে, পাথুরে কেলাস গড়ে ওঠে বরফ থেকে এবং হীরা পাথুরে কেলাস থেকে। কেলাসের মধ্যে অনেক আশ্চর্য ক্ষমতা আরোপ করা হত ; মনে করা হত যে কেলাস রোগ নিরাময় করতে পারে, বিষক্রিয়া রোধ করতে পারে, ভাগ্যের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ আছে, ইত্যাদি আরো অনেক কিছু।

কেলাস সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রথম গড়ে উঠতে থাকে সপ্তদশ-অষ্টাদশ খৃীস্টাব্দে। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর একটি ধারণা আপনারা পাবেন চিত্র 2.9 তে,



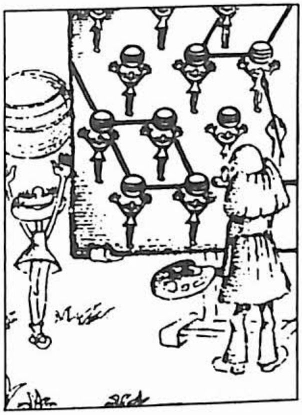
চিত্র 2.9

যা অষ্টাদশ শতকের শেষে ফ্রান্সের রেনে ইয়ুস্ট হায়ুই (Rene' Just Haüy) এর লেখা 'Traite de Mineralogie' থেকে নেওয়া হয়েছে। লেখকের মতে কেলাসমাত্রই অতি ক্ষুদ্র 'গঠনকারী একক' দিয়ে গড়ে উঠেছে, যেগুলি পরস্পরের সঙ্গে শক্তভাবে আঁটা। সাধারণ পর্যবেক্ষণ থেকেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব। 'আইসল্যাণ্ড স্পার (ক্যালসাইট বা ক্যালসিয়াম কার্বনেট)' এর একটি কেলাস হাতুড়ির ঘায়ে ভেঙ্গে ফেলুন। বিভিন্ন মাপের টুকরো চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। ভালোভাবে পরীক্ষা করলে দেখতে পাবেন যে টুকরোগুলোর আকৃতি একই রকম, মূল বড় কেলাসটির আকৃতির সঙ্গে হুবহু এক। এজন্যেই হায়ুই বলেছিলেন যে, যদি আমরা টুকরোগুলিকে ক্রমাগত ভেঙ্গে চলি, তাহলে আমরা শেষপর্যন্ত ক্ষুদ্রতম 'গঠনকারী এককে' এসে পৌঁছব, যা মূল পদার্থের এমন এক কেলাস যাকে খালি চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। এই চরম এককগুলি এতোই ছোট যে তারা পরস্পর সংযুক্ত হয়ে বড় কেলাসের তল গঠন করার সময় যে ছোট ছোট ধাপের সৃষ্টি করবে, সেগুলি আমাদের কাছে সমতল বলে মনে হবে।

আচ্ছা তা নয়তো হল। কিন্তু এই চরম এককগুলি ঠিক কিসের মতো ? সে যুগের বিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নি।

কেলাসের গঠনের 'গঠনকারী একক' তত্ত্ব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রভূত উপকার করেছে। এই তত্ত্ব কেলাসের সরলরৈখিক বাহু এবং সমতল কিভাবে গড়ে ওঠে সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছে। কেলাস যত বড় হতে থাকে, কেলাসের গায়ে নতুন নতুন 'গঠনকারী একক' ততই বেশী সংখ্যায় যুক্ত হয় এবং রাজমিস্ত্রীরা ইঁট গেঁথে যেমন বাড়ির দেয়াল তৈরী করে, ঠিক সেইভাবে তৈরী হয় কেলাসের তল।

তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে কেলাসের আকৃতির নিয়মানুগতা এবং সৌন্দর্যের কারণ সম্পর্কে প্রশ্নটির জবাব, অনেক আগেই পাওয়া গিয়েছিল। কেলাসের



চিত্র নং 2.10

আকৃতির নিয়মানুগতা এবং সৌন্দর্যের কারণ তার আভ্যন্তরীণ নিয়মানুগতা। একই গঠনকারী অংশের অসংখ্যবার পুনরাবৃত্তি দিয়ে গড়ে উঠেছে এই নিয়মানুগতা।

ধরুন একটি পার্কের বেড়া তৈরী করার সময় অসমান মাপের লোহার দণ্ড নিয়ে এলোমেলোভাবে বসানো হল। অবশ্যই দেখতে হবে জঘন্য। ভালো বেড়া তৈরী করতে হলে একই মাপের দণ্ড নিয়ে সমান সমান দূরত্বে বসানো উচিত। দেওয়াল ঢাকার কাগজের উপরেও আমরা একই নক্‌শার ঐ ধরনের নিয়মিত পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। সেক্ষেত্রে ছোট একটি নক্‌শা বা ছবির, ধরা যাক একটি মেয়ে বল খেলছে এই ছবির, সমদূরত্বে পুনরাবৃত্তি করা হয়, পার্কের বেড়ার মতো কেবল মাত্র একমাত্রিকভাবে নয়, দ্বিমাত্রিকভাবে একটি সমতল জুড়ে।

কিন্তু কেলাসের সঙ্গে পার্কের বেড়ার কিম্বা দেওয়ালঢাকার কাগজের কি সম্পর্ক? খুব নিকট সম্পর্ক। পার্কের বেড়ার মধ্যে সরলরেখা বরাবর একই রকম ফোকরের, দেওয়াল ঢাকার কাগজে সমতল জুড়ে একই রকম নক্‌শার এবং কেলাসের ত্রিমাত্রিক দেহের মধ্যে একই রকম পরমাণু জোটের পুনরাবৃত্তি ঘটে। তাই বলা হয় কেলাসের মধ্যে পরমাণুরা ত্রিমাত্রিক জাফ্‌রি বা কেলাস ল্যাটিস (lattice) গঠন করে।

ত্রিমাত্রিক জাফরির এমন কতকগুলি খুঁটিনাটি আছে যা আমাদের আলোচনা

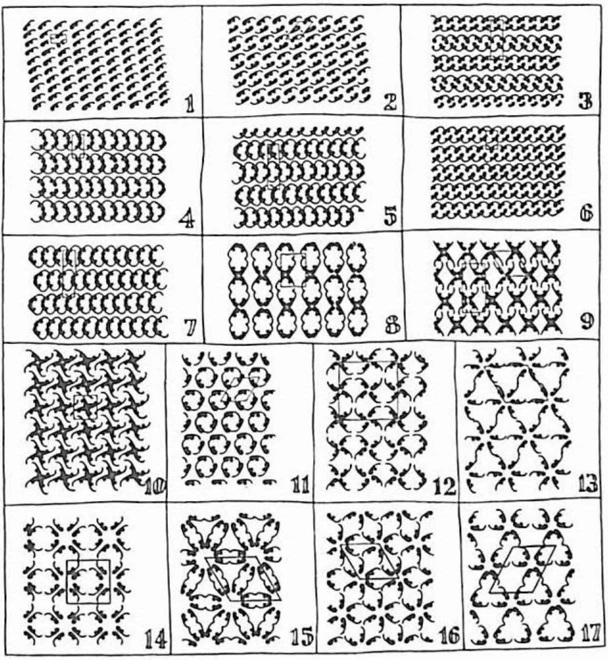
করা উচিত। সুবিধের জন্যে আমরা ত্রিমাত্রিক নক্শার জটিল ছবি দাঁড় করানোর চেষ্টা না করে সব কিছুই দেওয়ালঢাকার কাগজের সাহায্যে ব্যাখ্যা করব।

চিত্র 2.10 তে পৃথকীকৃতভাবে আমরা দেওয়ালঢাকার কাগজের ক্ষুদ্রতম এককে দেখতে পাচ্ছি যা দিয়ে গোটা দেওয়ালঢাকার কাগজটি গড়ে উঠেছে। এই ধরনের অংশকে পৃথক করার জন্যে ছবির যে কোনো বিন্দু থেকে দুটি সরলরেখা অংকনের প্রয়োজন, যেমন ধরা যাক যে কোনো বলের কেন্দ্রবিন্দু থেকে কাছের অন্য দুটি বলের একই বিন্দু পর্যন্ত দুটি সরলরেখা। ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেভাবে আমরা এই দুটি সরলরেখা ব্যবহার করে একটি সামন্তরিক অংকন করতে পারি। এই সামন্তরিকটিকে মূল সরলরেখা দুটির অভিমুখে তার বাহুগুলির দৈর্ঘ্যের সমান দূরত্ব অপসারিত করে আমরা ক্রমে ক্রমে গোটা দেওয়াল ঢাকার কাগজের নক্শাটাই পেয়ে যাবো। এই ক্ষুদ্রতম অংশটি, বারে বারে যার পুনরাবৃত্তি ঘটে, সাধারণভাবে একক কোষ নামে পরিচিত, একে বিভিন্ন উপায়ে নির্বাচিত করা যায়। চিত্র 2.10 থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে পৃথক একক হতে পারে এমন বিভিন্ন সামন্তরিক আঁকা সম্ভব। আলোচ্য ক্ষেত্রে আমরা এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, কোষের ভিতরের ছবিটি বিভিন্ন সরলরেখা দিয়ে ভাগ করা কিম্বা নয়, তার বিবেচনা অপ্রাসঙ্গিক।

এটা ভাবা ভুল যে যেটির পুনরাবৃত্তি হবে সেই ছবিটি (যাকে motif বলা হয়) আঁকার পর শিল্পীর কাজ শেষ হয়ে যাবে। এটা সত্যি হত, যদি প্রথম অংশটি আঁকার পর সেই অংশটিকে পুনরায় প্রথম দুটি মূল রেখার সামন্তরালভাবে সরিয়ে অন্য সদৃশ অংশের সহিত যোগ করার পদ্ধতিটি নকশা আঁকার একমাত্র পদ্ধতি বলে গণ্য করা হত।

কিন্তু বাস্তবে এই সরলতম পদ্ধতি ছাড়াও কাগজের নিয়মমাফিক পৌনঃপুনিক অংকনের সাহায্যে দেওয়ালঢাকার কাগজের নকশা তৈরী করার আরো ষোলটি পদ্ধতি আছে ; অর্থাৎ সর্বমোট 17 রকম উপায়ে মোটিফ বা পৌনঃপুনিকতার এককে একটি সমতলে বিন্যস্ত করা যায়। এগুলি চিত্র 2.11.তে দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি সরলতর মোটিফ নির্বাচন করা হয়েছে, কিন্তু চিত্র 2.10.তে প্রদর্শিত মোটিফের মতো এর কোনো নিজস্ব প্রতিসাম্য নেই। এই মোটিফের সাহায্যে প্রস্তুত নকশাগুলি প্রতিসম এবং নকশাগুলির মধ্যে পার্থক্যের কারণ মোটিফগুলির প্রতিসম বিন্যাসের মধ্যে তফাৎ।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, প্রথম তিনটি ক্ষেত্রে নকশার কোনো আয়না প্রতিসাম্য তল (Plane of mirror symmetry) নেই ; আপনি এমন কোনো জায়গায় আয়না রাখতে পারবেন না, যার ফলে নকশার একটি অংশ অন্য অংশটির আয়নার প্রতিবিম্ব বলে মনে হতে পারে। কিন্তু 4নং এবং 5নং ক্ষেত্রে

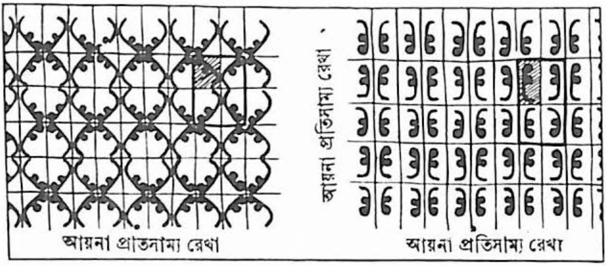


চিত্র 2.11

সংশ্লিষ্ট প্রতিসাম্য তল দেখতে পাবেন। 8নং এবং 9নং ক্ষেত্রে পরস্পর লম্বভাবে অবস্থিত দুটি করে আয়না রাখা যেতে পারে।

10নং ক্ষেত্রে দেখা যায় ছবির তলের উপর লম্বভাবে অবস্থিত চারমাত্রিক আবর্তন প্রতিসাম্য আছে। 11নং ক্ষেত্রে অক্ষটির তিনমাত্রিক প্রতিসাম্য এবং 13নং আর 15নং ক্ষেত্রে ছয়মাত্রিক আবর্তন প্রতিসাম্য রয়েছে।

এই সব ছবিগুলির মধ্যে মাত্র একটি করে প্রতিসাম্য অক্ষ বা প্রতিসাম্য তলের বদলে পরস্পর সমান্তরাল অনেকগুলি অক্ষের বা তলের শ্রেণী দেখতে পাবেন। আপনি যদি এমন একটি বিন্দু খুঁজে বের করতে পারেন যার ভেতর দিয়ে একটি প্রতিসাম্য অক্ষ (বা তল) যেতে পারে, তাহলে আপনি অতি সহজেই তার পাশের

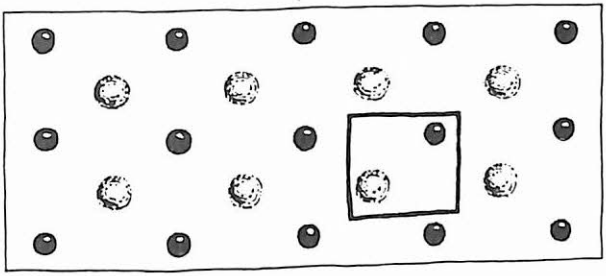


চিত্র 2.12

এবং তারও পরের বিন্দুগুলি খুঁজে বের করতে পারবেন, যেগুলি পরস্পরের কাছ থেকে সমদূরত্বে অবস্থিত, যাদের ভিতর দিয়েও একই ধরনের প্রতিসাম্য অক্ষ (বা তল) যাওয়া সম্ভব।

কোনো সমতলের নকশায় সতের ধরনের প্রতিসাম্যের অস্তিত্বের মধ্যেই কিন্তু একটি মাত্র মোটিফ থেকে প্রাপ্ত সব ধরনের নকশার বিপুল সংখ্যা সীমাবদ্ধ নয়। শিল্পীকে আরও একটি সর্তের কথা ঘোষণা করতে হবে ঃ কোষের সীমানার বাহুগুলির পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে মোটিফকে সাজানো হচ্ছে। চিত্র 2.12.তে দেওয়ালঢাকার কাগজের এমন দুটি বিভিন্ন নকশা প্রদর্শিত হয়েছে, যাদের মধ্যে প্রারম্ভিক মোটিফ এক হলেও তারা উল্লম্ব আয়নার সূচক রেখাগুলির (সমতল নক্শায় এগুলি প্রতিসাম্য রেখা) পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন অবস্থানে রয়েছে। এই দুটি নকশাই চিত্র 2.11. এর 8নং বিন্যাসের অন্তর্ভুক্ত।

কেলাস সমেত সব পদার্থই পরমাণু দিয়ে গড়ে উঠেছে। সরল পদার্থ বা মৌলিক পদার্থ গড়ে উঠেছে শুধুমাত্র এক জাতের পরমাণু দিয়ে। জটিল পদার্থ বা যৌগিক পদার্থ গড়ে উঠেছে দুই বা তার চেয়ে বেশী জাতের পরমাণু দিয়ে। মনে করুন কোনো অতি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে খাদ্যলবণ কেলাসের তল পরীক্ষা করে আমরা তার ভিতরের পরমাণুগুলির কেন্দ্র দেখতে পেলাম। চিত্র 2.13. তে দেখানো হয়েছে অনুরূপ ক্ষেত্রে আমরা কেলাসের বহির্তলে পরমাণুর বিন্যাসকে দেওয়ালঢাকার কাগজের নকশার মতো সাজানো অবস্থায় দেখতে পাবো।



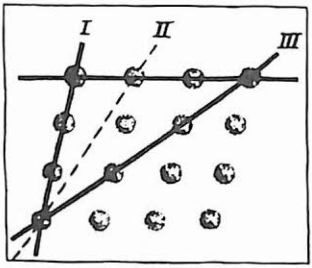
চিত্র 2.13

এখন আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন কিভাবে কেলাস গড়ে ওঠে। আমরা বলতে পারি কেলাস "ত্রিমাত্রিক দেওয়ালঢাকার কাগজের" মতো। দেওয়াল-ঢাকার কাগজের সমতল কোষের বদলে অনেকগুলি ত্রিমাত্রিক একক কোষকে দৃঢ়ভাবে একত্রিত করে কেলাস গড়ে ওঠে। এই ত্রিমাত্রিক একক কোষগুলিই কেলাস গঠনের সময় গঠনকারী একক হিসাবে কাজ করে।

কত রকম উপায়ে এই একক কোষগুলি থেকে ত্রিমাত্রিক দেওয়ালঢাকার কাগজের নকশা গড়ে উঠতে পারে? এই জটিল গাণিতিক সমস্যার প্রথম সমাধান করেন গঠন সংক্রান্ত কেলাসবিদ্যার (structural crystalography) জনক এভ্‌গ্রাফ স্টেফানোভিচ ফেডোরভ (1853-1919) এই শতাব্দীর শুরুতে। এই প্রখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী প্রমাণ করেন যে কেলাস গড়ে ওঠার সর্বমোট 230টি বিভিন্ন উপায় আছে, যেগুলি বর্তমানে ফেডোরভ শ্রেণী নামে পরিচিত।

কেলাসের আভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে আমরা এ যাবৎ যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি, সেসব কিছুই আমরা পেয়েছি এক্সরশ্মির সাহায্যে কেলাস গঠন বিশ্লেষণ করে, যা এই সিরিজের চতুর্থ বইয়ে কিছুটা বিশদভাবে আলোচিত হবে।

একই জাতের পরমাণু দিয়ে গড়া সরল কেলাসের উদাহরণ বিরল নয়। যেমন হীরকের কেলাস গড়ে উঠেছে বিশুদ্ধ কার্বন পরমাণু দিয়ে। খাদ্যলবণের কেলাসের মধ্যে রয়েছে দু ধরনের আয়ন (তড়িৎগ্রস্ত পরমাণু) সোডিয়াম আর ক্লোরিন। আরও বেশী জটিল কেলাস গড়ে উঠতে পারে এমন অণুর বিন্যাসের ফলে যার নিজের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন জাতের পরমাণু।



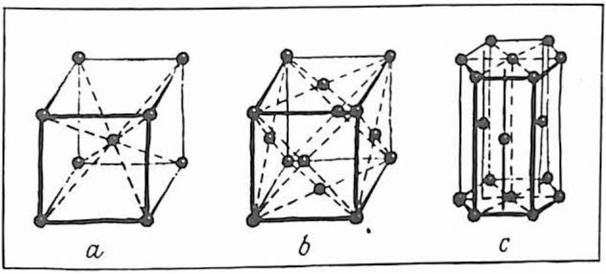
চিত্র 2.14

আমরা সবসময়েই কেলাসের মধ্যে বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এমন এক ক্ষুদ্রতম পরমাণু-জোট (কিংবা সরলতম ক্ষেত্রে একক পরমাণু) খুঁজে বের করতে পারি। এই ধরনের পরমাণু জোটকেই একক কোষ বলা হয়।

একক কোষের মাপ সবসময়ে সমান নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাপে অনেক তফাৎ হতে পারে। একই জাতের পরমাণু দিয়ে গড়া সরলতম কেলাসের মধ্যে দুটি পাশাপাশি ল্যাটিস বা জালক বিন্দুর মধ্যের ক্ষুদ্রতম দূরত্ব পাওয়া যায়। বৃহত্তম দূরত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় জটিল প্রোটিন কেলাসের ক্ষেত্রে। ল্যাটিস ধ্রুবক নামে পরিচিত এই দূরত্বগুলির মাপ দুই বা তিন আঙ্গস্ট্রম থেকে কয়েক শ আঙ্গস্ট্রম পর্যন্ত হতে পারে।

অনেক ধরনের কেলাস ল্যাটিস হয়। সব কেলাসের মধ্যেই যে সব সাধারণ ধর্ম থাকে, তার কারণ তাদের ল্যাটিসভিত্তিক গঠন। এটা বোঝা খুবই সহজ যে কেলাসের আদর্শ মসৃণ তল বলতে বোঝায় সেই সব তল যেগুলি ল্যাটিসবিন্দু অর্থাৎ পরমাণুগুলির অবস্থান বিন্দুর ভিতর দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন অভিমুখে গেছে এমন অসংখ্য তল কল্পনা করা যায়। এ গুলির মধ্যে কোনো কোনো তলটি গড়ে ওঠা কেলাসকে সীমায়িত করে, অর্থাৎ তার তলে পরিণত হয়।

এবার প্রথমে নিম্নলিখিত পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে বিবেচনা করা যাক: সব ল্যাটিস তল এবং রেখা, ল্যাটিস বিন্দু দিয়ে একই রকম নিবিড় ভাবে পূর্ণ নয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে কেলাসের বহির্তল সবসময়ে সবচেয়ে নিবিড়



চিত্র 2.15

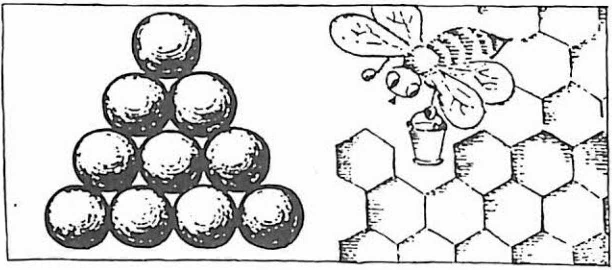
ভাবে পূর্ণ তল দিয়ে গড়ে ওঠে এবং এই সব তলগুলি পরস্পরকে ছেদ করে যে সব বাহুতে, সেগুলিও ল্যাটিস বিন্দু দিয়ে সবচেয়ে নিবিড়ভাবে অধিকৃত।

চিত্র 2.14তে কেলাসের বহির্তলের উপর লম্বভাবে অবস্থিত কেলাস ল্যাটিসের ছবি উপস্থিত করা হয়েছে। সংকণতলের ওপর লম্বভাবে অবস্থিত ল্যাটিস তলগুলির চিহ্নও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এর আগে যা বলা হয়েছে তার ফলে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা উচিত যে, কেলাসটির যে সব বহির্তল 1 নং এবং 3নং তলের সমান্তরাল, কেবলমাত্র তারাই আরো বেশী বিকশিত হতে পারে। 2 নং তলে যেহেতু খুব কমসংখ্যক ল্যাটিস বিন্দু (এবং পরমাণু) আছে তাই তার সমান্তরাল কোনো বহির্তল গড়ে উঠবে না।

বর্তমানে প্রায় কয়েকশ কেলাসের গঠন আমাদের জানা হয়ে গেছে। সর্বপ্রথম আমরা একই জাতের পরমাণু দিয়ে তৈরী সরলতম কেলাসের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করব।

তিন ধরনের ল্যাটিস খুব বেশী দেখতে পাওয়া যায়। এগুলিকে চিত্র 2.15তে উপস্থিত করা হল। পরমাণুগুলির কেন্দ্রকে বিন্দু দিয়ে সূচিত করা হয়েছে ; বিন্দুগুলিকে যুক্ত করেছে যে সব সরলরেখা, তাদের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। পরমাণুগুলির ত্রিমাত্রিক স্থানে অবস্থান সম্পর্কে পাঠকদের ওয়াকিবহাল করতে সুবিধে হবে বলে ও গুলিকে আঁকা হয়েছে।

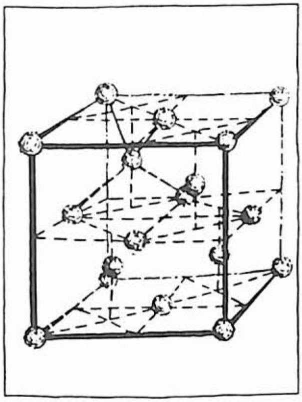
চিত্র 2.15a এবং 2.15b ঘনকাকৃতি (cubical) ল্যাটিসের নিদর্শন। ল্যাটিসের বিন্যাস আরও পরিস্কারভাবে বোঝার জন্যে কল্পনা করুন আপনি গঠনকারী এককগুলিকে সরলতম উপায়ে অর্থাৎ ধারে ধারে মিলিয়ে এবং তলে তল মিলিয়ে রেখেছেন। এখন যদি আপনি ঘনকগুলির শীর্ষবিন্দুতে এবং



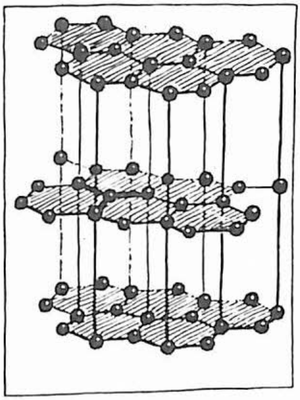
চিত্র 2.16

কেন্দ্রে বিন্দুগুলিকে স্থাপন করেন, তাহলে আপনি চিত্র 2.15a এর অনুরূপ ঘনকাকৃতি ল্যাটিস পাবেন। এই ধরনের গঠনকে বলা হয় দেহকেন্দ্রিক ঘনকাকৃতি ল্যাটিস। কিন্তু যদি বিন্দুগুলিকে ঘনকের শীর্ষবিন্দুতে এবং তলগুলির কেন্দ্রে স্থাপন করেন, তাহলে আপনি চিত্র 2.15b এর অনুরূপ ঘনকাকৃতি ল্যাটিস পাবেন। একে বলে তলকেন্দ্রিক ঘনকাকৃতি ল্যাটিস।

তৃতীয় ধরনের ল্যাটিস (চিত্র 2.15c) ঘনসন্নিবিষ্ট ষড়ভুজাকৃতি ল্যাটিস (closed packed hexagonal lattice) নামে পরিচিত। এই নামকরণের কারণ বোঝার এবং ল্যাটিসের বণ্টিত অণুর গঠন সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলার জন্যে, আসুন কতগুলি বিলিয়ার্ড বল নিয়ে তাদের যত ঘেঁষা-ঘেঁষি সম্ভব গাদা করার চেষ্টা করা যাক! প্রথমে একটি ঘনসন্নিবিষ্ট স্তর গড়ে তোলা যাক—এটিকে বিলিয়ার্ড খেলা আরম্ভ করার আগে র‍্যাকে সংগৃহীত বিলিয়ার্ড বলগুলিকে যেমন দেখায় (চিত্র 2.16) তেমনি দেখতে লাগবে। লক্ষ্য করে দেখুন ত্রিভুজের কেন্দ্রে অবস্থিত বলটি চারিপাশে ছটি অন্য বল দিয়ে পরিবেষ্টিত হয়ে আছে এবং এই ছটি বল গঠন করেছে একটি সুষম ষড়ভুজ। এবার এই প্রথম স্তরের ওপর অন্য স্তর গড়ে তুলে গাদা করার কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যদি আমরা দ্বিতীয় স্তরের বলগুলিকে ঠিক মাথার ওপরে স্থাপন করি, তাহলে কিন্তু গাদা করার কাজটা সবচেয়ে বেশী ঘেঁষাঘেঁষি হবে না। একই আয়তনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক বলকে গাদাগাদি করে রাখতে হলে, দ্বিতীয় স্তরের বলগুলিকে প্রথম স্তরের বলগুলির মধ্যবর্তী গর্তগুলির ওপর স্থাপন করতে হবে, আবার তৃতীয় স্তরের বলগুলির মাথাকে রাখতে হবে দ্বিতীয় স্তরের গর্তের ওপর, ইত্যাদি। ঘনসন্নিবিষ্ট ষড়ভুজাকৃতি ল্যাটিসে, তৃতীয় স্তরের বলগুলি এমন জায়গায় থাকে যে, তাদের কেন্দ্র প্রথম স্তরের বলগুলির কেন্দ্রের ঠিক ওপরে অবস্থান করে।



চিত্র 2.17



চিত্র 2.18

ঘনসন্নিবিষ্ট ষড়ভুজাকৃতি ল্যাটিসে পরমাণুগুলির কেন্দ্র বর্ণিত অবস্থার ন্যায় ঘনসন্নিবিষ্ট বলের মতো একই রকম ঘনভাবে বিন্যস্ত।

বহু মৌলিক পদার্থ কেলাসিত হয়ে উপরোক্ত তিন ধরনের ল্যাটিস গঠন করে।

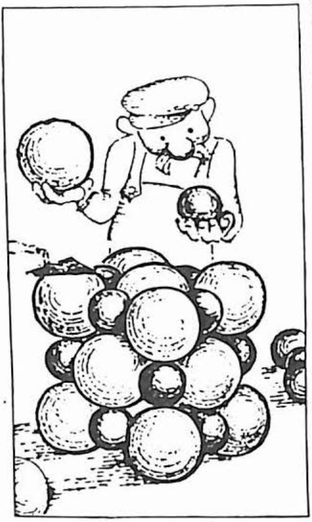
ঘনসন্নিবিষ্ট ষড়ভুজাকৃতি ল্যাটিস ··· Be, Co, Hf, Ti, Zn, Zr

তলকেন্দ্রিক ঘনকাকৃতি ল্যাটিস ··· Al, Cu, Co, Fe, Au, Ge, Ni, Ti

দেহকেন্দ্রিক ঘনকাকৃতি ল্যাটিস ··· Cr, Fe, Li, Mo, Ta, Ti, U, V

অন্য ধরনের গঠনগুলির মধ্যে আমরা মাত্র অল্প কয়েকটি সম্পর্কে আলোচনা করব। চিত্র 2.17-তে হীরকের গঠন দেখানো হয়েছে। এই গঠনের বৈশিষ্ট্য এই যে, হীরকের প্রত্যেকটি কার্বন পরমাণুর নিকটতম প্রতিবেশীর সংখ্যা চার। এবার এই সংখ্যাকে পূর্বোল্লিখিত তিনটি ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট সংখ্যার সঙ্গে তুলনা করা যাক। ছবি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ঘনসন্নিবিষ্ট ষড়ভুজাকৃতি ল্যাটিসের ক্ষেত্রে ল্যাটিস গঠনকারী প্রত্যেকটি পরমাণুর নিকটতম প্রতিবেশীর সংখ্যা বারো, তলকেন্দ্রিক ঘনকাকৃতি ল্যাটিসের ক্ষেত্রেও সংখ্যাটি বারো, কিন্তু দেহকেন্দ্রিক ঘনকাকৃতি ল্যাটিসের ক্ষেত্রে নিকটতম প্রতিবেশীর সংখ্যা আট।

এবার আমরা চিত্র 2.18-তে প্রদত্ত গ্রাফাইটের গঠন সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোচনা করবো। গ্রাফাইটের গঠনে এক বিচিত্র বৈশিষ্ট্য আছে। গ্রাফাইটের মধ্যে কতকগুলি পরমাণু স্তর দেখতে পাওয়া যায়, যে স্তরগুলির কোনো একটির ভিতরকার পরমাণু সেই স্তরের অন্য পরমাণুর সঙ্গে যত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ তার তুলনায় অন্য স্তরের পরমাণুর সঙ্গে তার বন্ধন অনেক দুর্বল। বন্ধনের দৃঢ়তা



চিত্র 2.19



চিত্র 2.20

আন্তঃ পরমাণুক দূরত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত ঃ একই স্তরের ভিতরকার পরমাণুগুলির দূরত্ব দুটি নিকটতম স্তরের মধ্যবর্তী দূরত্বের মাত্র আড়াইভাগের এক ভাগ।

পরমাণুস্তরগুলি দুর্বলভাবে আবদ্ধ থাকার জন্য গ্রাফাইট কেলাস সহজেই স্তর বরাবর ভেঙ্গে যেতে পারে। এজন্যই কঠিন গ্রাফাইটকে, যেসব ক্ষেত্রে লুব্রিকেটিং তেল ব্যবহার করা যায় না সে সব ক্ষেত্রে, পিচ্ছিলতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়—যেমন অতি নিম্ন কিম্বা অতি উচ্চ তাপমাত্রায়। গ্রাফাইট খুব ভালো কঠিন পিচ্ছিলতাসৃষ্টিকারী বা লুব্রিকেণ্ট।

দুটি বস্তুর মধ্যে ঘর্ষণ বাধা কমে যায়, মোটামুটিভাবে বলা যায়, একটি বস্তুর আণুবীক্ষণিক স্ফীত অংশগুলির অন্য বস্তুর আণুবীক্ষণিক গহ্বরের মধ্যে আটকে যাওয়ার ফলে। গ্রাফাইট কেলাসের আণুবীক্ষণিক স্তরগুলিকে পৃথক করার জন্যে প্রয়োজনীয় বল ঘর্ষণ বলের চেয়ে অনেক কম ; তাই পিচ্ছিলতা সৃষ্টির জন্যে গ্রাফাইট ব্যবহৃত হলে তা একটি বস্তুকে অন্য একটি বস্তুর ওপর পিছলে যাওয়ার বিষয়ে সাহায্য করে।

রাসায়নিক যৌগগুলি কেলাস গঠনের দিক থেকে অসংখ্য প্রকার। চিত্র 2.19 এবং 2.20-তে যথাক্রমে খাদ্যলবণ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের গঠন, দুটি ভিন্ন রূপের উদাহরণ হিসেবে সন্নিবিষ্ট হল।

চিত্র 2.19-তে প্রদর্শিত খাদ্যলবণের কেলাসে সোডিয়ম পরমাণু (ছোট কালচে বল) এবং ক্লোরিন পরমাণু (বড় ফ্যাকাসে বল) একটি ঘনকের অক্ষ বরাবর পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত। প্রত্যেক সোডিয়ম পরমাণুকে ঘিরে রেখেছে তার থেকে সমদূরত্বে অবস্থিত ছয়টি অপর মৌলের পরমাণু। ক্লোরিন পরমাণুর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই। কিন্তু সোডিয়ম ক্লোরাইডের অণু কোথায়? একটিরও অস্তিত্ব নেই। খাদ্যলবণের কেলাসে শুধু সোডিয়ম পরমাণু দিয়ে গড়া কোনো জোট কিম্বা শুধু ক্লোরিন পরমাণু দিয়ে গড়া কোনো জোট দেখা তো যায়ই না, এমনকি বিভিন্ন পরমাণু দিয়ে গড়া নৈকট্যের নিরিখে বিশেষ কোনো জোটও এই কেলাসের মধ্যে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

NaCl-এর রাসায়নিক সংকেত থেকে "পদার্থটি NaCl অণু দিয়ে গঠিত" —এমন সিদ্ধান্ত করার কোনো যুক্তি নেই। রাসায়নিক সঙ্কেতটি শুধু এই সত্য প্রকাশ করে যে, পদার্থটি সমসংখ্যক সোডিয়ম এবং ক্লোরিন পরমাণুর সংযুক্তির ফলে গড়ে উঠেছে।

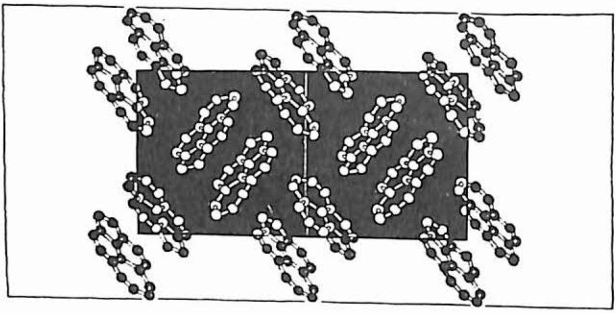
কোনো পদার্থের মধ্যে অণুর অস্তিত্ব আছে কি নেই তা নির্ধারিত হয় পদার্থটির অভ্যন্তরীণ গঠন থেকে। যদি তার মধ্যে কাছাকাছি থাকা পরমাণুর জোট সনাক্ত করা না যায়, তাহলে পদার্থটির মধ্যে অণু নেই।

কার্বন ডাই-অক্সাইডের কেলাস (আইসক্রীম প্রস্তুতিতে যাকে অনেক সময় ব্যবহার করা হয়) অণুঘটিত কেলাসের একটি উদাহরণ (চিত্র 2.20)।

কার্বন ডাই-অক্সাইড অণুর মধ্যে উপস্থিত কার্বন এবং অক্সিজেন পরমাণুর কেন্দ্রগুলি এক সরলরেখায় অবস্থিত (চিত্র 2.2 দেখুন)। C—O দূরত্ব 1·3 Å, কিন্তু প্রতিবেশী বিভিন্ন অণুর অক্সিজেনের মধ্যবর্তী দূরত্ব প্রায় 3 Å। বলা বাহুল্য এই ধরনের পরিস্থিতিতে আমরা কেলাসের মধ্যে অণুর উপস্থিতিকে মেনে নিই।

অণুঘটিত কেলাস মানেই ঘনসন্নিবিষ্ট অণুর পুঞ্জ। বিষয়টি উপলব্ধি করতে হলে প্রথমে অণুর সীমানা চিহ্নিত করা প্রয়োজন। চিত্র 2.20-তে আমরা ঠিক সেই কাজই করেছি।

সমস্ত জৈব পদার্থই অণুঘটিত কেলাস দিয়ে তৈরী। জৈব অণুর মধ্যে অনেক সময়ে কয়েক ডজন এমন কি কয়েক শ পরমাণু থাকে (কয়েক লক্ষ পরমাণু দিয়ে গড়া অণুগুলিকে অন্য একটি অধ্যায়ে আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে)। নকশার সাহায্যে তাদের ঘনবিন্যাসকে ঠিকমতো ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। এই জন্যেই আলোচ্য বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বইয়ে আপনারা চিত্র 2.21-এর অনুরূপ ছবির সাক্ষাৎ পেতে পারেন। ঐ ছবির জৈব যৌগটি কার্বন পরমাণু দিয়ে তৈরী। পরমাণুগুলির মধ্যবর্তী সরলরেখাগুলি যোজ্যতা



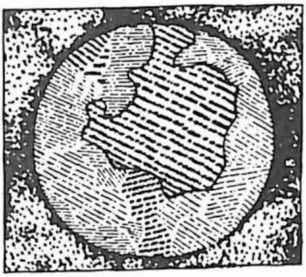
চিত্র 2.21

বন্ধনকে (valence bond) সূচিত করছে। দেখে মনে হচ্ছে অণুগুলি বাতাসে ভাসছে। কিন্তু সত্যি সত্যি তা বিশ্বাস করে বসবেন না। এগুলিকে ওভাবে আঁকা হয়েছে, কেলাসের ভিতর অণুগুলি কিভাবে বিন্যস্ত, তা আপনাদের সহজ করে বোঝানোর জন্যে ছবিতে কার্বনের সঙ্গে যুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণুগুলিকে দেখানো হয়নি (বস্তুতঃ রসায়নবিদ্‌রা প্রায়ই এই ধরনের সরলীকরণ করে থাকেন)। এমনকি অণুগুলির বহিসীমা নির্দেশ করে তাদের নির্দিষ্ট আকার দেবার চেষ্টাও করা হয় নি। যদি তা করা হত তাহলে দেখা যেত যে, "তালার গর্তে চাবি ঢোকানোর" প্রণালীতে অণুগুলির ঘনসন্নিবিষ্ট হওয়ার নীতি অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

পলিক্রিস্টালীয় পদার্থ বা বহুকেলাসনির্মিত পদার্থ (Polycrystalline Substances) ঃ

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, কঠিন বস্তুর জগতে অনিয়তাকার (amorphous) পদার্থ বিরল। আমাদের চারপাশের জগতে অধিকাংশ সামগ্রীই অতিক্ষুদ্র কেলাসদানা দিয়ে নির্মিত, যাদের মাপ এক মিলিমিটারের হাজার ভাগের একভাগের কাছাকাছি।

ঊনবিংশ শতকে গবেষকরা সাধারণ আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আবিষ্কার করেন যে, ধাতবদ্রব্য দানা দিয়ে গড়া। এই আবিষ্কারের জন্য শুধুমাত্র প্রয়োজন হয়েছিল এমন এক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা, যাতে নমুনাটিকে উত্তীর্ণ আলোকের বদলে প্রতিফলিত আলোকে দেখা যায়। এখনো ধাতুবিদ্যা সংক্রান্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্রগুলি এই নীতির ভিত্তিতেই কাজ করে।



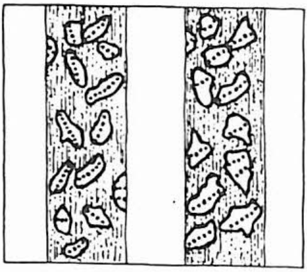
চিত্র 2.22

এই ধরনের অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যে প্রতিবিম্ব পাওয়া যায় তা চিত্র 2.22-এর অনুরূপ হতে পারে। সাধারণতঃ দানাগুলির সীমানা বেশ সুষ্ঠুভাবে ধরা পড়ে। উপস্থিত অশুদ্ধিগুলি এই সীমানায় উপস্থিত থাকাটাই নিয়ম।

একটি ধাতুর ধর্ম তার ভিতরকার দানাগুলির মাপের, বিন্যাসের এবং সীমানার পরিস্থিতির ওপর অত্যন্ত বেশী পরিমাণে নির্ভর করে। এই জন্য পদার্থবিদ্‌রা বহুকেলাসনির্মিত পদার্থ সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা করে চলেছেন। এক্স-রশ্মির সাহায্যে গঠন বিশ্লেষণ করে (যে বিষয়ে আলোচনা করা হবে বলে আমরা এর আগে একবার আশ্বাস দিয়েছিলাম) তাঁরা দেখেছেন যে গঠনকারী প্রত্যেকটি দানাই ছোট ছোট এক একটি কেলাস। আমরা আমাদের আশ্বাসের আবার পুনরাবৃত্তি করছি।

যে কোনো যান্ত্রিক প্রক্রিয়াই ধাতুর দানাকে প্রভাবিত করে। ধরুন আমাদের কাছে ঢালাই ধাতুর একটা টুকরো আছে। এর ভিতরকার দানাগুলি হবে বেশ বড় বড় এবং বিশৃঙ্খলভাবে সাজানো। তারপর মনে করুন ঐ ধাতুর টুকরোকে কোনো ছাঁচের ভিতর দিয়ে টেনে বার করে তারে পরিণত করা হল। এই যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ফলে কেলাসাকৃতি দানাগুলির কি হল ? পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এইভাবে তারে পরিণত করার প্রক্রিয়া কিম্বা অন্য কোনো আকৃতি পরিবর্তিত করার প্রক্রিয়ার ফলে ধাতুর কেলাসাকার দানাগুলি ভেঙ্গে যায়। অপর দিকে যান্ত্রিক বলের প্রভাবে এই সব দানাগুলির আপেক্ষিক অবস্থানে এক ধরনের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে কি ধরনের শৃঙ্খলা আসতে পারে ? আধভাঙ্গা দানাগুলির তো কোনো নির্দিষ্ট আকার থাকে না।

কথাটা ঠিক। ভাঙ্গা দানাগুলির যে কোনো রকম আকৃতি হতে পারে। কিন্তু কেলাসের একটি ভাঙ্গা অংশ কেলাসই থাকে এবং এর ল্যাটিসের ভিতর পরমাণুগুলির বিন্যাস অভগ্ন তলবিশিষ্ট কেলাসের মতোই পুরোপুরি নিয়মানুগ অবস্থায় বিরাজ করে। তাই আমরা প্রত্যেক ভাঙ্গা অংশে কিভাবে একক



চিত্র 2.23

কোষগুলি বিন্যস্ত তা বুঝতে পারি। আকার পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার আগে প্রত্যেক দানার ভিতরকার একক কোষগুলি শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যে নিয়মানুগ বিন্যাসে বিন্যস্ত ছিল ; সামগ্রিকভাবে কোনো নিয়মানুগ বিন্যাস ছিল না। কিন্তু যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পরে দানাগুলি নিজেদের মধ্যে মোটামুটিভাবে এক ধরনের বিন্যাস গড়ে তোলে যার ফলে তাদের একক কোষগুলির মধ্যে সামগ্রিক-ভাবে এক ধরনের সাধারণ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। একে বলা হয় বয়নবিন্যাস বা texture। যেমন যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ফলে সব দানার ভিতরকার কোষের কর্ণ, যে অভিমুখে ধাতুকে টানা হয়েছে প্রায় তার সমান্তরালভাবে নিজেদের বিন্যস্ত করে।

চিত্র 2.23-এর ডানদিকে কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রদর্শিত তলের সাহায্যে বয়ন-বিন্যাস বা texture-এর উদাহরণকে প্রকাশ করা হয়েছে। সারিবদ্ধ বিন্দুর সাহায্যে সূচিত এই সব তলেই পরমাণুগুলি সবচেয়ে বেশী ঘন। ছবিটির বাঁদিকের অংশে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার আগে ধাতুর ভিতরকার দানাগুলির অবস্থান দেখানো হয়েছে।

আকার পরিবর্তনের বিভিন্ন যান্ত্রিক প্রক্রিয়া (যেমন ঢালাই, পিটাই, তারে পরিণত করা ইত্যাদি) বিভিন্ন ধরনের বয়নবিন্যাস গড়ে তোলে। কতকগুলি প্রক্রিয়াতে দানাগুলি এমনভাবে ঘুরে যায় যাতে তাদের একক কোষের কর্ণ প্রক্রিয়া-অভিমুখের সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত হয়, আবার কতকগুলি প্রক্রিয়ায় সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত হয় একক কোষগুলির তল। ঢালাই বা তারে পরিণত করার প্রক্রিয়া যত বেশী উন্নত, ধাতুর কেলাসাকার দানাগুলির বয়নবিন্যাস হয় তত বেশী পূর্ণাঙ্গ। ধাতব দ্রব্যের ভৌতধর্মের ওপর বয়নবিন্যাসের প্রভাব প্রচণ্ড। ধাতুর মধ্যে কেলাসাকার দানাগুলির মাপ এবং পারস্পরিক বিন্যাস

সম্পর্কে জ্ঞান, ধাতুর আকার পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত নীতিকে বুঝতে সাহায্য করেছে। এর ফলে আবার প্রক্রিয়াগুলির প্রযুক্তিগত মানোন্নয়ন করা সম্ভব হচ্ছে। ধাতুপ্রযুক্তিবিদ্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া কোমলায়ন (tempering)। এটিও ধাতব দানার পুনর্বিন্যাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। ঢালাই করা কিম্বা তারে পরিণত করা ধাতুকে যথেষ্ট উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে পুরোনো কেলাসের বদলে নতুন ধরনের কেলাস উৎপন্ন হয়। ধীরে ধীরে কোমলায়ন করলে বয়নবিন্যাস নষ্ট হয়ে যায় ; উৎপন্ন নতুন কেলাসগুলি বিন্যস্ত হয় বিশৃঙ্খলভাবে। তাপমাত্রা বাড়ালে (কিম্বা ধাতুকে কোমলায়ন তাপমাত্রায় বেশীক্ষণ রাখলে) নতুন নতুন কেলাস গড়ে ওঠে আর পুরোনো কেলাসগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়। দানাগুলি এতো বড়ও হয়ে উঠতে পারে যা খালি চোখে দেখা যাবে। অতিরিক্ত কোমলায়ন ধাতুর ভৌতধর্মকে বদলে দেয়। এর ফলে ধাতুটি হয়ে ওঠে প্রসার্য এবং কোমল। তার কারণ দানাগুলি হয়ে যায় এবড়ো-খেবড়ো এবং বয়নবিন্যাস অদৃশ্য হয়।

৩. তাপমাত্রা

থার্মোমিটার (Thermometer) ঃ

যদি বিভিন্ন মাত্রায় উত্তপ্ত দুটি বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে আসে, তাহলে উষ্ণতর বস্তুটি হয় শীতলতর এবং শীতলতর বস্তুটি হয় উষ্ণতর। তখন বলা হয় বস্তুদুটির মধ্যে তাপবিনিময় ঘটেছে।

আগেই বলা হয়েছে, তাপবিনিময় এক ধরনের শক্তির আদান-প্রদান; যে বস্তুটি শক্তি ত্যাগ করে তাকে বলা হয় উষ্ণতর বস্তু। আমরা কোনো বস্তুকে উষ্ণ বলে অনুভব করি তখনি, যখন তা আমাদের হাতকে উত্তপ্ত করে অর্থাৎ হাতে শক্তি পরিত্যাগ করে। আবার যদি কোনো বস্তুকে ঠাণ্ডা বলে মনে হয়, তার অর্থ বস্তুটি আমাদের দেহ থেকে শক্তি গ্রহণ করে।

উত্তাপ ত্যাগকারী (অর্থাৎ তাপবিনিময় পদ্ধতি অনুযায়ী শক্তি প্রদানকারী) কোনো বস্তু সম্পর্কে আমরা বলি ঃ বস্তুটির তাপমাত্রা উত্তাপগ্রহণকারী বস্তুর চেয়ে বেশী।

একটি বস্তু অন্য বস্তুর উপস্থিতিতে উত্তপ্ত হচ্ছে না শীতল হচ্ছে তা দেখে আমরা তার বিভিন্ন উত্তপ্ত বস্তুর সারির মধ্যে "অবস্থান" নির্ণয় করি। তাপমাত্রা হচ্ছে এমন একটি সূচক যা দেখে আমরা বুঝতে পারি আমাদের বিবেচ্য বস্তু উত্তাপ গ্রহণ করবে না পরিত্যাগ করবে।

তাপমাত্রা মাপার যন্ত্রের নাম থার্মোমিটার।

তাপে সংবেদনশীল পদার্থের বিভিন্ন ধর্মকে অবলম্বন করে থার্মোমিটার প্রস্তুত করা হয়। এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী সাহায্য গ্রহণ করা হয় তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বস্তুর প্রসারণ ধর্মের।

যদি কোনো থার্মোমিটারের ভিতরের পদার্থ একটি বস্তুর সংস্পর্শে এসে আয়তন পরিবর্তন করে, তাহলে তার মানে এই বস্তুটির তাপমাত্রা আলাদা। যখন থার্মোমিটারের ভিতরের বস্তুর আয়তন সংকুচিত হয় তখন বস্তুটির তাপমাত্রা কম আর যখন তার প্রসারণ ঘটে তখন বস্তুটির তাপমাত্রা বেশী।

অনেক পদার্থই থার্মোমিটারে ব্যবহৃত হয় ঃ তরল (যেমন পারদ বা অ্যালকোহল), কঠিন (যেমন অনেক ধাতু), এবং গ্যাস। কিন্তু বিভিন্ন পদার্থ বিভিন্ন মাত্রায় প্রসারিত হয় আর তাই পারদ, অ্যালকোহল, গ্যাস কিম্বা অন্যান্য পদার্থে নির্মিত থার্মোমিটারের প্রতি "ডিগ্রীর" মাপ এক হতে পারে না। অবশ্য

বরফের গলনাঙ্ক এবং জলের স্ফুটনাঙ্কের মতন দুটি স্থিরাঙ্ক সব থার্মোমিটারেই চিহ্নিত করা যায়। তাই সব থার্মোমিটারই একইভাবে 0°C এবং 100°C-কে সূচিত করে। কিন্তু সব বস্তুই 0°C এবং 100°C-এর মধ্যে একই হারে প্রসারিত হয় না। কোনো বস্তু পারদ থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে 0°C এবং 50°C-এর মধ্যে যে হারে প্রসারিত হয় পরবর্তী স্তরে তার থেকে কম হারে প্রসারিত হতে পারে, আবার অন্য কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে উল্টো ঘটনাও ঘটতে পারে।

বিভিন্ন প্রসারণশীল বস্তুর সাহায্যে বিভিন্ন থার্মোমিটার তৈরী করলে আমরা তাদের দ্বারা সূচিত তাপমাত্রার ক্ষেত্রে তারতম্য লক্ষ্য করি যদিও দুটি স্থিরাঙ্কে সেগুলি একই থাকে। তাছাড়া জলনির্মিত থার্মোমিটার ব্যবহার করলে আমরা দেখতে পাই যে, যদি কোনো বস্তুকে 0°C-এ ঠাণ্ডা করার পর বৈদ্যুতিক চুল্লীতে বসানো হয়, তাহলে জল-থার্মোমিটারে সূচিত তাপমাত্রা প্রথমে নীচে নেমে তারপর ওপরে ওঠে। এর কারণ জল উত্তপ্ত হওয়ার সময় প্রথমে তার আয়তন সংকুচিত হয় এবং শুধুমাত্র তার পরেই তা "স্বাভাবিকভাবে" ব্যবহার করে অর্থাৎ উত্তপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রসারিত হয়।

সুতরাং থার্মোমিটারের জন্য না ভেবে-চিন্তে কোনো পদার্থ ব্যবহার করলে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে।

কিন্তু তাহলে "সত্যিকার" তাপমাত্রা মাপার জন্য আমরা থার্মোমিটারে কি ধরনের পদার্থ ব্যবহার করবো ? কোন পদার্থ এই উদ্দেশ্যে আদর্শ স্থানীয় হবে ?

এই ধরনের আদর্শ পদার্থ সম্পর্কে আমরা এর আগে আলোচনা করেছি। এই পদার্থ আদর্শ গ্যাস। আদর্শ গ্যাসের কণিকাগুলির মধ্যে কোনো মিথষ্ক্রিয়া হয় না এবং তাই আদর্শ গ্যাসের প্রসারণ লক্ষ্য করে আমরা তার ভিতরকার অণুগুলির গতির পরিবর্তন পরিমাপ করতে পারি। সংক্ষেপে, এই কারণেই আদর্শ গ্যাস, থার্মোমিটার প্রস্তুত করার আদর্শ পদার্থ বলে বিবেচিত হয়।

তাছাড়া বাস্তবিকই কি আশ্চর্য ঘটনা দেখুন, যদিও তাপমাত্রা বাড়ালে জল অ্যালকোহলের মতন (কি অ্যালকোহল কাচের মতন বা কাচ লোহার মতন) সমমাত্রায় প্রসারিত হয় না, কিন্তু হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন বা অন্য যে কোনো গ্যাস যথেষ্ট নিম্নচাপে সমমাত্রায় প্রসারিত হয় অর্থাৎ প্রসারণের ক্ষেত্রে আদর্শ ব্যবহার করে। এই জন্যই পদার্থবিদ্যায় নির্দিষ্ট পরিমাণ আদর্শ গ্যাসের আয়তন পরিবর্তনকে তাপমাত্রার সংজ্ঞার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। অবশ্য যেহেতু গ্যাসমাত্রেই চাপের প্রভাবে খুব বেশী পরিমাণে সংকুচিত হয়, তাই পরীক্ষার সময় গ্যাসের চাপ যাতে স্থির থাকে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন।

গ্যাস থার্মোমিটারে বিভিন্ন তাপমাত্রা চিহ্নিত করতে হলে প্রথমে নির্বাচিত

গ্যাসটির 0°C-এ এবং 100°C-এ আয়তন নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করতে হবে। তারপর V_{100} এবং V_0 আয়তন দুটির অন্তরকে 100টি সমান অংশে ভাগ করতে হবে। অর্থাৎ গ্যাসটির আয়তনের $(V_{100}-V_0)/100$ অংশ প্রতি ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের জন্য পরিবর্তিত হবে।

ধরুন থার্মোমিটারে আয়তন দেখা গেল V; এই আয়তন যে t°C তাপমাত্রা সূচিত করবে তার মান কত? এটা বোঝা শক্ত নয় যে,

$$t°\text{C}=\frac{V-V_0}{V_{100}-V_0}\,100 \quad \text{অর্থাৎ} \quad \frac{t°\text{C}}{100}=\frac{V-V_0}{V_{100}-V_0}$$

এই সমীকরণের সাহায্যে আমরা V-এর প্রত্যেক মানকে t-এর বিভিন্ন মানের সঙ্গে সম্পর্কিত করি এবং পদার্থবিদদের ব্যবহার্য তাপমাত্রার মাপকাঠি (temperature scale) তৈরী করি।*

তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের আয়তন সীমাহীনভাবে বেড়ে চলে—তত্ত্বগতভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কোনো উর্ধ্বতম সীমা নেই। কিন্তু নিম্ন তাপমাত্রার (সেণ্টিগ্রেড স্কেলে ঋণাত্মক) একটি নিম্নতম সীমা আছে। তাপমাত্রা ক্রমশঃ কমাতে থাকলে কি ঘটে? বাস্তব গ্যাস প্রথমে তরলে এবং তারপর কঠিনে পরিণত হয়। গ্যাসের অণুগুলি একটি ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে একত্রীভূত হয়। কিন্তু থার্মোমিটারে আদর্শ গ্যাস ভরা থাকলে এই ক্ষুদ্র আয়তনের মান কত হবে? আদর্শ গ্যাসের অণুগুলির নিজেদের কোনো আয়তন নেই এবং তারা পরস্পরের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়াও করে না। সুতরাং তাপমাত্রা কমাতে থাকলে শেষ পর্যন্ত আদর্শ গ্যাসের আয়তন শূন্যে পরিণত হবে। এইভাবে বাস্তবেও আদর্শ

*বরফের গলনাঙ্ককে 0°C এবং জলের স্ফুটনাঙ্ককে 100°C (উভয়ক্ষেত্রেই 760mm পারদচাপে) হিসেবে চিহ্নিত করে যে সেন্টিগ্রেড স্কেল গড়ে তোলা হয়েছে তা খুবই ব্যবহারোপযোগী। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ এবং অ্যামেরিকানরা এমন একটি ভিন্ন তাপমাত্রার মাপকাঠি ব্যবহার করে যা আমাদের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয়। ধরুন, ইংরাজী উপন্যাস থেকে নেওয়া নিম্নলিখিত লেখাটি পড়ে আপনি কি বুঝবেন: "গ্রীষ্মকাল খুব বেশী গরম ছিল না, তাপমাত্রা ছিল 60—70 ডিগ্রী।" ছাপার ভুল? না, তাপমাত্রা সূচিত হয়েছে ফারেনহিট স্কেলে (°F)। ইংলণ্ডে তাপমাত্রা খুব কমই—20°C-এর নীচে নামে। ফারেনহিট বরফ আর নুনের এক মিশ্রণের সাহায্যে এর কাছাকাছি একটি তাপমাত্রা সৃষ্টি করে, তাকে তাঁর স্কেলের 0° হিসেবে চিহ্নিত করলেন। আবিষ্কারক বলেছিলেন যে, তাঁর স্কেলে মানুষের দেহের তাপমাত্রা 100° ডিগ্রীর কাছাকাছি হবে। তবে সম্ভবতঃ তিনি এই তাপমাত্রা নির্ণয়ের সময়ে সামান্য জ্বরাক্রান্ত কোনো লোকের সাহায্য নিয়েছিলেন। ফারেনহিট স্কেলে সুস্থ লোকের শরীরের তাপমাত্রা গড়ে 98°F। এই স্কেল অনুযায়ী জল 32°F তাপমাত্রায় বরফে এবং 212°F তাপমাত্রায় বাষ্পে পরিণত হয়। সেন্টিগ্রেড এবং ফারেনহিট স্কেলের পারস্পরিক সম্পর্ক নিম্নরূপ:

$$t°\text{C}=\frac{5}{9}(\,t-32\,)°\text{F}$$

গ্যাসের বৈশিষ্ট্যসূচক শূন্য আয়তনের খুব কাছাকাছি পৌঁছনো সম্ভব। এজন্যে শুধু প্রয়োজন গ্যাস থার্মোমিটারকে ক্রমনিম্নমানের চাপে আদর্শ গ্যাস দিয়ে ভর্তি করা। তাই যদি বলা হয় যে, গ্যাসের আয়তনকে কমাতে কমাতে শূন্যে পরিণত করা সম্ভব তাহলে খুব বেশী ভুল বলা হবে না।

পূর্বোক্ত সমীকরণ অনুযায়ী তাপমাত্রার সম্ভাব্য সর্বনিম্ন সীমা বলতে আমরা বুঝি শূন্য আয়তনের সংশ্লিষ্ট তাপমাত্রাকে। এই তাপমাত্রাকে পরম শূন্য তাপমাত্রা (absolute zero temperature) বলা হয়।

সেণ্টিগ্রেড স্কেলে পরম শূন্য তাপমাত্রার অবস্থান নির্ণয় করতে হলে আমাদের পূর্বোক্ত সমীকরণে গ্যাসের আয়তনকে শূন্য ($V=0$) বসাতে হবে। তাহলে পরম শূন্য তাপমাত্রার মান দাঁড়াবে—$100\ V_0/(V_{100}-V_0)$।

হিসেব করলে দেখা যাবে যে, এই বিশিষ্ট তাপাঙ্কের মান $-273°C$ (আরও সঠিকভাবে $-273{\cdot}15°C$)।

তাই কোনো থার্মোমিটারেই পরম শূন্য তাপমাত্রার নীচে কোনো তাপাঙ্ক চিহ্নিত করা হয় না ; কেননা সেখানে গ্যাসের আয়তন ঋণাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। তাই পরম শূন্যের চেয়ে নিম্নতর তাপমাত্রার কথা বলা অর্থহীন। কোনো একটি তারের ব্যাস শূন্যের চেয়ে কম হওয়া যতটা অসম্ভব, পরম শূন্যের চেয়ে নিম্নতর তাপমাত্রার অস্তিত্বও সমান অসম্ভব।

পরম শূন্য তাপমাত্রায় কোনো বস্তুকে আরো শীতল করা অসম্ভব, অর্থাৎ বস্তুটি থেকে তখন কোনো শক্তি বের করে নেওয়া যায় না। অন্যভাবে বলা যায়, পরম শূন্য তাপমাত্রায় বস্তুটির সংগঠক কণিকা ও এককগুলির মধ্যে সম্ভাব্য নিম্নতম পরিমাণ শক্তি বর্তমান থাকে। যার অর্থ পরম শূন্য তাপমাত্রায় বস্তুটির মধ্যে গতিশক্তি শূন্য এবং স্থিতিশক্তি সম্ভাব্য নিম্নতম পরিমাণ।

যেহেতু পরম শূন্য তাপমাত্রাই নিম্নতম তাপমাত্রা, তাই স্বাভাবিক কারণেই পদার্থবিদ্যায় বিশেষতঃ অতি নিম্নতাপমাত্রার সঙ্গে জড়িত শাখাগুলিতে, পরম শূন্যকে নিম্নতম স্থানাঙ্ক হিসেবে গ্রহণ করে প্রস্তুত পরম স্কেল থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়। স্পষ্টতঃ $T_{abs}=(t+273)°C$। পরম স্কেলে ঘরের তাপমাত্রা প্রায় 300°। ঊনবিংশ শতকের বিখ্যাত ইংরাজ বিজ্ঞানী কেলভিনের সম্মানে এই স্কেলকে কেলভিন স্কেলও বলা হয় এবং T_{abs}-এর বদলে T K লেখা হয়।

পরম তাপমাত্রা T-কে গ্যাস থার্মোমিটারের সংশ্লিষ্ট সমীকরণে বসালে আমরা নিম্নলিখিত রূপ পাই ঃ

$$T=100\frac{V-V_0}{V_{100}-V_0}+273$$

এই সমীকরণের সঙ্গে $100\,V_0/(V_{100}-V_0)=273$ সমীকরণটি একত্রিত করলে আমরা শেষ পর্যন্ত নিম্নলিখিত সরল সম্পর্কে এসে পেঁছিই ঃ

$$\frac{T}{273}=\frac{V}{V_0}$$

সুতরাং পরম তাপমাত্রা আদর্শ গ্যাসের আয়তনের সঙ্গে সমানুপাতিক। সঠিক তাপমাত্রা নির্ণয়ের জন্য পদার্থবিদ্‌রা বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি অবলম্বন করেন। পারদ, অ্যালকোহল এবং অন্যান্য পদার্থে প্রস্তুত থার্মোমিটারে উচ্চতম ও নিম্নতম তাপাঙ্কের মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য থাকলে সেগুলিকে গ্যাস থার্মোমিটারের সাহায্যে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে নেওয়া হয়। তবু গ্যাস থার্মোমিটার-এর সাহায্যেও পরম শূন্য তাপমাত্রার খুব কাছাকাছি (0·7°K-এর নিম্নতর তাপমাত্রা) তাপমাত্রা পরিমাপ করা অসুবিধাজনক, যেহেতু তখন সব গ্যাসই তরলে পরিণত হয় এবং 600°C-এর ওপরের তাপমাত্রাও সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না, কেননা তখন গ্যাস কাঁচের দেওয়াল ভেদ করে। অতিরিক্ত উচ্চ এবং অতিনিম্ন তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য অন্যান্য নীতির সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

তাপমাত্রা নির্ণয়ের বাস্তব পদ্ধতি নানান রকম হতে পারে। বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল যন্ত্রগুলি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ—প্রাপ্ত তাপমাত্রার সূচক যেন নিম্নচাপে আবদ্ধ গ্যাসের প্রসারণের সাহায্যে নির্ণীত সূচকের সঙ্গে পুরোপুরি এক হয়। চুল্লী (oven), অগ্নিকুণ্ড (furnace) এবং দীপে (burner) উচ্চ তাপমাত্রা উৎপন্ন হয়। রুটি তৈরী করার চুল্লীতে (baking oven) উৎপন্ন তাপমাত্রা 220–280°C। ধাতুবিদ্যায় উচ্চতর তাপমাত্রা ব্যবহৃত হয়। দৃঢ়ীকরণের অগ্নিকুণ্ডে 900–1000°C, পেটাইয়ের কাজে 1400–1500°C এবং ইস্পাত তৈরীর অগ্নিকুণ্ডে 2000°C পর্যন্ত তাপমাত্রা তোলা হয়। অগ্নিকুণ্ডে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড (5000°C) গড়ে উঠেছে তড়িৎশিখার (electric arc) সাহায্য গ্রহণ করে। দুর্গল (refractory) পদার্থের গলনও সম্ভব করেছে এই তড়িৎশিখা।

গ্যাসদীপের তাপমাত্রা কত জানেন ? গ্যাসদীপশিখার ভিতরকার নীলাভ শংকু অঞ্চলের তাপমাত্রা মাত্র 300°C, কিন্তু তার বহির্তলের তাপমাত্রা 1800°C পর্যন্ত ওঠে।

পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের সময়ে অতুলনীয় উচ্চ তাপমাত্রার উদ্ভব হয়। পরোক্ষ পরিমাপের সাহায্যে জানা গেছে যে, বিস্ফোরণের কেন্দ্রে কয়েক নিযুত ডিগ্রী তাপমাত্রার উদ্ভব হয়।

বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশে বিশেষ

পরীক্ষাগারে এই ধরনের অতি উচ্চ তাপমাত্রা সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে। অতি অল্প সময়ের জন্যে কয়েক নিযুত ডিগ্রী তাপমাত্রা সৃষ্টি করা সম্ভবও হয়েছে।

প্রকৃতিতেও এই ধরনের অতি উচ্চ তাপমাত্রার অস্তিত্ব আছে। তবে পৃথিবীতে নয়, মহাকাশের অন্যত্র। নক্ষত্রগুলির কেন্দ্রে বিশেষ করে সূর্যে তাপমাত্রার পরিমাণ কয়েক কোটি ডিগ্রী। কিন্তু নক্ষত্রগুলির বহির্তলের তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম, 20000°C-এর বেশী নয়। সূর্যের বহির্তল 6000°C পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়।

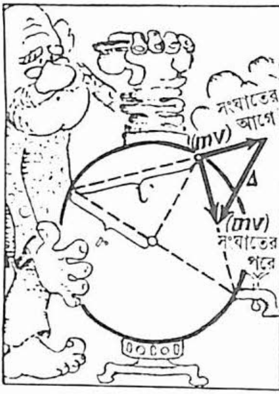
আদর্শ গ্যাস তত্ত্ব (Ideal gas theory) :

তাপমাত্রার সংজ্ঞা গড়ে উঠেছে আদর্শ গ্যাসের যে সব ধর্মের সাহায্যে সেগুলি খুব সরল। স্থির তাপমাত্রায় বয়েলের সূত্র পালিত হয় : চাপ বা আয়তন পরিবর্তনের সময়ে pV গুণফল অপরিবর্তিত থাকে। স্থির চাপে V/T অনুপাত স্থির থাকে, যেভাবেই তাপমাত্রা বা আয়তন পরিবর্তিত হোক না কেন। খুব সহজেই এই দুটি সূত্রকে সংযুক্ত করা যায়। স্পষ্টতঃ pV/T-এর মান স্থির তাপমাত্রায় V বা p পরিবর্তিত হলেও একই থাকে ; অনুরূপভাবে তা স্থির চাপে V বা T-এর পরিবর্তনের ফলেও পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং যে কোনো দুটি পরিবর্তনীয় রাশির বদলে একসঙ্গে p, V এবং T এই তিনটি রাশির পরিবর্তন ঘটলেও pV/T-এর মান অপরিবর্তিত থাকে। $pV/T=$ ধ্রুবক এই সূত্রটিকে আদর্শ গ্যাসের অবস্থা সমীকরণ (Equation of state of an ideal gas) বলে।

থার্মোমিটারের জন্য আদর্শ গ্যাস নির্বাচনের কারণ এই যে, আদর্শ গ্যাসের ধর্ম কেবলমাত্র তার অণুগুলির গতির ওপর (কিন্তু মিথষ্ক্রিয়ার ওপর নয়) নির্ভর করে।

অণুর গতি এবং তাপমাত্রার মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক থাকে ? এই প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে, গ্যাসের চাপ এবং গ্যাসের ভিতরকার অণুগুলির গতির মধ্যে একটি সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন।

মনে করুন, একটি R ব্যাসার্ধযুক্ত গোলকাকৃতি পাত্রের মধ্যে N সংখ্যক অণু আছে (চিত্র 3.1)। এবার একটি একক অণুর গতিপথ অণুসরণ করা যাক, যে এই বিশেষ মুহূর্তে l জ্যা বরাবর বাঁদিক থেকে ডানদিকে যাচ্ছে। আমরা আন্তঃ আণবিক সংঘর্ষ নিয়ে মাথা ঘামাবো না, কারণ ঐ ধরনের সংঘর্ষের চাপের ওপর কোনো প্রভাব নেই। পাত্রের সীমানার কাছে এসে অণুটি পাত্রের দেয়ালে আঘাত করবে এবং প্রতিফলিত হয়ে অন্য এক অভিমুখে একই গতিতে (সংঘর্ষটি স্থিতিস্থাপক) ছুটতে থাকবে। আদর্শ অবস্থায় পাত্রের মধ্যে এই ধরনের



চিত্র 3·1

ছুটোছুটি অনন্তকাল ধরে চলতে পারে। যদি অণুটির গতিবেগ v হয়, তাহলে দেয়ালের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটবে l/v সেকেণ্ড পরপর, অর্থাৎ অণুটি প্রতি সেকেণ্ডে v/l বার দেয়ালকে আঘাত করবে। N সংখ্যক অণুর প্রত্যেকটির এই ধরনের সংঘর্ষের ফল একত্রিতভাবে দেয়ালের গায়ে চাপ প্রদানকারী বল সৃষ্টি করবে।

নিউটনের সূত্র অনুযায়ী, বল একক সময়ে ভরবেগের পরিবর্তনের সমান। ধরা যাক, প্রতিবার সংঘর্ষের সময়ে ভরবেগের পরিবর্তন $\triangle$। এই পরিবর্তন প্রতি সেকেণ্ডে v/l সংখ্যকবার ঘটে। সুতরাং সামগ্রিক বলের মধ্যে একটি মাত্র অণুর দেয় অংশ $\triangle v/l$।

চিত্র 3.1-তে প্রতিবার সংঘর্ষের আগে ও পরে ভরবেগের অভিমুখ এবং ভরবেগের পরিবর্তন $\triangle$-কে অঙ্কন করা হয়েছে। সদৃশ ত্রিভুজ দুটির তুলনা থেকে স্পষ্ট যে $\triangle/l = mv/R$। সুতরাং সামগ্রিক বলের মধ্যে একটিমাত্র অণুর দেয় অংশকে নিম্নলিখিত রূপেও লেখা যায়ঃ

$$\frac{mv^2}{R}$$

যেহেতু উপরোক্ত রাশিতে জ্যা-এর দৈর্ঘ্য অন্তর্ভুক্ত নেই, সেজন্যে স্পষ্টতঃ যে কোনো জ্যা বরাবর অণু ছোটাছুটি করুক না কেন, সামগ্রিক বলের মধ্যে তার দেয় অংশ সমানই থাকবে। অবশ্য বক্রভাবে সংঘর্ষ ঘটলে ভরবেগের পরিবর্তন কম হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে সংঘর্ষ ঘটবে অনেক বেশী ঘন ঘন। হিসেব করে দেখা গেছে যে, এই দুইয়ের ফল পরস্পরকে প্রশমিত করে।

যেহেতু গোলকটির মধ্যে N সংখ্যক অণু বর্তমান, লব্ধি বলের পরিমাণ হবে

$$\frac{Nmv^2{}_{av}}{R}$$

যেখানে v_a = অণুগুলির গতিবেগের গড়

কোনো গ্যাসের চাপ p পাওয়া যাবে বলের পরিমাণকে গোলকের তলের ক্ষেত্রফল $4\pi R^2$ দিয়ে ভাগ করলে

$$p=\frac{Nmv^2{}_{av}}{4\pi R^2.R}=\frac{\frac{1}{3}Nmv^2{}_{av}}{\frac{4}{3}\pi R^3}=\frac{Nmv^2{}_{av}}{3V}$$

যেখানে V = গোলকের আয়তন

সুতরাং $pV=\frac{1}{3}Nmv^2{}_{av}$

এই সমীকরণটি ড্যানিয়েল বারনৌলি 1738 খৃস্টাব্দে প্রথম বের করেন।*

আদর্শ গ্যাসের অবস্থা সমীকরণ থেকে আমরা pV = ধ্রুবক. T সম্পর্ক পাই এবং পূর্বে প্রাপ্ত সমীকরণ থেকে বুঝতে পারি যে pV এবং $v^2{}_{av}$ সমানুপাতিক।

সুতরাং $T \propto v^2{}_{av}$ অথবা $v_{av} \propto \sqrt{T}$

অর্থাৎ আদর্শ গ্যাস অণুর গড় গতিবেগ পরম তাপমাত্রার বর্গমূলের সমানুপাতিক।

অ্যাভোগেড্রোর নীতি (Avogadro's Law) ঃ

মনে করুন কোনো দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন অণুর মিশ্রণ দিয়ে গড়া। এমন কি কোনো গতি সম্পর্কিত ভৌত রাশি আছে, যার মান এই সব রকম অণুর ক্ষেত্রেই সমান, যেমন অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে, অবশ্য একই তাপমাত্রায় ?

বলবিদ্যা এই প্রশ্নের একটি জবাব দিয়েছে। এটি প্রমাণ করা যায় যে, সব অণুর সরলরৈখিক গতির ক্ষেত্রে গড় গতিশক্তি $mv^2{}_{av}/2$ একই থাকবে।

এর অর্থ একই তাপমাত্রায় আণবিক গতির বর্গের গড় কণিকাগুলির ভরের ব্যাস্তানুপাতিক ঃ

$$v^2{}_{av} \propto \frac{1}{m} \quad \text{অথবা} \quad V_{av} \propto \frac{1}{\sqrt{m}}$$

এবার আবার $pV=(1/3)Nmv^2{}_{av}$ সমীকরণে ফিরে আসা যাক। যেহেতু একই তাপমাত্রায় $mv^2{}_{av}$ রাশিটি সব গ্যাসের ক্ষেত্রেই সমান, তাই কোনো

---

*সুইস বংশে জন্ম ডি বারনৌলি রুশদেশে জন্মেছেন এবং বাস করেছেন। তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সদস্য হয়েছিলেন। জোহান বারনৌলি এবং জেকব বারনৌলির নামও কম পরিচিত নয়। এঁদের নামের মিল কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, এঁরা তিনজনে ছিলেন সত্যিকার সহোদর ভাই।

নির্দিষ্ট আয়তন V-এর মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট চাপ p এবং নির্দিষ্ট তাপমাত্রা T-তে অণুর সংখ্যা N সব গ্যাসের ক্ষেত্রেই সমান। এই গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন অ্যামেডো অ্যাভোগেড্রো (1776—1856)।

কিন্তু $1cm^3$-এর মধ্যে অণুর সংখ্যা কত? দেখা গেছে 0°C তাপমাত্রায় এবং 760mm পারদের চাপে যে কোনো গ্যাসের মধ্যে ঐ সংখ্যা $2{\cdot}7 \times 10^{19}$। সংখ্যাটি বিপুল। একটি উদাহরণ দিলে এই বিপুলত্ব বুঝতে সুবিধে হবে। মনে করুন $1cm^3$ আয়তনের এক পাত্র থেকে এমন এক গতিতে গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছে যাতে প্রতি সেকেণ্ডে পাত্র ত্যাগ করে যাওয়া অণুর সংখ্যা দশ লক্ষ। সহজেই হিসেব করে প্রমাণ করা যায় যে, অনুরূপ অবস্থায় পাত্র থেকে সমস্ত গ্যাস বেরিয়ে যেতে সময় লাগবে প্রায় দশ লক্ষ বছর।

অ্যাভোগেড্রোর নীতির সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে, নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপে অণুসংখ্যা এবং অণু আবদ্ধ আছে যে পাত্রে সেই পাত্রের আয়তনের অনুপাত N/V, সব গ্যাসের ক্ষেত্রেই সমান।

যেহেতু কোনো গ্যাসের ঘনত্ব $\rho = Nm/V$, বিভিন্ন গ্যাসের ঘনত্বের অনুপাত তাদের আণবিক ভরের অনুপাতের সমান :

$$\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{m_1}{m_2}$$

অতএব বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থের শুধুমাত্র ওজন নির্ণয় করে তাদের অণুর আপেক্ষিক ভর পরিমাপ করা সম্ভব। রসায়নবিদ্যার বিকাশের ইতিহাসে একসময়ে এই ধরনের পরিমাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অ্যাভোগেড্রোর নীতির সাহায্যে এছাড়াও প্রমাণ করা যায় যে, আদর্শ গ্যাসের অনুরূপ অবস্থায় যে কোনো পদার্থের এক মোলের ক্ষেত্রে $pV = kN_A T$ হয়, যেখানে k একটি সার্বজনীন ধ্রুবক (বিখ্যাত জার্মান পদার্থ বিজ্ঞানী লুড্‌ভিক বোল্টৎসমানের নামানুসারে চিহ্নিত) যার মান $1{\cdot}38 \times 10^{-16}$erg/K। kN_A গুণফলকে সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক R বলা হয় অর্থাৎ $R = kN_A$.

আদর্শ গ্যাস সূত্রকে অনেক সময়ে নিম্নলিখিত রূপেও লেখা হয় ঃ

$$pV = \mu RT$$

যেখানে μ পদার্থটির মোলে প্রকাশিত পরিমাণ নির্দেশ করে। বাস্তবে এই সমীকরণকে প্রায়ই ব্যবহার করা হয়।

আণবিক গতিবেগ (Molecular velocity) ঃ

তত্ত্বগতভাবে প্রমাণ করা যায় যে, নির্দিষ্ট তাপমাত্রায়, অণুগুলির গড়

গতিশক্তি $mv^2_{av}/2$ সর্বক্ষেত্রে সমান। তাপমাত্রার সংজ্ঞা অনুযায়ী, কোনো গ্যাসের অণুগুলির সরলরৈখিক গতির গড় গতিশক্তি পরম তাপমাত্রার সমানুপাতিক।

আদর্শ গ্যাস সমীকরণ এবং বারনৌলির সমীকরণ একত্রিত করলে পাই

$$\left(\frac{mv^2}{2}\right)_{av} = \frac{3}{2}\ kT$$

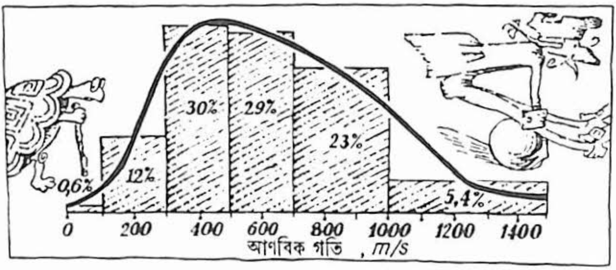
আদর্শ গ্যাসপূর্ণ থার্মোমিটারের সাহায্যে তাপমাত্রা নির্ণয় প্রণালী উপরোক্ত সম্পর্কের এক অত্যন্ত সরল ব্যাখ্যা দিতে পারে। তাপমাত্রা, আমরা জানি সরলরৈখিক গতিশক্তির গড়ের সঙ্গে সমানুপাতিক। যেহেতু আমরা ত্রিমাত্রিক জগতে বাস করি, আমরা বলতে পারি যে, বিশৃঙ্খলভাবে সর্বদিকে গতিশীল কোনো বিন্দুর স্বাতন্ত্র্য সংখ্যা তিন। সুতরাং একটি গতিশীল বিন্দুর প্রতি মাত্রা স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শক্তির পরিমাণ $kT/2$।

আসুন, অক্সিজেন অণুর ঘরের তাপমাত্রায় গড় গতি বের করা যাক। হিসাবের সুবিধের জন্য ধরা যাক, ঘরের তাপমাত্রা $27°C = 300$ K। অক্সিজেনের আণবিক গুরুত্ব 32, সুতরাং একটিমাত্র অক্সিজেন অণুর ভর $32/(6 \times 10^{23})$ gm। সরল গাণিতিক হিসেব অনুসারে পাওয়া যায় $v_{av} = 4{\cdot}8 \times 10^4$ cm/s অর্থাৎ প্রায় 500 m/s। হাইড্রোজেন অণু অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিসম্পন্ন। তাদের ভর অক্সিজেনের তুলনায় 16 গুণ কম এবং তাদের গতি $\sqrt{16}$ অর্থাৎ 4 গুণ বেশী বা ঘরের তাপমাত্রায় প্রায় 2 km/s। এবার অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্যমান একটি ক্ষুদ্র কণিকার তাপীয় গতি পরিমাপ করা যাক। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা যে অতিক্ষুদ্র ধূলিকণা দেখতে পাই তার ব্যাস প্রায় 1 μm (10^{-4} cm)। প্রায় একক ঘনত্ববিশিষ্ট এই ধরনের একটি ধূলিকণার ভর প্রায় 5×10^{-13} gm। হিসেব করলে এর গতি দাঁড়ায় প্রায় $0{\cdot}5$ cm/s। এই মানের গতি যে চোখে ধরা পড়বে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

$0{\cdot}1$ gm ভরবিশিষ্ট একটি কণিকার ব্রাউনীয় গতি হিসেবে সৃষ্ট গতির পরিমাণ 10^{-6} cm/s। তাই এই ধরনের কণিকার ব্রাউনীয় গতি যে আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়বে না, তাতেও বিস্ময়ের কিছু নেই।

আমরা এতক্ষণ অণুর গড় গতির কথা বলছিলাম। কিন্তু সব অণুই একই গতিতে ছোটাছুটি করে না; মোট অণুর একটি অংশ বেশী দ্রুতগতিসম্পন্ন, কিন্তু অন্যগুলির গতি কম। এ সব কিছুই হিসেব করে মাপা যায়। কিন্তু আমরা শুধুমাত্র হিসেবের ফলগুলিকেই লিপিবদ্ধ করবো।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় 15°C-এর কাছাকাছি তাপমাত্রায়, নাইট্রোজেন অণুর



চিত্র 3·2

গড় গতি প্রায় 500 m/s ; অণুগুলির 300 এবং 700 m/s গতির মাঝামাঝি গতিতে ছোটাছুটি করে। মোট অণুর কেবলমাত্র 0.6% অংশের গতি কম—0 থেকে 100 m/s। আবার কেবলমাত্র 5·4%-এর গতি খুব বেশী—1000 m/s-এর থেকেও বেশী (চিত্র 3·2)।

চিত্রে অংকিত স্তম্ভগুলির ভূমি সংশ্লিষ্ট গতির ব্যাপ্তি এবং ক্ষেত্রফল ঐ গতি-সীমানার মধ্যে যে সব অণু আছে তাদের শতকরা হার সূচিত করেছে।

অনুরূপভাবে সরলরৈখিক গতিশক্তির বিভিন্নতার নিরিখে অণুগুলি কিভাবে বিভক্ত তাও হিসেব করে বের করা সম্ভব।

যে সব অণুর শক্তি গড় শক্তির দ্বিগুণের বেশী তাদের শতকরা অংশ 10%-এর কম। আরও বেশী শক্তিসম্পন্ন অণুর শতকরা অংশ, শক্তির পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রুততর হারে কমতে থাকে। এজন্য দেখা যায় যে, যেসব অণুর শক্তির পরিমাণ গড়শক্তির চারগুণেরও বেশী তাদের শতকরা অংশ মাত্র 0·7%, যাদের 8 গুণেরও বেশী তাদের $0{\cdot}06 \times 10^{-4}\%$ এবং যাদের 16 গুণেরও বেশী তাদের $2 \times 10^{-3}\%$।

11 km/s গতিসম্পন্ন অক্সিজেন অণুর শক্তি 32×10^{-12} erg। কিন্তু ঘরের উষ্ণতায় একটি অণুর গড় শক্তি মাত্র 6×10^{-14} erg। সুতরাং 11 km/s গতিসম্পন্ন অণুর শক্তি গড়গতিসম্পন্ন অণুর শক্তির তুলনায় অন্ততঃ 500 গুণ বেশী। 11 km/s-এর চেয়ে বেশী দ্রুতগতিসম্পন্ন অণুগুলির শতকরা অংশ যে অকল্পনীয় ক্ষুদ্র, একটি রাশি 10^{-300}-এর কাছাকাছি হবে, তাতে পূর্বোক্ত হিসেব অনুধাবন করতে পারলে বিস্ময়ের কিছু থাকে না।

কিন্তু আমরা 11 km/s গতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি কেন? এই সিরিজের প্রথম বইতে আমরা জানিয়েছিলাম যে, কেবলমাত্র এই গতির চেয়ে বেশী গতিসম্পন্ন বস্তুই পৃথিবীর অভিকর্ষকে উপেক্ষা করে মুক্তিলাভ করতে পারে। এজন্য যেসব অণু পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে অনেক ঊর্ধ্বে আরোহণ করেছে, তাদের

পক্ষে পৃথিবীর বন্ধন কাটিয়ে মহাকাশ যাত্রা করা সম্ভব, কিন্তু কেবলমাত্র যদি তাদের 11 km/s গতি থাকে। এই ধরনের অতি দ্রুতগতিসম্পন্ন অণুর অংশ যে নগণ্য তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আর তাই এই প্রক্রিয়ায় লক্ষ লক্ষ বছরেও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ফুরিয়ে যাওয়ার ভয় নেই।

বায়ুমণ্ডল কি হারে বেরিয়ে যাবে তা খুব বেশী পরিমাণে নির্ভর করে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি GMm/r-এর ওপর। যদি অণুর গড় গতিশক্তি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তুলনায় খুব বেশী কম হয়, তাহলে এইভাবে বায়ুমণ্ডলের বেরিয়ে যাওয়া বাস্তবে সম্ভব নয়। কিন্তু চাঁদের বহির্তলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর তুলনায় কুড়ি ভাগের একভাগ, যেজন্যে অক্সিজেন অণুর 'পলায়নের' উপযুক্ত শক্তি সেখানে 1.5×10^{-12} erg। এই মান অণুর গড় গতিশক্তির মাত্র 20—25 গুণ। তাই চাঁদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে মোট অণুর যে অংশ তার মান 10^{-17}। এই মান পৃথিবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 10^{-300}-এর তুলনায় অনেক অনেক গুণ বেশী এবং তার ফলে চাঁদ ছেড়ে বাতাস অনেক বেশী তাড়াতাড়ি মহাকাশে ছড়িয়ে যায়। চাঁদে বায়ুমণ্ডলের অনুপস্থিতি এজন্যেই আমাদের আশ্চর্য করে না।

তাপ প্রসারণ (Thermal expansion) **:**

কোনো বস্তুকে উত্তপ্ত **করলে** তার ভিতরকার পরমাণুগুলির (অণুগুলির) গতি আরও বেড়ে যায়। তারা পরস্পর ঠেলাঠেলি করতে আরম্ভ করে এবং বেশী জায়গা অধিকার করে। এর সাহায্যেই নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণকে ব্যাখ্যা করা যায় ঃ উত্তপ্ত হলে কঠিন, তরল কিংবা গ্যাসীয় পদার্থ প্রসারিত হয়।

তাপের প্রভাবে গ্যাসের প্রসারণ সম্পর্কে বেশী কিছু বলার নেই ঃ বস্তুতঃ গ্যাসের তাপমাত্রা এবং আয়তনের অনুপাতকে ভিত্তি করেই তাপমাত্রা মাপার স্কেল গড়ে উঠেছে।

$V = V_0 T/273$ সম্পর্কটি থেকে বোঝা যায় যে, স্থির চাপে কোনো গ্যাসের আয়তন প্রতি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্যে, 0°C-এ তার যে আয়তন ছিল তার 1/273 (অর্থাৎ 0·0037) অংশ হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (এই নিয়মকে অনেক সময় গে-লুসাকের সূত্র বলা হয়)।

সাধারণ অবস্থায় অর্থাৎ ঘরের উষ্ণতায় এবং বায়ুমণ্ডলীয় চাপে, অধিকাংশ তরল গ্যাসের তুলনায় অর্ধেক থেকে এক-তৃতীয়াংশ প্রসারিত হয়।

আমরা এর আগে একাধিকবার জলের ব্যতিক্রান্ত প্রসারণ সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। জলের আয়তন 0°C থেকে 4°C পর্যন্ত উত্তপ্ত করার সময় সংকুচিত হয়। পৃথিবীর বুকে জৈব জীবনের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জলের এই ব্যতিক্রান্ত

প্রসারণের অনন্যসাধারণ গুরুত্ব আছে। শরৎকালে জলের উপরতল ঠাণ্ডার জন্য ঘনতর হয়ে নীচে নেমে যায়। নীচের উষ্ণতর জল ওপরে উঠে সেই জায়গা অধিকার করে। কিন্তু শীতপ্রধান অঞ্চলে এই ধরনের মিশ্রণের কাজ চলে যতক্ষণ না তাপমাত্রা নামতে নামতে 4°C-এ এসে দাঁড়ায়। তাপমাত্রা আরও কমলে জলের উপরতল আর সংকুচিত হয় না এবং তাই ঘনতর হয়ে নীচেও নেমে আসে না। এইভাবে উপরতলের তাপমাত্রা 4°C থেকে ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং কমতে কমতে 0°C-এ পৌঁছলে জল কঠিনীভূত হয়ে বরফে পরিণত হয়।

জলের এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই নদীর জল শীতপ্রধান অঞ্চলে তলা পর্যন্ত পুরোপুরি জমে যেতে পারে না। জল যদি তার এই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হঠাৎ হারিয়ে ফেলে, তাহলে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তা অনুমান করতে বেশী কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয় না।

কঠিন পদার্থের প্রসারণ ক্ষমতা তরল পদার্থের চেয়ে বেশ কম ; গ্যাসের প্রসারণ ক্ষমতার শতাংশ থেকে সহস্রাংশ মাত্র।

অনেক ক্ষেত্রে তাপ প্রসারণ বিরক্তিকর বাধার সৃষ্টি করে। ঘড়ির গতিশীল কয়েকটি অংশ যদি 'ইনভার' (invar নামের উৎস invariant অর্থাৎ অপরিবর্তনীয়) সংকর ধাতু দিয়ে তৈরী করা না হয়, তাহলে তাপমাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাপ বদলে গিয়ে ঘড়ি চলার গতি বদলে দেয়। ইনভার অতিরিক্ত পরিমাণ নিকেল মিশানো ইস্পাত ধাতুসংকর, কলকব্জা তৈরীর কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। ইনভার নির্মিত দণ্ড 1°C তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে তার দৈর্ঘ্যের মাত্র দশলক্ষ ভাগের একভাগ প্রসারিত হয়।

আপাতঃ দৃষ্টিতে নগণ্য পরিমাণ প্রসারণ কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। এর কারণ, কঠিন পদার্থের নিম্নমানের সংকোচন ক্ষমতা তার তাপ প্রসারণকে সহজে প্রশমিত করতে পারে না।

1°C-এ উত্তপ্ত করলে একটি ইস্পাতের দণ্ড তার দৈর্ঘ্যের মাত্র লক্ষ ভাগের এক ভাগ প্রসারিত হয় অর্থাৎ চোখে দেখে বোঝা যায় না এমন এক সামান্য পরিমাণ। কিন্তু এই লক্ষভাগের একভাগ প্রসারণ প্রশমিত করার জন্য দণ্ডটির দৈর্ঘ্যকে লক্ষভাগের একভাগ সংকুচিত করতে হলে, প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটারে 20 kgf বল প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়।

তাপ প্রসারণের ফলে উদ্ভূত বল যন্ত্রপাতির ভাঙ্গচুর ঘটিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। এজন্যই, এই ধরনের বলের উৎপত্তির জন্য ক্ষতি যাতে না হয় সেই উদ্দেশ্যে, রেললাইনের মধ্যে মধ্যে ফাঁক রাখা হয়। কাচের পাত্র ব্যবহার করার সময় তাপ প্রসারণ সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকার, কেননা এই ধরনের পদার্থ অসম উত্তাপের ফলে ফেটে যেতে পারে। এজন্য ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত

পরীক্ষাপাত্রগুলিকে কোয়ার্টজ কাচ দিয়ে (গলিত কোয়ার্টজ অর্থাৎ সিলিকন ডাইঅক্সাইডকে অনিয়তাকার কাচে পরিণত করা যায়) তৈরী করা হয়, কেননা কোয়ার্টজ কাচের ঐ ধরনের গলদ নেই। তাপমাত্রার যে পরিবর্তনের ফলে একটি তামার দণ্ডের দৈর্ঘ্য এক মিলিমিটার বাড়ে, কোয়ার্টজ দণ্ডের ক্ষেত্রে অনুরূপ পরিবর্তনের ফলে দৈর্ঘ্যবৃদ্ধির পরিমাণ 30 – 40 μm। কোয়ার্টজের তাপ প্রসারণ এতই নগণ্য যে একটি কোয়ার্টজ পাত্রকে কয়েকশো ডিগ্রীতে গরম করার পর হঠাৎ জলে ডোবোলেও ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

তাপধারিতা (Heat capacity) ঃ

কোনো বস্তুর অভ্যন্তরীণ শক্তি তার তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে। বস্তুটিকে বেশী উত্তপ্ত করতে হলে বেশী পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়। কোনো বস্তুর তাপমাত্রাকে T_1 থেকে T_2-তে তুলতে যে শক্তি সরবরাহ করার প্রয়োজন হয়, তার পরিমাণ তাপের আকারে

$$Q = C(T_2 - T_1).$$

এখানে C একটি ধ্রুবক, যা বস্তুটির তাপধারিতা নামে পরিচিত। উপরোক্ত সম্পর্ক থেকে তাপধারিতার যে সংজ্ঞা পাওয়া যায় তা হল ঃ বস্তুটির তাপমাত্রাকে 1°C বাড়াবার জন্যে প্রয়োজনীয় উত্তাপকে তাপধারিতা C বলে। তাপধারিতা পরীক্ষাকালীন তাপমাত্রার উপরও নির্ভর করে ঃ 0°C থেকে 1°C-এ উত্তপ্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় উত্তাপ, 100°C থেকে 101°C-এ উত্তপ্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় উত্তাপ থেকে সামান্য' আলাদা।

C-কে অনেক সময় একক ভরের বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহার করা হয় এবং সেক্ষেত্রে নাম দেওয়া হয় আপেক্ষিক তাপ। আপেক্ষিক তাপকে সূচিত করার জন্য ছোট হরফের c ব্যবহৃত হয়।

m ভরের কোনো বস্তুকে উত্তপ্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় তাপকে নিম্নলিখিত সম্পর্কের সাহায্যে পরিমাপ করা হয় ঃ

$$Q = mc(T_2 - T_1).$$

পরের লেখাগুলির মধ্যে আমরা আপেক্ষিক তাপধারিতা নিয়েই আলোচনা করবো, কিন্তু সংক্ষিপ্ত হবে বলে ব্যবহার করবো তাপধারিতা শব্দটিকে। আমরা ঠিক কি নিয়ে আলোচনা করছি তা ব্যবহৃত একক দেখেও বোঝা যাবে।

বিভিন্ন পদার্থের ক্ষেত্রে তাপধারিতার মানে বেশ পার্থক্য দেখা যায়। সংজ্ঞা অনুসারে ডিগ্রীপিছু ক্যালোরিতে প্রকাশিত জলের তাপধারিতার মানকে একক ধরা হয়।

অধিকাংশ বস্তুর তাপধারিতা জলের থেকে কম। অধিকাংশ তেল,

অ্যালকোহল এবং অন্যান্য তরলের তাপধারিতা 0·5 cal/g.K-এর কাছাকাছি। কোয়ার্টজ, কাচ ও বালির তাপধারিতা 0·2 cal/g.K-এর এবং লোহা ও তামার 0·1 cal/g.K-এর কাছাকাছি। গ্যাসের মধ্যে হাইড্রোজেনের তাপধারিতা 3·4 cal/g.K এবং বায়ুর 0·24 cal/g.K।

তাপমাত্রা কমার সঙ্গে সঙ্গে সব বস্তুর তাপধারিতাই কমতে থাকে এবং পরম শূন্য তাপাঙ্কের কাছাকাছি প্রায় নগণ্য মানে পরিণত হয়। এজন্য দেখা যায়, 20 K তাপমাত্রায় তামার তাপধারিতা মাত্র 0·0035, যা ঘরের উষ্ণতায় দৃষ্ট মানের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ।

বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে তাপের আদান-প্রদান সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যা সমাধানের জন্য তাপধারিতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার প্রয়োজন।

জল এবং মাটির তাপধারিতার বিভিন্ন মান সামুদ্রিক এবং মহাদেশীয় আবহাওয়ার বিভিন্নতার অন্যতম কারণ। জলের তাপধারিতার মান মাটির তুলনায় পাঁচগুণ বেশী বলে, জল তুলনামূলকভাবে ধীর গতিতে উত্তপ্ত অথবা শীতল হয়।

সামুদ্রিক অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে জল মাটির তুলনায় আস্তে আস্তে গরম হয় বলে চারপাশের বাতাসকে ঠাণ্ডা রাখে, আবার শীতকালে সমুদ্রের অপেক্ষাকৃত গরম জল ঠাণ্ডা হওয়ার সময় বাতাসকে গরম করে তুষারপাতের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। সহজেই হিসেব করে বার করা যায় যে, 1 m^3 সমুদ্রের জল 1°C ঠাণ্ডা হাওয়ার সময় 3000 m^3 বাতাসকে 1°C উষ্ণ করে। এজন্যই সামুদ্রিক অঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন আর শীতকালীন তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য এবং আবহাওয়ার উগ্রতা মহাদেশীয় অঞ্চলের তুলনায় কম।

তাপপরিবাহিতা (Thermal conductivity) :

প্রত্যেক দ্রব্যই উষ্ণতর বস্তু থেকে শীতলতর বস্তুর মধ্যে তাপ সঞ্চালনের পথে সেতু হিসেবে কাজ করতে পারে। যেমন এক কাপ গরম চায়ে ডোবানো চামচ এই ধরনের সেতু হিসেবে কাজ করে। ধাতব দ্রব্য খুব ভালোভাবে তাপ পরিবহণ করে। কাপে রাখা চামচের হাতল এক সেকেণ্ডের মধ্যেই গরম হয়ে ওঠে।

যদি কোনো উষ্ণ মিশ্রণকে আলোড়িত করার প্রয়োজন হয়, তাহলে আলোড়কের হাতল কাঠ বা প্লাস্টিক নির্মিত হওয়া উচিত। এই কঠিন পদার্থগুলির তাপ-পরিবহণ ক্ষমতা ধাতুর তুলনায় হাজার গুণ কম। আমরা সাধারণতঃ বলি 'তাপপরিবহণের' কথা, কিন্তু একই প্রক্রিয়াকে 'শৈত্য পরিবহণ' বলাও চলে। অবশ্য উত্তাপ যে অভিমুখেই যাক না কেন, তার ফলে বস্তুর ধর্মের কোনো পরিবর্তন হয় না। বরফজমা আবহাওয়ায় আমরা খালি হাতে খোলা জায়গায় রাখা ধাতুর তৈরী জিনিস সাবধানে ছুঁই, কিন্তু কাঠের হাতল ধরি নির্ভয়ে।

তাপের কুপরিবাহী, এদের তাপরোধকও বলে, কয়েকটি বস্তুর উদাহরণ ঃ ইঁট, কাঠ, কাচ, প্লাস্টিক। বাড়ী, চুল্লী কিংবা রেফ্রিজারেটরের দেয়াল এই ধরনের জিনিস দিয়েই তৈরী করা হয়।

ধাতুগুলি তাপের সুপরিবাহী। সবচেয়ে ভালো পরিবাহী তামা আর রুপো—এগুলির তাপপরিবহণ ক্ষমতা লোহার প্রায় দ্বিগুণ।

অবশ্য তাপসঞ্চালনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র কঠিন পদার্থই সেতুর কাজ করতে পারে একথা ঠিক নয়। তরল পদার্থও তাপপরিবহণ করতে পারে কিন্তু কঠিন পদার্থের তুলনায় অনেক কম হারে। ধাতুর পরিবহণ ক্ষমতা অধাতব কঠিন কিংবা তরলপদার্থের তুলনায় কয়েকশো গুণ বেশী।

নিম্নলিখিত পরীক্ষার সাহায্যে জলের কুপরিবাহিতা প্রদর্শন করা যায়। একটি জলভরা টেস্টটিউবের নীচে এক টুকরো বরফ বেঁধে টেস্টটিউবটির ওপরের অংশ গ্যাসবার্নারে গরম করলে দেখা যাবে যে, জল ফুটতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু বরফ গলেনি। যদি টেস্টটিউবটি ধাতব পদার্থে তৈরী হয় আর ভিতরে জল না থাকে তাহলে গরম করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বরফ গলতে শুরু করেছে দেখা যায়। জলের তাপপরিবহণ ক্ষমতা তামার তুলনায় প্রায় দুশো গুণ কম।

গ্যাসের পরিবহণ ক্ষমতা অধাতব কঠিন বা তরলের তুলনায় কয়েক দশক গুণ কম। বায়ুর তাপপরিবহণ ক্ষমতা তামার কুড়ি হাজার ভাগের একভাগ।

গ্যাসের তাপপরিবহণ ক্ষমতা অতো অল্প বলেই আমরা হাতের তালুতে শুকনো বরফ (কঠিনীকৃত কার্বন ডাইঅক্সাইড) রাখতে পারি, যার তাপমাত্রা —78°C ; এবং এমনকি কয়েক ফোঁটা তরল নাইট্রোজেন, যার তাপমাত্রা —196°C। সেগুলিকে আঙুল দিয়ে না রগড়ালে হাতে ফোস্কা পড়ার সম্ভাবনা নেই। এর কারণ যখন তরল বা কঠিন পদার্থটি অত্যন্ত দ্রুতবেগে বাষ্পীভূত হতে থাকে, তখন তার চারপাশে একটি 'গ্যাসীয় আচ্ছাদন' তৈরী হয়, যা তাপরোধক হিসেবে কাজ করে।

অতিতপ্ত পাত্রে জল ফেললে বাষ্পে আচ্ছাদিত বিন্দুগুলির যে অবস্থা হয়, তাকে উপগোলকীয় অবস্থা (spheroidal state) বলে। হাতের তালুতে ফুটন্ত জলের ফোঁটা পড়লে ভীষণ ফোস্কা পড়ে, যদিও মানুষের দেহতাপমাত্রা আর ফুটন্ত জলের তাপমাত্রার তফাত, দেহতাপমাত্রা আর তরল বায়ুর তাপমাত্রার তফাতের তুলনায় অনেক কম। যেহেতু হাতের তালু ফুটন্ত জলের বিন্দুর তুলনায় ঠাণ্ডা, তাপ ফুটন্ত বিন্দু ত্যাগ করে হাতে ঢোকার সময় জলবিন্দুর স্ফুটন বন্ধ হয়ে যায় এবং কোনো বাষ্প আচ্ছাদন তৈরী হতে পারে না।

এটা বোঝা মোটেই শক্ত নয় যে, শূন্যতাই (vacuum) সবচেয়ে ভালো

তাপরোধক। শূন্যতার মধ্যে তাপ বহন করার মতো কিছু থাকে না, আর তাই তাপপরিবহণের মাত্রা থাকে সর্বনিম্ন মানে।

সুতরাং যদি আমরা একটি তাপরোধী বেড়া তৈরী করে কোনো গরম বস্তুকে কোনো ঠাণ্ডা বস্তু থেকে কিংবা ঠাণ্ডা বস্তুকে গরম বস্তু থেকে পৃথক রাখতে চাই, তাহলে সর্বোত্তম উপায় হল একটি দুই দেয়াল বিশিষ্ট খাঁচা তৈরী করে তার ভেতর থেকে পাম্পের সাহায্যে সমস্ত বাতাস বের করে দেওয়া। এই কাজ যদি সত্যি সত্যি করা হয়, তাহলে এক অদ্ভূত ঘটনা নজরে পড়ে; বায়ু নিষ্কাশিত করার ফলে চাপ কমতে কমতে যতক্ষণ না কয়েক মিলিমিটার পারদচাপে পরিণত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাপপরিবহণ ক্ষমতার ক্ষেত্রে কোনো লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে না। কেবলমাত্র শূন্যতাকে আরো বেশী বাড়াবার পরেই আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হয়, তাপপরিবহণ ক্ষমতা অতি দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে।

কিন্তু এর কারণ কি?

ঘটনাটিকে বুঝতে গেলে গ্যাসের মধ্যে তাপসঞ্চালন প্রক্রিয়াকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

গরম জায়গা থেকে ঠাণ্ডা জায়গায় তাপ সঞ্চালিত হয় এক অণু থেকে পার্শ্ববর্তী অন্য অণুতে শক্তির সঞ্চালন মারফত। সাধারণতঃ দুটি অণুর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটলে দ্রুতগামী অণুর গতি কমে এবং ধীরগামী অণুর গতি বাড়ে। এর অর্থ উষ্ণ স্থান শীতল হয় এবং শীতল স্থান উষ্ণ।

কিন্তু চাপের হ্রাস কিভাবে তাপসঞ্চালনকে প্রভাবিত করতে পারে? যেহেতু চাপ কমলে ঘনত্ব কমে, তাই তাপসঞ্চালনের কারণ, দ্রুতগামী অণু আর ধীরগামী অণুর মধ্যে সংঘর্ষ, কমসংখ্যক বার ঘটে। এজন্য এই প্রক্রিয়া তাপপরিবহণ ক্ষমতা কমায়। কিন্তু অন্যদিকে চাপ কমলে অণুগুলির গড় মুক্তপথ (mean free path) বাড়ে, যার ফলে তাপসঞ্চালন ঘটে বেশী দূরত্বে এবং তাপপরিবহণ ক্ষমতা বাড়তে চায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই দুই বিপরীত প্রবণতা অনেকক্ষণ পরস্পরকে প্রশমিত করে রাখে এবং পাম্প করে বাতাস বের করে দেওয়ার ফলে তাপপরিবহণ ক্ষমতা বদলায় না।

যতক্ষণ পর্যন্ত গড় মুক্তপথ পাত্রের দেয়ালগুলির দূরত্বের কাছাকাছি না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত অবস্থা একরকমই থাকে। কিন্তু চাপ যদি আরও কমানো হয়, তাহলে দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা দিয়ে বেড়াচ্ছে যে সব গ্যাসঅণু, তাদের ভিতরকার গড় মুক্তপথের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় না, এবং ঘনত্বের যে হ্রাস হয় তাও প্রশমিত হতে পারে না। ফলে তাপপরিবহণ ক্ষমতাও চাপ কমার সঙ্গে সঙ্গে আনুপাতিক হারে দ্রুত কমতে থাকে এবং অতিরিক্ত নিম্ন চাপে প্রায় শূন্যে পরিণত হয়।

বায়ুশূন্যতার ধর্মের উপর নির্ভর করেই বায়ুশূন্য বোতল তৈরী করা হয়। বায়ুশূন্য বোতল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এগুলি কেবলমাত্র গরম কিংবা ঠাণ্ডা খাবার সংরক্ষণের জন্যই ব্যবহৃত হয় না, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার গবেষণার কাজেও লাগে। আবিষ্কার-কর্তার নামানুসারে এগুলিকে ডেওয়ার ফ্লাস্ক (Dewar flask) বলা হয়। তরল বায়ু, নাইট্রোজেন কিংবা অক্সিজেনকে এই ধরনের পাত্রে ভরে নিয়ে যাওয়া হয়। কি করে উপরোক্ত গ্যাসগুলিকে তরলে পরিণত করা হয়, সে কথা আমরা পরে আলোচনা করবো।*

পরিচলন (Convection):

কিন্তু জলের যদি তাপপরিবহণ ক্ষমতা এতো কমই হয়, তাহলে চায়ের কেট্‌লিতে জল কিভাবে ফোটে? বায়ুর তাপপরিবহণ ক্ষমতা তো আরো খারাপ, তবু ঘরের মধ্যে সর্বত্র বায়ুর তাপমাত্রা এক হয় কেন, সেটাও স্পষ্ট নয়।

কেট্‌লির মধ্যে জল যে দ্রুত ফুটতে আরম্ভ করে তার কারণ অভিকর্ষ। জলের নীচের স্তর উত্তপ্ত হয়ে প্রসারিত হয় এবং হাল্‌কা হয়ে উপরে ওঠে, তখন ঠাণ্ডা জল এসে সেই জায়গা দখল করে। এইভাবে পরিচলনের সাহায্যে অতি দ্রুত উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে (পরিচলনের ইংরাজী convection শব্দটি এসেছে ল্যাটিন 'convectus' অর্থাৎ 'একত্রিত করা' থেকে)। রকেটে করে আন্তঃগ্রহ যাত্রাপথে জলকে এতো সহজে কেট্‌লিতে গরম করা সম্ভব নয়।

অল্প আগে আমরা যখন নদী কেন তলা পর্যন্ত জমে বরফ হয়ে যায় না— এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম, তখন আমরা নাম উল্লেখ না করলেও তাপ-পরিচলনের কথাই বুঝিয়েছিলাম।

কেন ঘর উষ্ণ রাখার ব্যবস্থায় ঘরের মেঝেতে গরম বাতাসের প্রবেশপথ করা হয়? ভেণ্টিলেটার কেন বসানো হয় জানলা থেকে উঁচুতে? দেয়ালের নীচের দিকে ভেণ্টিলেটারের জন্য গর্ত করাই তো বেশী সুবিধের আর উষ্ণ বাতাস ঢোকানোর রেডিয়েটার যাতে চলাচলের পথে অসুবিধের সৃষ্টি না করতে পারে, তাই তাকে ছাদের দিকে বসানোর পরিকল্পনা তো খারাপ বলে মনে হয় না। কিন্তু ঐ ধরনের উপদেশ মেনে কাজ করলে শীঘ্রই দেখা যাবে যে রেডিয়েটারের

---

* যাঁরাই বায়ুশূন্য বোতল দেখেছেন তাঁরাই লক্ষ্য করেছেন যে, বোতলগুলির দেয়ালে সবসময়েই রূপোর আস্তরণ দেওয়া থাকে। কিন্তু কেন? এর কারণ, তাপপরিবহণই তাপসঞ্চালনের একমাত্র উপায় নয়। তাপসঞ্চালনের আরো এক উপায় আছে, যাকে বিকিরণ বলে এবং যার সম্পর্কে এই সিরিজের অন্য একটি বইতে আলোচনা করা হবে। সাধারণ অবস্থায় এই উপায় তাপপরিবহণ প্রক্রিয়ার তুলনায় অনেক দুর্বল, কিন্তু তবু যা হোক পুরোপুরি লক্ষণীয়। বায়ুশূন্য বোতলের দেয়ালে রূপোর প্রলেপ দেওয়া হয় প্রধানতঃ বিকিরণ প্রক্রিয়াকে কমানোর জন্য।

গরম বাতাস ঘর গরম করতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং ভেন্টিলেটারও ঘরের মধ্যে বায়ু চলাচল ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে পারছে না।

ঘরের বাতাস এবং কেটলির জল উভয়ক্ষেত্রেই একই ধরনের ঘটনা ঘটে। রেডিয়েটার খুলে দিলে ঘরের নীচের স্তরের বায়ু উত্তপ্ত হয়। উষ্ণতার ফলে বায়ু লঘু হয়ে ছাদের দিকে উঠতে থাকে। ঠাণ্ডা বাতাসের ভারী স্তর এসে সেই জায়গা দখল করে এবং তারপর সেগুলিও গরম হয়ে ছাদের দিকে যায়। এইভাবে ঘরের মধ্যে বায়ুপ্রবাহের দুটি নিরবচ্ছিন্ন ধারার উদ্ভব হয়—উষ্ণবায়ুর ঊর্ধ্বগামী এবং শীতল বায়ুর নিম্নগামী স্রোত। শীতকালে ভেন্টিলেটার খোলা রাখলে শীতলবায়ুর একটি স্রোত ঘরে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। যেহেতু তা ঘরের ভিতরকার বায়ুর তুলনায় ভারী, সেইজন্যে নীচে নামতে থাকে এবং তার চাপে ঘরের ভিতরকার উষ্ণবায়ু ওপরে উঠে ভেন্টিলেটার দিয়ে বেরিয়ে যায়।

কেরোসিন বাতি শুধুমাত্র তখনি ভালোভাবে জ্বলতে পারে, যখন তার চারধার ঘিরে উঁচু কাচের চিমনী থাকে। তা বলে যেন ভাববেন না যে, বাইরের বাতাস আড়াল করার জনাই শুধু এই চিমনী ব্যবহার করা হয়। এমনকি শান্ততম পরিবেশেও চিমনী পরানোর সঙ্গে সঙ্গে শিখার ঔজ্জ্বল্য বেড়ে যায়। কাচের চিমনীর ভূমিকা হচ্ছে, ঊর্ধ্বগামী বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি করে শিখার দিকে ধাবমান বায়ুপ্রবাহ বাড়ানো। এই ঊর্ধ্বগামী বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টির কারণ, কাচের ভিতরকার বায়ু দহনের কাজে অক্সিজেন জোগানোর পর অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয়ে ওপরে উঠতে থাকে এবং বিশুদ্ধ শীতল বায়ু সেই জায়গা অধিকার করার জন্যে বাতির সলতের কাছে অবস্থিত ছিদ্রগুলির ভিতর দিয়ে ছুটে আসে।

কাচের চিমনী যত লম্বা হয় কেরোসিন বাতি তত বেশী ভালো জ্বলে। বস্তুতঃ যে গতিতে শীতল বায়ু বাতির ভিতর ছুটে আসে তা নির্ভর করে চিমনীর ভিতরের উত্তপ্ত বায়ু এবং বাইরের শীতল বায়ুর ওজনের অন্তরের উপর। চিমনী যত বেশী লম্বা হয়, এই অন্তরও তত বেশী বাড়ে, আর তাই ঊর্ধ্বগামী বায়ুপ্রবাহও প্রবলতর হয়।

একই কারণে কারখানার চিমনীগুলিকেও উঁচু করা হয়। কারখানার চিমনীর জন্য প্রয়োজন বায়ুর বিশেষভাবে দ্রুত অন্তপ্রবাহ আর সেজন্যে উপযুক্ত ঊর্ধ্বগামী বায়ুপ্রবাহের পরিমাণ। উঁচু চিমনী গড়েই এই প্রয়োজন মেটানো হয়।

রকেটের ভিতর ভারশূন্য পরিবেশে তাপপরিচলন প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতির জন্য দিয়াশলাই, বাতি বা গ্যাসদীপ ব্যবহার করা অসম্ভব : দহনজাত পদার্থগুলি শিখাকে নিভিয়ে দেয়।

বায়ু তাপের কুপরিবাহী ; আমরা এর সাহায্যে তাপপরিবহণ প্রক্রিয়া রোধ

করতে পারি, কিন্তু কেবলমাত্র একটি শর্তে; তা হল তাপপরিচলনও যেন না হতে পারে, অর্থাৎ ঠাণ্ডা আর গরম বাতাস মিশে তাপরোধী ব্যবস্থাকে যেন বরবাদ না করে।

তাপপরিচলন ব্যবস্থাকে অকার্যকর করার জন্য নানা ধরনের সছিদ্র কিংবা আঁশযুক্ত পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এই সব পদার্থের ভিতর দিয়ে বায়ু চলাচল খুব শক্ত। এগুলি যে উত্তম তাপরোধক তার একমাত্র কারণ এদের মধ্যে অবরুদ্ধ বায়ুস্তরের অস্তিত্ব। কিন্তু যে বস্তু দিয়ে এগুলির ছিদ্রের দেয়াল কিংবা আঁশগুলি গড়া, সেগুলির তাপপরিবহণ ক্ষমতা খুব নগণ্য নাও হতে পারে।

ভালো ফারকোট তৈরী করার জন্য প্রচুর আঁশযুক্ত পুরু ফার ব্যবহার করা হয়। কিন্তু একটি গরম 'স্লিপিং ব্যাগ' তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় হাঁসের পালকের ওজন আধ কিলোগ্রামের চেয়েও কম হতে পারে। আধ কিলোগ্রাম ওজনের হাঁসের পালক দশ কিলোগ্রাম ওজনের পশমী কাপড়ের সমান বাতাস 'অবরুদ্ধ' রাখতে পারে।

ঝড়ো জানলা (storm window) এমনভাবে তৈরী করা হয় যাতে তাপ-পরিচলন না হতে পারে। ঘরের ভিতরকার বায়ুস্তরগুলির মিশ্রণ প্রক্রিয়ায় এই জানলার খড়খড়ি সাহায্য করে না।

যে কোনো রকম বায়ু চলাচলই মিশ্রণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে তাপসঞ্চালন বাড়িয়ে তোলে। এজন্যেই তাড়াতাড়ি গরম কাটাতে হলে আমরা পাখার বাতাস খাই কিংবা ভেণ্টিলেটারের পাল্লা খুলে দিই। একই কারণে বাতাস বইছে এমন জায়গায় বসে থাকলে ঠাণ্ডা বলে মনে হয়। কিন্তু যদি বায়ুর তাপমাত্রা দেহের তাপমাত্রার বেশী হয়, তাহলে ফল দাঁড়ায় বিপরীত, অর্থাৎ বায়ুস্রোতকে তখন উষ্ণ নিঃশ্বাসের মত মনে হয়।

বাষ্পীয় বয়লারের সমস্যা হল, কি করে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রায় উত্তপ্ত বাষ্পকে সম্ভাব্য দ্রুততম গতিতে উৎপন্ন করা যায়। অভিকর্ষজ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিচলন প্রক্রিয়া এই বিষয়ে মোটেই সন্তোষজনক নয়। তাই জল ও বাষ্প চলাচলে যথোপ-যুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে উষ্ণ ও শীতল স্তরের মিশ্রণকে ত্বরান্বিত করার প্রশ্ন, বাষ্পীয় বয়লার প্রস্তুত করার অন্যতম প্রধান সমস্যা।

৪. পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা

লৌহবাষ্প এবং কঠিন বায়ু (Iron vapour and solid air) :

অদ্ভুত শব্দ সমবায়, কি বলেন? তবু এগুলিকে অর্থহীন প্রলাপোক্তি বলে ভাববেন না। লৌহবাষ্প এবং তরল বায়ুর প্রকৃতিতে অস্তিত্ব আছে, অবশ্য সাধারণ পরিবেশে নয়।

পরিবেশগত কোন্ কোন্ বিষয়ের কথা আমরা বলতে চাইছি? পদার্থের অবস্থা পরিবেশগত দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল : তাপমাত্রা এবং চাপ। আমরা যে পরিবেশে বসবাস করি তার পরিবর্তনের মাত্রা খুবই সামান্য। বায়ুচাপ সাধারণতঃ এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপের শতকরা মাত্র কয়েকভাগ এদিক ওদিক করে ; তাপমাত্রা ধরুন মস্কোর কাছাকাছি $-30^{\circ}C$ থেকে $+30^{\circ}C$-এর মধ্যে থাকে, যা পরম তাপমাত্রার স্কেলে (যার নিম্নতম তাপমাত্রা $-273^{\circ}C$-এর সমান) 240 K—300 K, অর্থাৎ এক্ষেত্রেও গড় মানের $\pm$ 10%-এর মধ্যে!

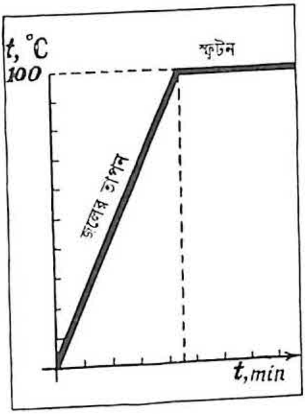
স্বাভাবিকভাবেই আমরা এই সাধারণ আবেষ্টনীতে এতই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে, যখন আমরা বলি লোহা কঠিন পদার্থ কিংবা বায়ু একটি গ্যাস, তখন আমরা এগুলি যে কেবলমাত্র প্রমাণ চাপ আর তাপমাত্রার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা উল্লেখ করতে ভুলে যাই।

লোহাকে উত্তপ্ত করলে, প্রথমে তা গলে যাবে আর তারপর বাষ্পে পরিণত হবে। বাতাসকে ঠাণ্ডা করলে, প্রথমে তা তরলীভূত এবং পরে কঠিনীভূত হবে।

পাঠকের লৌহবাষ্প বা কঠিন বায়ু সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলেও মনে হয় তিনি সহজেই একথা মেনে নেবেন যে, তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটিয়ে যে কোনো পদার্থকে কঠিন, তরল অথবা গ্যাসীয় অবস্থায় বা দশায় রূপান্তরিত করা যায়।

এই সত্য মেনে নেওয়া সহজ এজন্য যে, প্রত্যেকেই এমন এক পদার্থের সঙ্গে পরিচিত, যে পদার্থ ছাড়া পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব নয়, এবং তা কঠিন, তরল কিংবা গ্যাসীয় এই তিন অবস্থাতেই দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্যই আমরা যে পদার্থ সম্পর্কে কথা বলছি তার নাম জল।

কিন্তু কোন্ কোন্ শর্তের ওপর নির্ভর করে কোনো পদার্থ এক অবস্থা থেকে অন্য এক অবস্থায় রূপান্তরিত হয়?



চিত্র 4.1

স্ফুটন (Boiling) :

জল ভরা চায়ের কেটলিতে যদি কোনো থার্মোমিটারের মাথা ডুবিয়ে আমরা কেটলিটিকে ইলেকট্রিক স্টোভে বসিয়ে গরম করি এবং থার্মোমিটারের পারদস্তম্ভের দিকে লক্ষ্য রাখি, তাহলে আমরা নিম্নলিখিত ঘটনা ঘটতে দেখি : প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পারদস্তম্ভের উচ্চতা কয়েক ইঞ্চি বেড়ে যায়। এবার তার উচ্চতা 90°C ছাড়িয়ে 95°C এবং 95°C ছাড়িয়ে 100°C-এ উঠেছে। পারদস্তম্ভের উচ্চতা 100°C-এ পৌঁছবার পর জল ফুটতে আরম্ভ করলো কিন্তু পারদস্তম্ভের উচ্চতা আর বাড়ছে না। বেশ কয়েক মিনিট জল ফোটানোর পরেও দেখা যাবে যে, পারদস্তম্ভের উচ্চতায় আর কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। যতক্ষণ না সব জল ফুটে বেরিয়ে যাবে, ততক্ষণ তাপমাত্রায় কোনো পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যাবে না (চিত্র 4.1)।

কিন্তু তাপমাত্রার যখন পরিবর্তন ঘটছে না তখন গৃহীত তাপ যাচ্ছে কোথায় ? উত্তর সকলেরই জানা। জলের জলীয় বাষ্পে পরিবর্তন প্রক্রিয়ার জন্য উত্তাপের প্রয়োজন।

এবার এক গ্রাম জল এবং সেই জল থেকে পাওয়া বাষ্পের ভিতরকার শক্তি তুলনা করা যাক। বাষ্পের ভিতর অণুগুলি জলের ভিতরকার অণুগুলির তুলনায় আরো বেশী দূরে দূরে ছড়ানো। স্পষ্টতঃ এর ফলে জলের স্থিতিশক্তি বাষ্পের স্থিতিশক্তি থেকে আলাদা।

আকর্ষণশীল অণুগুলির স্থিতিশক্তি কাছাকাছি আসার সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়।

সুতরাং বাষ্পের শক্তি জলের তুলনায় বেশী এবং জলের জলীয় বাষ্পে রূপান্তরের জন্য শক্তি আবশ্যক। ইলেকট্রিক স্টোভ কেটলির মধ্যে ফুটন্ত জলকে এই শক্তি সরবরাহ করে।

জলকে জলীয় বাষ্পে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিকে 'বাষ্পীভবনের শক্তি' বলে। এক গ্রাম জলকে জলীয় বাষ্পে পরিণত করার জন্যে, 539 ক্যালোরি উত্তাপের প্রয়োজন হয় (এই মান 100°C-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)। যেহেতু 539 cal 1 gm জলের জন্যে প্রয়োজন হয়, তাই 1 mole জলের জন্য প্রয়োজন $18 \times 539 = 9700$ cal (প্রায়)। আন্তঃ আণবিক বন্ধন চূর্ণ করার জন্যে তাহলে নিশ্চয় উক্ত পরিমাণ উত্তাপ শোষিত হয়। এই উত্তাপের পরিমাণের সঙ্গে অণুর অভ্যন্তরীণ বন্ধন চূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্য তুলনা করা যাক। এক মোল জলীয় বাষ্পকে সংশ্লিষ্ট পরমাণুতে বিশ্লিষ্ট করার জন্যে প্রায় 220000 cal অর্থাৎ 25 গুণ শক্তির প্রয়োজন হয়। যে শক্তি অণুগুলিকে আবদ্ধ করে রাখে তার পরিমাণ সে অণুর ভিতরকার পরমাণুগুলির বন্ধন শক্তির তুলনায় অনেক কম, উপরোক্ত তথ্য সেই সত্যকেই প্রমাণ করে।

চাপের ওপর স্ফুটনাঙ্কের নির্ভরতা (Dependence of boiling point on pressure) ঃ

বলা হয় জলের স্ফুটনাঙ্ক 100°C ; কেউ হয়তো মনে করতে পারেন যে, এটি জলের এক বিশেষ ধর্ম এবং যে কোনো অবস্থায় এবং যে কোনো স্থানে জলকে ফোটানো হোক না কেন তার স্ফুটনাঙ্ক 100°C হবেই।

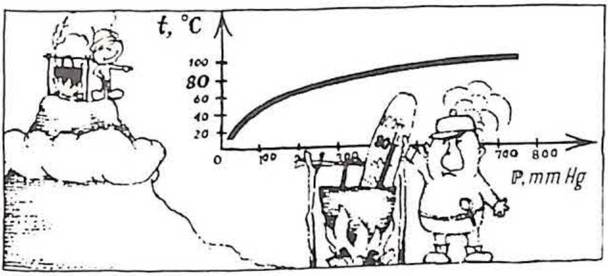
কিন্তু এই ধরনের অনুমান ঠিক নয় এবং উঁচু পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন।

এলব্রাস পর্বতশৃঙ্গের কাছে একটি পর্যটক আবাস এবং একটি বিজ্ঞান অনুসন্ধান কেন্দ্র আছে। অনভিজ্ঞরা অনেক সময় আশ্চর্য হয়, যখন তারা দেখে যে ফুটন্ত জলে ডিমসেদ্ধ করতে কষ্ট হচ্ছে কিংবা রান্না করে খাদ্যদ্রব্য নরম করা যাচ্ছে না। তখন তাদের কাছে ব্যাখ্যা করে বোঝানো হয় যে, এলব্রাস পর্বতশৃঙ্গে জল মাত্র 82°C তাপমাত্রাতেই ফুটতে আরম্ভ করে।

কিন্তু কেন এমন হয় ? কোন্ কোন্ ভৌত বিষয় স্ফুটনকে প্রভাবান্বিত করে ? সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতার কি কোনো প্রভাব আছে ?

যে ভৌত বিষয় স্ফুটনকে প্রভাবান্বিত করে, তা তরলের বহির্তলে প্রযুক্ত চাপ। এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণের জন্য পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ না করলেও চলে।

যদি উত্তপ্ত হচ্ছে এমন জলের ওপর একটি বেলজার চাপা দেওয়া হয় এবং



চিত্র 4·2

পাম্পের সাহায্যে তার মধ্যে বাতাস ঢোকানো হয় কিংবা তা থেকে বাতাস বের করে নেওয়া হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায় যে, চাপ বাড়ালে স্ফুটনাঙ্ক বাড়ে এবং চাপ কমালে স্ফুটনাঙ্ক কমে।

আসলে জল 100°C তাপমাত্রায় ফুটতে আরম্ভ করে কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট —760 mm Hg (বা 1 বায়ুমণ্ডলীয়) চাপে।

স্ফুটনাঙ্কের ওপর চাপের প্রভাবকে চিত্র 4·2-এর মধ্যে দেখানো হয়েছে। এলব্রাস পর্বতশৃঙ্গের ওপর চাপের পরিমাণ 0·5 বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমান এবং এই চাপের আনুষঙ্গিক স্ফুটনাঙ্ক 82°C।

আবার গরমকালে 10—15 mm Hg চাপে ফুটন্ত জলের সাহায্যে আরাম করাও চলে। এই চাপে জলের স্ফুটনাঙ্ক মাত্র 10—15°C।

এমনকি জলের হিমাঙ্কেও জল ফোটানো যায়। সেজন্যে দরকার চাপ কমিয়ে 4·6 mm Hg-এ পরিণত করা।

এক পাত্র জলের ওপর একটি বেলজার রেখে যদি তার ভিতরকার বাতাস পাম্প করে বের করে নেওয়া হয়, তাহলে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। জল ফুটতে আরম্ভ করে। কিন্তু স্ফুটনের জন্য তাপের প্রয়োজন। যেহেতু ফুটন্ত জলের সংস্পর্শে বাতাস নেই, তাই তাকে নিজের শক্তিই ব্যয় করতে হয়। ফুটন্ত জলের তাপমাত্রা কমতে থাকে এবং পাম্প করা অব্যাহত থাকে বলে চাপও কমে যায়। সুতরাং স্ফুটন থামে না, জল ক্রমশঃ শীতলতর হতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত হিমায়িত হয়।

শীতল জলের এই ধরনের স্ফুটন কেবলমাত্র পাম্পের সাহায্যে বায়ু অপসারণের ফলেই ঘটে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে, যখন জাহাজের স্ক্রু প্রপেলার

ঘোরে, ধাতবতলের গায়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন জলস্তরের চাপ অত্যন্ত কমে যায় এবং জলস্তর ফুটতে থাকে, অর্থাৎ এই স্তরে অনেক বাষ্প ভরা বুদবুদ উৎপন্ন হয়। একে বলে cavitation (ল্যাটিন cavus শব্দের অর্থ ফাঁপা)।

চাপ কমানো হলে স্ফুটনাঙ্ক কমে। আর যদি বাড়ানো হয়? প্রদত্ত লেখচিত্রের মধ্যে এর উত্তর মিলবে। 15 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ জলের স্ফুটনকে এতো বিলম্বিত করে যে ফোটানোর জন্য 200°C এবং 80 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ব্যবহৃত হলে 300°C তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়।

সুতরাং কোনো নির্দিষ্ট স্ফুটনাঙ্ক একটি বিশেষ চাপের ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট। কিন্তু একই কথাকে ঘুরিয়ে বলা যায় যে, "জলের বিভিন্ন স্ফুটনাঙ্কের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট মাত্রার চাপ।" এই চাপ 'বাষ্প চাপ' নামে পরিচিত।

লেখচিত্রটি স্ফুটনাঙ্কের ওপর চাপের প্রভাব সূচিত করার সঙ্গে সঙ্গে তাপ মাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে বাষ্পচাপের পরিবর্তনকেও সূচিত করে।

স্ফুটনাঙ্কের লেখচিত্রে (কিংবা বাষ্পচাপের লেখচিত্রে) অঙ্কিত বিন্দুগুলি থেকে বোঝা যায় যে, তাপমাত্রার সঙ্গে বাষ্পচাপ খুব বেশী মাত্রায় পরিবর্তিত হয়। 0°C তাপমাত্রায় (অর্থাৎ 273 K-তে) বাষ্পচাপ 4·6 mm Hg, 100°C (373 K)-এ 760 mm Hg অর্থাৎ বৃদ্ধির সূচক 165। তাপমাত্রা বৃদ্ধি 0°C (273 K) থেকে 273°C (546 K) অর্থাৎ আগের তুলনায় দ্বিগুণ হলে বাষ্প চাপ 4·6 mm Hg থেকে প্রায় 60 atm হয়, অর্থাৎ বৃদ্ধির সূচক 10,000।

কিন্তু চাপের সঙ্গে স্ফুটনাঙ্কের পরিবর্তন ঘটে অনেক ধীরগতিতে। যদি চাপকে 0·5 atm থেকে 1 atm-এ অর্থাৎ দ্বিগুণে পরিবর্তিত করা হয়, স্ফুটনাঙ্ক 82°C (355 K) থেকে বেড়ে হয় 100°C (373 K) এবং যদি চাপ 1 atm-এর জায়গায় 2 atm-এ তোলা হয়, স্ফুটনাঙ্ক 100°C (373 K)-এর জায়গায় হয় 120°C (393 K)।

আলোচ্য লেখচিত্রটি জলীয় বাষ্পের জলে ঘনীভবন প্রক্রিয়াকেও নিয়ন্ত্রণ করে। জলীয় বাষ্পকে শীতল করে জলে পরিণত করা যায়, চাপ প্রয়োগ করেও। ঘনীভবন প্রক্রিয়ায় ঠিক স্ফুটনের মতোই যতক্ষণ না সমস্ত বাষ্প জলে কিংবা সমস্ত জল বাষ্পে পরিণত হচ্ছে ততক্ষণ লেখচিত্রের মধ্যে তাপমাত্রার স্থানাঙ্ক অপরিবর্তিত থাকে। বিষয়টিকে নিম্নলিখিতভাবেও প্রকাশ করা যায়ঃ লেখচিত্রের শর্ত অনুযায়ী এবং শুধুমাত্র সেই শর্ত অনুযায়ীই তরল এবং বাষ্পীয় দশা এক সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে। অধিকন্তু যদি উত্তাপ গৃহীত বা বর্জিত না হতে পারে তাহলে কোনো বদ্ধপাত্রের মধ্যে তরল এবং তার বাষ্পের অনুপাত অপরিবর্তিত থাকে। তখন আমরা বলি সেই বাষ্প এবং তরল সাম্যাবস্থায়

রয়েছে এবং তরলের সঙ্গে সাম্যাবস্থায় থাকা বাষ্পটি সম্পৃক্ত। সুতরাং স্ফুটন এবং ঘনীভবন লেখচিত্রের আরও একটি অর্থ আছে—এই লেখচিত্র তরল ও গ্যাসের সাম্যাবস্থা সূচিত করে। এই সাম্যাবস্থাসূচক লেখচিত্র ছবির তলকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে। লেখটির বাঁদিকে ওপরের অংশটি (উচ্চতর তাপমাত্রা এবং নিম্নতর চাপের অঞ্চলটি) সুস্থিত বাষ্পের অঞ্চল। লেখ-এর ডানদিকে নীচের অংশটি সুস্থিত তরলের অঞ্চল।

বাষ্প তরল সাম্যাবস্থাসূচক লেখচিত্র, অর্থাৎ স্ফুটনাঙ্কের ওপর চাপের প্রভাবের কিংবা বাষ্পচাপের ওপর তাপমাত্রার প্রভাবের নির্দেশক লেখচিত্র প্রায় সব তরলের ক্ষেত্রেই সদৃশ। কতকগুলি ক্ষেত্রে অবশ্য পরিবর্তনের হার কিছু বেশী, আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে কিছু কম. কিন্তু সবক্ষেত্রেই তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে বাষ্পচাপ দ্রুতহারে বাড়তে থাকে।

আমরা এর আগে অনেকবার 'গ্যাস' আর 'বাষ্প' এই দুটি শব্দ ব্যবহার করেছি। এই দুটি শব্দ অনেকাংশে সমার্থক। যেমন বলা চলে জল গ্যাস মানে জলের বাষ্প কিংবা অক্সিজেন গ্যাস তরল অক্সিজেনের বাষ্প। তবে এই দুটি শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কতকগুলি নিয়ম মেনে চলা হয়। যেহেতু আমরা তাপমাত্রার অপেক্ষাকৃত অল্প প্রসারের সঙ্গে পরিচিত, তাই আমরা সাধারণতঃ গ্যাস বলতে বুঝি সেই সব পদার্থকে যাদের বাষ্পচাপ প্রমাণ তাপ-মাত্রায় বায়ুমণ্ডলীয় চাপের চেয়ে বেশী। আবার যখন ঘরের তাপমাত্রায় এবং বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোনো পদার্থের তরল অবস্থাকে বেশী সুস্থিত দেখি তখন আমরা বাষ্পের কথা বলি।

বাষ্পায়ন (Evaporation) ঃ

স্ফুটন ঘটে দ্রুতবেগে এবং অল্পসময় পরেই দেখা যায় যে, স্ফুটনশীল জলের কণামাত্রও অবশিষ্ট নেই—সবটাই জলীয় বাষ্পে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

কিন্তু স্ফুটন ছাড়া আরো একটি প্রক্রিয়া আছে, যার ফলে জল কিংবা অন্য কোনো তরল বাষ্পে পরিণত হয়। যাকে বলা হয় বাষ্পায়ন। বাষ্পায়ন যে কোনো তাপমাত্রাতেই ঘটে, চাপ (যা সাধারণ অবস্থায় 760mm Hg-এর কাছাকাছি) যাই হোক না কেন। বাষ্পায়ন ধীরগতি, স্ফুটনের মতো দ্রুতগতি নয়। অডিকলনের শিশির মুখ বন্ধ করতে ভুলে গেলে, কয়েকদিন পরেই দেখা যাবে যে সেটা খালি হয়ে গেছে ; একটা পিরিচে জল ঢেলে রেখে দিলে সেটা অবশ্য আরও বেশী সময় থাকবে। কিন্তু আজই হোক আর কালই হোক সমস্ত জলটাই শুকিয়ে যাবে।

বাষ্পায়ন প্রক্রিয়ায় বায়ুর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বায়ু নিজে থেকে জলের বাষ্পায়নে বাধা দেয় না। যখনি কোনো তরলের বহির্তল উন্মুক্ত করা

হয়, তরলের অণুগুলি নিকটতম বায়ুস্তরে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে। ফলে ঐ স্তরে বাষ্পের ঘনত্ব দ্রুত বেড়ে গিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা নির্ধারিত সম্পৃক্ত বাষ্পচাপের সমান হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া বাষ্পচাপের পরিমাণ, বাতাস না থাকলে যত হতো তার সমান থাকে।

অবশ্য বায়ুতে বাষ্প প্রবেশ করার অর্থ এই নয় যে চাপ বাড়বে। জলতলের উপরের বাতাসের মোট চাপ অপরিবর্তিত থাকে, শুধু মোট চাপের যে অংশের কারণ বাষ্পের উপস্থিতি, সেই অংশের পরিমাণ বাড়ে এবং যে অংশের কারণ বায়ু, তার পরিমাণ বাষ্পের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে সেই অনুপাতে কমে যায়।

জলের উপর থাকে বাষ্প আর বায়ুর মিশ্রণ ; আরও উপরে বাষ্পহীন বায়ু। এদের সংমিশ্রণ অনিবার্য। জলীয় বাষ্প নিরবচ্ছিন্নভাবে উচ্চতর স্তরে প্রবেশ করবে আর নীচের স্তরে তার জায়গা দখল করবে বাষ্পঅণুহীন বায়ু। তাই সর্বনিম্নস্তরের বায়ুতে সবসময়েই নতুন নতুন জলের অণু প্রবেশের সুযোগ পাবে। জলের বহির্তলের সংস্পর্শে থাকা স্তরের বাষ্পচাপকে নির্দিষ্ট রাখার জন্য জল নিরবচ্ছিন্নভাবে বাষ্পায়িত হতে থাকবে এবং যতক্ষণ না সব জলটুকু বাষ্পায়িত হচ্ছে, ততক্ষণ এই প্রক্রিয়া চলবে।

আমরা অডিকলন আর জলের উদাহরণ থেকে শুরু করেছিলাম। এ দুটি পদার্থের বাষ্পায়নের গতি যে বিভিন্ন, সেকথা সবাই জানেন। ইথার অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে অদৃশ্য হয়, অ্যালকোহলের বাষ্পায়নের গতিও বেশ দ্রুত, কিন্তু জলের ক্ষেত্রে তা অনেক ধীর। একটি পাঠ্যপুস্তক খুলে এইসব পদার্থের সাধারণ উষ্ণতায় প্রদত্ত বাষ্পচাপ তুলনা করলে, কেন যে এমন হয় তা সহজেই বোঝা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইথারের বাষ্পচাপ—437 mm, অ্যালকোহলের—44·5 mm আর জলের—17·5 mm।

বাষ্পচাপ যত বেশী হয়, তরল সংলগ্ন বায়ুস্তরে তত বেশী বাষ্প যেতে পারে আর তাই তরলের বাষ্পায়নের গতিও হয় তত বেশী। আমরা জানি যে, উষ্ণতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পচাপও বাড়ে। তাই উষ্ণতা বাড়ালে কেন যে বাষ্পায়নের বেগ বাড়ে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

অন্যান্য উপায়েও বাষ্পায়নের গতি প্রভাবিত করা যায়। বাষ্পায়ন দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করতে চাইলে তরল থেকে বাষ্প অপসারণের কাজ, অর্থাৎ বায়ুর সঙ্গে বাষ্প মিশ্রণের কাজ, দ্রুততর করার প্রয়োজন। প্রধানতঃ এই কারণেই, তরলের উপর দিয়ে বায়ু প্রবাহিত করলে বাষ্পায়নের বেগ খুব বেশী বেড়ে যায়। জলের বাষ্পচাপ তুলনামূলকভাবে কম হওয়া সত্ত্বেও জলভর্তি থালা বায়ুস্রোতে রাখলে বেশ তাড়াতাড়িই উবে যায়।

তাই পরিষ্কার বোঝা যায়, কেন জল থেকে উঠে খোলা বাতাসে দাঁড়ালে

সাঁতারুর শীত করে। বায়ুস্রোত বায়ুর সঙ্গে জলীয় বাষ্প মিশ্রণের গতি দ্রুততর করে, তাই বাষ্পায়নের গতিও যায় বেড়ে, আর সাঁতারুর শরীর এই বাষ্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ সরবরাহ করতে বাধ্য হয়।

বাতাসে কতখানি জলীয় বাষ্প আছে, তার ওপর মানুষের আরাম নির্ভর করে। খুব শুকনো আর খুব স্যাঁত্‌সেঁতে দুধরনের বাতাসই অস্বস্তিকর। আর্দ্রতা 60% হলে তাকেই প্রমাণ আর্দ্রতা হিসেবে গণ্য করা হয়। এর অর্থ, বাতাসে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ঘনত্ব সেই তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পের ঘনত্বের 60%।

আর্দ্র বায়ুকে শীতল করা হলে বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের চাপ এক সময়ে সেই তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপের সমান হয়ে দাঁড়ায়। উপস্থিত বাষ্প তখন বায়ুকে সম্পৃক্ত করে এবং তাপমাত্রা আরও কমালে তরল জলে ঘনীভূত হতে থাকে। ঘাসের ডগায় কিংবা পাতার আগায়, ভোরবেলা যে শিশিরবিন্দু জমে থাকতে দেখা যায়, তার উৎপত্তির কারণ প্রধানতঃ এই প্রক্রিয়া।

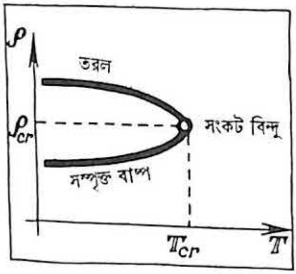
20°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের ঘনত্ব 0·00002 gm/cm³। যদি ঐ তাপমাত্রায় উপস্থিত জলীয় বাষ্পের পরিমাণ উপরোক্ত মানের 60%, অর্থাৎ একগ্রামের লক্ষভাগের একভাগ পরিমাণের সামান্য বেশী হয়, তাহলে আমরা বেশ আরাম অনুভব করি।

যদিও উপরোক্ত মান দৃশ্যাতঃ খুব সামান্য, তবু ঐ সামান্য মান সত্ত্বেও একটি সাধারণ ঘরে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের মোট পরিমাণ মোটেই নগণ্য নয়। সহজেই হিসেব করে বলা যায় যে, একটি 12 m² ক্ষেত্রফল এবং 3 m উচ্চতা বিশিষ্ট সাধারণ মাপের ঘরের মধ্যে, সম্পৃক্ত বাষ্পের রূপে, প্রায় এক কিলোগ্রাম জল উপস্থিত থাকতে পারে।

সুতরাং যদি কোনো ঘরে আবদ্ধ শুষ্ক বায়ুর মধ্যে এক বালতি জল রাখা হয়, তাহলে বালতির আয়তন যাই হোক না কেন, তার ভেতর থেকে প্রায় এক লিটার জল বাষ্পীভূত হবে।

একই ধরনের পরীক্ষা জলের বদলে পারদ নিয়ে করলে যে ফলাফল হবে তার সঙ্গে জলের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ফলকে তুলনা করা যাক। একই তাপমাত্রায়, অর্থাৎ 20°C-এ সম্পৃক্ত পারদ বাষ্পের ঘনত্ব 10^{-8} g/cm³। সুতরাং পূর্বোক্ত সাধারণ মাপের ঘরের মধ্যে কমপক্ষে এক গ্রামের মত পারদ বাষ্পীভূত হবে।

আমরা জানি পারদবাষ্প খুব বিষাক্ত এবং ঐ বাষ্পের এক গ্রাম যে কোনো লোকের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। তাই পারদ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সময় যাতে একবিন্দু পারদও ছিট্‌কে বাইরে না পড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত।



চিত্র 4·3

সংকট তাপমাত্রা (Critical Temperature) ঃ

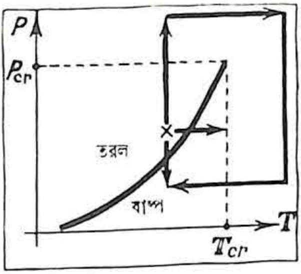
কিভাবে গ্যাসকে তরলে পরিণত করা যায় ? স্ফুটনাঙ্ক-লেখচিত্র থেকে এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। তাপমাত্রা কমালে কিংবা চাপ বাড়ালে গ্যাস তরলে পরিণত হয়।

উনবিংশ শতকে তাপমাত্রা কমানোর থেকে চাপ বাড়ানোর কাজকে বেশী সহজ বলে মনে করা হতো। এই শতকের গোড়ার দিকে প্রতিভাবান ইংরাজ পদার্থবিদ মাইকেল ফ্যারাডে (1791—1867) বিভিন্ন গ্যাসকে তাদের বাষ্পচাপের মানে সংকুচিত করতে সফল হন এবং এইভাবে অনেক গ্যাসকে (ক্লোরিন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি) তরলে পরিণত করেন।

কিন্তু হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি কতকগুলি গ্যাসকে এইভাবে তরলে পরিণত করা যায় না। তাদের চাপকে যত ইচ্ছে বাড়ানো যাক না কেন, কিছুতেই তারা তরলে পরিণত হয় না। কেউ কেউ হয়তো ভেবেছিলেন যে, অক্সিজেন ইত্যাদি কয়েকটি গ্যাসকে আদৌ তরলে পরিণত করা যাবে না। তাই তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল সত্যকার বা ধ্রুব গ্যাস।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এদের তরলীকরণে অসাফল্যের কারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব।

ধরুন একটি তরল পদার্থ তার বাষ্পের সঙ্গে সাম্যাবস্থায় রয়েছে। এবার ভাববার চেষ্টা করুন, স্ফুটনাঙ্ক এবং সংশ্লিষ্ট চাপ বাড়ানো হলে কি হবে। অর্থাৎ কল্পনা করুন. স্ফুটনাঙ্ক লেখচিত্রে একটি বিন্দু লেখরেখা বরাবর উপরের দিকে উঠছে। স্পষ্টতঃ তাপমাত্রা বাড়লে তরলের আয়তন বাড়বে আর ঘনত্ব কমবে। কিন্তু বাষ্পের ক্ষেত্রে যদিও স্ফুটনাঙ্ক বাড়ার ফলে বাষ্পের আয়তন বাড়বে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকবে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ এবং আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ বৃদ্ধির হার স্ফুটনাঙ্ক বৃদ্ধির হারের তুলনায়



চিত্র 4.4

অনেক বেশী। সেজন্য স্ফুটনাঙ্ক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পের ঘনত্ব কমার বদলে দ্রুতহারে বাড়তে থাকে।

যেহেতু স্ফুটনাঙ্ক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তরলের ঘনত্ব কমে কিন্তু বাষ্পের ঘনত্ব বাড়ে, তাই স্ফুটনাঙ্ক লেখ বরাবর উপরের দিকে উঠতে থাকলে শেষ পর্যন্ত এমন একটি বিন্দু আসবে যখন তরল আর বাষ্প দুয়েরই ঘনত্ব সমান হয়ে দাঁড়াবে।

সংকট বিন্দু নামে পরিচিত এই গুরুত্বপূর্ণ বিন্দুতে এসে স্ফুটনাঙ্ক লেখচিত্র শেষ হয়ে যায়। যেহেতু বাষ্প আর তরলের তারতম্য তাদের ঘনত্বের তারতম্যের উপর নির্ভরশীল, তাই সংকট বিন্দুতে বাষ্প আর তরলের সব ধরনের ধর্ম এক হয়ে যায়। প্রত্যেক পদার্থেরই নিজস্ব সংকট তাপমাত্রা আর সংকট চাপ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ জলের সংকট তাপমাত্রা 374°C এবং সংকট চাপ 218·5 atm।

সংকট তাপমাত্রার নীচে কোনো গ্যাসকে চাপপ্রয়োগে সংকুচিত করলে প্রক্রিয়াটিকে তীরচিহ্নের সাহায্যে স্ফুটনাঙ্ক লেখচিত্রে উপস্থিত করা যায় (চিত্র 4·4)। এর অর্থ, গ্যাসের চাপ যে মুহূর্তে বাষ্পচাপের সমান হয়ে ওঠে (তীরচিহ্নের সঙ্গে স্ফুটনাঙ্ক লেখচিত্রের ছেদবিন্দু), সেই মুহূর্ত থেকে গ্যাসটি তরলে রূপান্তরিত হতে থাকে। যদি পরীক্ষাধীন পাত্রটি স্বচ্ছ হয়, তাহলে আমরা দেখতে পাবো সেই মুহূর্তে পাত্রের তলায় জমে উঠেছে তরলের এক পাতলা আস্তরণ। যদি চাপ অপরিবর্তিত রাখা হয়, তাহলে তরলের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে, যতক্ষণ না সমস্ত গ্যাস তরলে পরিণত হচ্ছে। আরও বেশী সংকুচিত করতে হলে দরকার হবে চাপ আরও বাড়ানোর।

কিন্তু কোনো গ্যাসকে সংকুচিত করার সময়ে তার তাপমাত্রা সংকট তাপমাত্রার উপরে হলে, সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থার উদ্ভব হয়। এক্ষেত্রেও অবশ্য সংকোচন প্রক্রিয়াকে একটি ঊর্ধ্বগামী তীরচিহ্নের সাহায্যে উপস্থিত করা যাবে। কিন্তু তীরচিহ্নটি স্ফুটনাঙ্কলেখকে আর ছেদ করবে না। সুতরাং সংকোচনের ফলে বাষ্প আর তরলে পরিণত হবে না, শুধু ক্রমাগত তার ঘনত্ব বাড়তে থাকবে।

সংকট তাপমাত্রার উপরে গ্যাস-তরল আন্তর্তলের উপস্থিতি অসম্ভব। সঙ্কোচনের সাহায্যে খুব বেশী ঘনত্ব বাড়ালেও, পিস্টনের তলায় সবসময়ে একটি-মাত্র সমসত্ত্ব পদার্থই দেখতে পাওয়া যাবে, যাকে কখন লোকে তরল বলবে আর কখন গ্যাস, তা অনুমান করা শক্ত।

সংকট বিন্দুর অস্তিত্ব থেকে প্রমাণিত হয় যে, তরল আর গ্যাসের মধ্যে নীতি-গতভাবে কোনো তফাত নেই। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, এই নীতিগত-ভাবে কোনো তফাৎ নেই কথাটা আমরা কেবল তখনি বলতে পারি যখন তাপমাত্রা সংকট তাপমাত্রার উপরে থাকে। কিন্তু তা ঠিক নয়। সংকট বিন্দুর অস্তিত্ব একটি তরলকে, গেলাসে ঢালা যায় এমন সত্যিকার তরলকে, স্ফুটন ছাড়াই গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত করার সম্ভাবনাকেও সূচিত করে।

এই ধরনের রূপান্তরের পথকে চিত্র 4.4-এর মধ্যে দেখানো হয়েছে। একটি সন্দেহাতীত তরলকে চিহ্নিত করা হয়েছে কাটা দাগ দিয়ে। যদি চাপ কিছু পরিমাণ কমানো হয় (নিম্নমুখী তীরচিহ্ন), তাহলে তরলটি ফুটতে শুরু করবে। তাপমাত্রা কিছু বাড়ালেও (দক্ষিণমুখী তীরচিহ্ন) তরলটি ফুটবে। কিন্তু একটু অন্যভাবেও এই রূপান্তর করা যায়। প্রথমে তরলটিকে এমনভাবে সংকুচিত করা হল যাতে তার চাপ সংকট চাপমাত্রাকে অতিক্রম করে। তরলটির অবস্থা তখন উল্লম্ব সরলরেখা বরাবর উপরে উঠবে। এরপর তরলটিকে উত্তপ্ত করা হল—প্রক্রিয়াটি একটি আনুভূমিক রেখা দ্বারা সূচিত হবে। এবার সংকট তাপমাত্রার ডানদিকে আসার পর চাপের পরিমাণ কমিয়ে প্রারম্ভিক মানে নিয়ে আসা হল। শেষ প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা কমিয়ে ফেললে আমরা একটি সত্যিকার বাষ্প পাবো, যা অন্যভাবে, সহজতর আর সরলতর পথেও পাওয়া যায়।

সুতরাং সংকটবিন্দুর পাশ কাটিয়ে, চাপ আর তাপমাত্রাকে পরিবর্তিত করে, সবসময়েই তরলকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বাষ্পে এবং বাষ্পকে তরলে পরিণত করা সম্ভব। এই ধরনের রূপান্তরে স্ফুটন বা ঘনীভবন হয় না।

আগের যুগে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি গ্যাসকে তরলে পরিণত করা সম্ভব হয়নি; কেননা তখন সংকট তাপমাত্রা সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা ছিল না। এই সব গ্যাসের সংকট তাপমাত্রার মান খুব নীচু ঃ যেমন অক্সিজেনের —119°C, নাইট্রোজেনের —147°C এবং হাইড্রোজেনের —240°C বা 33 K। অবশ্য এক্ষেত্রে রেকর্ড করেছে হিলিয়ম, যার সংকট তাপমাত্রা মাত্র 4·3 K। এই সব গ্যাসকে তরলে রূপান্তরিত করার একমাত্র একটি পথই খোলা রয়েছে ঃ গ্যাসগুলিকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সংকট তাপমাত্রার নীচে ঠাণ্ডা করতে হবে।

নিম্ন তাপমাত্রার সৃষ্টি (Obtaining Low Temperatures) ঃ

নানা উপায়ে নিম্নতাপমাত্রা সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই মূলনীতি থাকে অভিন্ন ঃ যাকে শীতল করা হচ্ছে, তাকে বাধ্য করা হয় অভ্যন্তরীণ শক্তি ব্যয় করতে।

কিন্তু কিভাবে তা করা যায়? একটি উপায় হল বাইরের উত্তাপ শোষণ করার সুযোগ না দিয়ে তরলকে বাষ্পীভূত করা। আমরা জানি এজন্য দরকার চাপ কমানো—চাপ কমিয়ে বাষ্পচাপের সমান করা। তখন স্ফুটনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ তরল থেকেই গৃহীত হবে আর তার ফলে তরল আর বাষ্পের তাপমাত্রা কমবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পচাপও। তাই স্ফুটন অব্যাহত রাখার জন্যে প্রয়োজন পাম্পের সাহায্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে পাত্রের বায়ু আর বাষ্পকে বার করে দেওয়া। অবশ্য এই প্রক্রিয়ায় নিম্নতাপমাত্রা সৃষ্টির একটি সীমা আছে ঃ বাষ্পচাপ কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত এত কম হয়ে দাঁড়ায় যে সবচেয়ে শক্তিশালী পাম্প দিয়েও শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না।

নিম্নতাপমাত্রা সৃষ্টির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য তাই একটি গ্যাসকে উপরোক্ত উপায়ে প্রাপ্ত তরলের সাহায্যে শীতল করে, নিম্নতর স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট তরলে রূপান্তরিত করা হয়। এবার এই দ্বিতীয় তরল নিয়ে পাম্পের সাহায্যে পূর্বোক্ত উপায়ে আরও নিম্ন তাপমাত্রা সৃষ্টি করা যায়। প্রয়োজন হলে এই পদ্ধতিকে আরও সম্প্রসারিত করাও চলে।

গত শতাব্দীর শেষাংশে প্রধানতঃ এই উপায়েই নিম্নতাপমাত্রা সৃষ্টির সমস্যা সমাধান করা হত। ধাপে ধাপে তরলীভূত করা হত বিভিন্ন গ্যাস ঃ ইথিলিন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন ; যাদের স্ফুটনাঙ্ক যথাক্রমে —103°C, —183°C, —196°C এবং —253°C। তরল হাইড্রোজেন পাওয়ার পর সম্ভব হল নিম্নতম স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট তরল পদার্থ—তরল হিলিয়ম (—269°C) প্রস্তুতি। 'বামদিকের' প্রতিবেশী সাহায্য করল 'দক্ষিণদিকের' প্রতিবেশীর প্রস্তুতির কাজ।

ধাপে ধাপে তরলীভবনের পদ্ধতি প্রায় একশো বছরের পুরানো। 1877 খৃস্টাব্দে এই পদ্ধতিতে তরল বায়ু প্রস্তুত করা হয়েছিল। তরল হাইড্রোজেন প্রথম প্রস্তুত করা হয় 1884—85 খৃস্টাব্দে। পরিশেষে কুড়ি বছর পরে শেষ শক্ত ঘাঁটি—হিলিয়মও—অধিকৃত হল। নিম্নতম সংকট তাপমাত্রা বিশিষ্ট হিলিয়মকে তরলীভূত করলেন হাইকে কামেরলিং ওনেস (1853—1926) হল্যাণ্ডের লাইডেন শহরে 1908 খৃস্টাব্দে। এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের 70তম বার্ষিকী সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহলে পালিত হয়েছে।

বহু বৎসর যাবৎ লাইডেন ল্যাবরেটরিই পৃথিবীর একমাত্র 'নিম্ন তাপমাত্রার'

ল্যাবরেটরি ছিল। কিন্তু বর্তমানে অনেক দেশেই এই ধরনের কয়েক ডজন ল্যাবরেটরি আছে ; তরল বায়ু, তরল নাইট্রোজেন বা তরল অক্সিজেন উৎপাদনের কারখানার কথা না হয় বাদ দেওয়াই গেল।

ধাপে ধাপে নিম্নতাপমাত্রা সৃষ্টির পদ্ধতি বর্তমানে খুব কমই ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে নিম্নতাপমাত্রা সৃষ্টির প্রযুক্তিবিজ্ঞানে গ্যাসের অভ্যন্তরীণ শক্তি হ্রাস করার জন্য ব্যবহৃত হয় অন্য এক উপায়ঃ গ্যাসকে দ্রুত সম্প্রসারণে বাধ্য করে অভ্যন্তরীণ শক্তির বিনিময়ে কার্য সম্পাদন করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, যদি বায়ুকে কয়েকগুণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে সংকুচিত করে একটি সম্প্রসারকের মধ্যে চালনা করা হয় এবং বাধ্য করা হয় কোনো টারবাইন ঘোরাতে কিংবা পিস্টন নড়াতে, তাহলে তা হঠাৎ এতো ঠাণ্ডা হয়ে যায় যে তরলীভবন ঘটে। যদি একটা সিলিণ্ডার থেকে খুব দ্রুতবেগে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বেরোতে থাকে, তাহলে তা হঠাৎ এতো ঠাণ্ডা হয়ে যায় যে জমে 'বরফে' পরিণত হয়।

প্রযুক্তিবিজ্ঞানে তরলীকৃত গ্যাস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তরল অক্সিজেনকে বিস্ফোরক নির্মাণে এবং জেট ইঞ্জিনের জ্বালানি মিশ্রণের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

বায়ুতে উপস্থিত বিভিন্ন গ্যাসকে পৃথক করার জন্য বায়ুর তরলীকরণ প্রণালী প্রযুক্তিবিজ্ঞানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রযুক্তিবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তরল বায়ুর নিম্নতাপমাত্রার সুযোগ গ্রহণ করা হয়। তবু পদার্থবিজ্ঞানের কিছু কিছু পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই তাপমাত্রাও যথেষ্ট কম নয়। বস্তুতঃ তাপমাত্রার সেণ্টিগ্রেড স্কেলকে কেলভিন স্কেলে পরিণত করার পর তুলনা করলে দেখা যায় যে, তরল বায়ুর তাপমাত্রা ঘরের তাপমাত্রার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। পদার্থবিজ্ঞানে আরও বেশী কৌতূহলোদ্দীপক 'হাইড্রোজেন' তাপমাত্রা, অর্থাৎ 14 K—20 K মানের তাপমাত্রা এবং বিশেষ করে 'হিলিয়ম' তাপমাত্রা। তরল হিলিয়ম পাম্পের সাহায্যে বাষ্পীভূত করে সর্বনিম্ন 0·7 K তাপমাত্রা পাওয়া যায়।

আধুনিক পদার্থবিদ্‌রা পরম শূন্য তাপমাত্রার খুব কাছাকাছি আসতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমানে এমন নিম্নতাপমাত্রা সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে যার মান পরম শূন্য তাপমাত্রার থেকে মাত্র এক ডিগ্রীর এক-সহস্রাংশ বেশী। অবশ্য এতো নিম্নতাপমাত্রা পূর্বোক্ত পদ্ধতিগুলির সাহায্যে সৃষ্টি করা যায় না।

নিম্নতাপমাত্রার পদার্থবিজ্ঞান বা ক্রায়োজেনিকস্ (cryogenics) গত কয়েক বছরের মধ্যে শিল্পোৎপাদনের নতুন শাখার ভিত্তি রচনা করেছে। এই শাখা

পরম শূন্যের নিকটবর্তী তাপমাত্রায় ব্যবহারের উপযোগী পরীক্ষাপাত্র, যন্ত্রপাতি এবং দীর্ঘপরিবাহী উৎপাদনের কাজে লিপ্ত।

অতিশীতল বাষ্প এবং অতিতপ্ত তরল (Supercooled Vapours and Superheated Liquids) ঃ

স্ফুটনাঙ্কের নীচে তাপমাত্রা নিয়ে আসলে বাষ্পের ঘনীভূত হয়ে তরলে পরিণত হওয়া উচিত। কিন্তু দেখা গেছে যে, বাষ্প যদি খুব বিশুদ্ধ হয় আর তরলের সংস্পর্শে না আসতে পারে, তাহলে তাকে অতিশীতল অথবা অতিসম্পৃক্ত বাষ্পে পরিণত করা যায়—অর্থাৎ এমন এক বাষ্পে যার বহু পূর্বেই তরলে পরিণত হওয়া উচিত ছিল।

অতিসম্পৃক্ত বাষ্প খুবই অস্থিত। অনেক সময় বাষ্পপূর্ণ পাত্রটি ঝাঁকালে কিংবা পাত্রের মধ্যে অল্প কিছু দানা ছড়িয়ে দিলে, বিলম্বিত ঘনীভবন প্রক্রিয়াটি সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায়।

অভিজ্ঞতার ফলে আমরা জেনেছি যে, বাইরে থেকে অল্প পরিমাণ কণিকাকার পদার্থ যোগ করলে জলীয় বাষ্পের ঘনীভবন প্রক্রিয়া অনেক বেশী সহজে হয়। ধুলোভরা বাতাসে জলীয় বাষ্পের অতিসম্পৃক্ততা ঘটতে পারে না। ধোঁয়ার মধ্যে সূক্ষ্ম কঠিন কণিকা থাকে বলে, ধোঁয়ার পুঞ্জ ঘনীভবন ঘটায়। জলীয় বাষ্পের মধ্যে কিছু কণিকা প্রবেশ করলে, সেগুলির চারপাশে বাষ্পের অণু জড়ো হয় এবং তারা তখন ঘনীভবনের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, তরল 'জীবনের' উপযুক্ত তাপমাত্রাতে বাষ্প অস্থিত হওয়া সত্ত্বেও টিঁকে থাকতে পারে।

কিন্তু বাষ্পের অঞ্চলে কি অনুরূপভাবে তরল 'বেঁচে' থাকতে পারে ? অর্থাৎ তরলকে কি অতিতপ্ত অবস্থায় আনা যায় ?

দেখা গেছে যে, আনা যায়। এজন্য দরকার, তরল অণুর বহির্তল থেকে বিচ্যুত হওয়ার প্রবণতাকে বাধা দেওয়া। এই প্রচেষ্টা চালানোর একটি মৌলিক পদ্ধতি, তরলকে বহির্তল থেকে বঞ্চিত করা, অর্থাৎ তরলকে এমন এক পাত্রে রাখা, যার মধ্যে তরলটি সবদিক থেকে কঠিন দেয়াল দ্বারা সংকুচিত হবে। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন তরল পদার্থকে বেশ কয়েক ডিগ্রী অতিতাপিত করা যায়, অর্থাৎ স্ফুটনাঙ্ক লেখচিত্রে তরল অবস্থা জ্ঞাপক কোনো বিন্দুকে স্থানচ্যুত করে ডানদিকে নিয়ে আসা যায় (চিত্র 4.4)।

অতিতাপনের অর্থ, তরলকে স্থানচ্যুত করে বাষ্পের অঞ্চলে নিয়ে আসা। তাই উত্তাপ সরবরাহ করা ছাড়াও চাপ হ্রাস করা মারফত অতিতাপন সম্পন্ন করা যায়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ব্যবহার করে আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া যায়। জল বা অন্য কোনো তরল পদার্থকে, কষ্টসাধ্য উপায়ে দ্রবীভূত গ্যাস, বিমুক্ত করে একটি পাত্রের মধ্যে নেওয়া হয়, যেখানে তার বহির্তল স্পর্শ করে থাকে একটি পিস্টন। পাত্র এবং পিস্টনটি যেন তরলে সিক্ত থাকে। এবার যদি আমরা পিস্টনটিকে নিজেদের দিকে টানি তাহলে পিস্টনসংলগ্ন জলও তার সঙ্গে এগিয়ে আসবে। কিন্তু পিস্টনসংলগ্ন জলের স্তর টেনে আনবে তার পরবর্তী স্তরকে এবং সেই স্তর তারও পরবর্তী স্তরকে। ফলে তরলটি সম্প্রসারিত হবে।

অবশ্য জলের স্তম্ভটি শেষপর্যন্ত ভেঙ্গে পড়বে (লক্ষণীয়ভাবে জলের স্তম্ভের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা যাবে, কিন্তু পিস্টনসংলগ্ন জলের স্তর পিস্টন থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না), কিন্তু যতক্ষণ না একক ক্ষেত্রফলের ওপর ক্রিয়াশীল বল কয়েক দশক বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমান হচ্ছে, ততক্ষণ এই ভাঙ্গন দেখা যাবে না। অর্থাৎ অন্যভাবে বলা চলে যে, তরলের মধ্যে কয়েক দশক বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমপরিমাণ ঋণাত্মক চাপ সৃষ্ট হবে।

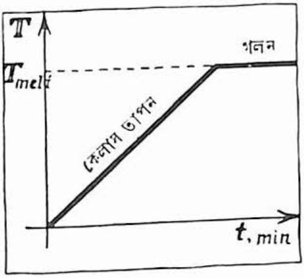
অল্প পরিমাণ ধনাত্মক চাপের মধ্যেও বাষ্প অবস্থা টিঁকে থাকতে পারে। আবার তরলের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে ঋণাত্মক চাপ। অতিতাপনের এর চেয়ে উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্তের কথা চিন্তা করা যায় না।

গলন (Melting) ঃ

এমন কোনো কঠিন বস্তু নেই যা তাপমাত্রার ক্রমাগত বৃদ্ধি সহ্য করতে পারে। আগেই হোক আর পরেই হোক কঠিন বস্তুটি তরলে পরিণত হয় ; অবশ্য এ কথাও ঠিক যে কয়েকটি ক্ষেত্রে আমরা গলনাঙ্কে পেঁছতে পারি না—বস্তুটি রাসায়নিকভাবে বিশ্লিষ্ট হয়।

তাপমাত্রা যত বাড়তে থাকে, অণুগুলির গতিও তত বাড়ে। শেষপর্যন্ত এমন এক মুহূর্ত আসে যখন তীব্রভাবে স্পন্দনশীল অণুগুলির মধ্যে কোনরকম সুশৃঙ্খল বিন্যাস বজায় রাখা সম্ভব হয় না। বস্তুটি গলে যায়। টাংস্টেনের গলনাঙ্ক সবচেয়ে বেশী ঃ 3380°C। লোহা গলে 1539°C-এ, সোনা 1063°C-এ। অবশ্য সহজেই গলে যায় এমন ধাতুও আছে। পারদ যে —39°C-এ গলে যায়, একথা তো সবাই জানেন। জৈব পদার্থের গলনাঙ্ক বেশী হয় না। ন্যাফ্থালিনের গলনাঙ্ক 40°C, টলুইনের —94·5°C।

কোনো বস্তুর গলনাঙ্ক নির্ণয় করা মোটেই শক্ত নয়, বিশেষতঃ যদি তা সাধারণ থার্মোমিটার দিয়ে মাপা যায় এমন তাপমাত্রার সীমানার মধ্যে থাকে। গলনাঙ্ক নির্ণয়ের সময় গলন্ত বস্তুর দিকে তাকিয়ে থাকার দরকার হয় না। থার্মোমিটারের পারদস্তম্ভের দিকে নজর রাখাই যথেষ্ট। যতক্ষণ না গলন শুরু



চিত্র 4.5

হয় ততক্ষণই বস্তুটির তাপমাত্রা বাড়ে (চিত্র 4.5)। যে মুহূর্তে গলন শুরু হয়, সেই মুহূর্ত থেকে তাপমাত্রা বাড়াও বন্ধ হয় এবং যতক্ষণ না গলন সম্পূর্ণ হচ্ছে ততক্ষণ তাপমাত্রা একই জায়গায় স্থির হয়ে থাকে।

তরলকে বাষ্পে রূপান্তরিত করতে যেমন উত্তাপের প্রয়োজন হয়, তেমনি কঠিনকে তরলে পরিণত করতেও দরকার হয় উত্তাপের। এই উত্তাপের পরিমাণকে বলে **গলনের লীন তাপ**। উদাহরণস্বরূপ, এক কিলোগ্রাম বরফকে গলানোর জন্য প্রয়োজন হয় 80 kcal উত্তাপের।

যে সব বস্তুর গলনের লীন তাপ বেশী, তাদের মধ্যে বরফ অন্যতম। যেমন, বরফ গলানোর জন্য প্রয়োজনীয় উত্তাপ সমান ভরের সীসা গলানোর জন্য প্রয়োজনীয় উত্তাপের দশগুণেরও বেশী। অবশ্য এখানে আমরা শুধু গলানোর জন্য প্রয়োজনীয় উত্তাপের কথাই বিবেচনা করছি, সীসাকে গলানোর আগে তাকে তার গলনাঙ্ক $+327°C$-এ উত্তপ্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় উত্তাপের কথা ধরছি না। বরফের গলনের লীন তাপ বেশী বলেই তুষার গলতে বেশী সময় লাগে। ঐ লীন তাপ যদি এক-দশমাংশ হতো, তাহলে প্রতি বসন্তে সমস্ত জমা তুষার একসঙ্গে গলে শীতপ্রধান দেশগুলিতে যে ভীষণ বিপর্যয় ঘটাতো, তা সহজেই অনুমেয়।

বরফ গলনের লীন তাপের মান বেশ উঁচু। কিন্তু এই মানকেও কম মনে হবে, যদি আমরা এর সঙ্গে তুলনা করি বাষ্পীভবনের লীন তাপ 540 kcal /kg (যার তুলনায় ঐ মান প্রায় এক-সপ্তমাংশ)। এই প্রভেদ কিন্তু স্বাভাবিক। তরলকে বাষ্পে পরিণত করতে হলে দরকার হয় অণুগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে পরস্পর থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার, কিন্তু কঠিনকে তরলীভূত করার জন্যে অণুগুলির পারস্পরিক দূরত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে তাদের বিন্যাসের শৃঙ্খলা নষ্ট করে দেওয়াই যথেষ্ট। স্পষ্টতঃ শেষোক্ত ক্ষেত্রে সম্পাদিত কার্যের পরিমাণ স্বল্পতর।

নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক থাকা কেলাসিত পদার্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম। মূলতঃ

এই ধর্মের নিরিখেই এদের অনিয়তাকার বা কাচজাতীয় পদার্থ থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়। জৈব এবং অজৈব দুই শ্রেণীর যৌগের মধ্যেই কাচজাতীয় পদার্থ দেখতে পাওয়া যায়। জানলার কাচ সাধারণতঃ তৈরী করা হয় সোডিয়ম আর ক্যালসিয়ম সিলিকেট দিয়ে; এক ধরনের জৈব কাচ (একে পেক্সি-কাচও বলা হয়) অনেক সময় ডেস্ক ঢাকা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়।

কেলাসের মতন অনিয়তাকার পদার্থের নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক থাকে না। কাচ নরম হয়, কিন্তু গলে না। উত্তাপ দিলে এক টুকরো শক্ত কাচ নরম হয়ে যায় আর তখন তাকে সহজেই বেঁকানো বা টেনে লম্বা করা যায়। উচ্চতর তাপমাত্রায় কাচ নিজের ওজনের প্রভাবে আকার পরিবর্তন করে। আরও বেশী উত্তপ্ত করলে ঘন সান্দ্র কাচ যে পাত্রে তাকে রাখা হয়েছে তার আকার ধারণ করে। তার অবয়ব প্রথমে গাঢ় মধুর মতো, তারপর টকে যাওয়া সরের মতো এবং শেষকালে আরও কম সান্দ্র তরলের, যেমন জলের, মতো হয়ে যায়। ঠিক কোন তাপমাত্রায় যে কঠিনটি তরলে পরিণত হল তা চিহ্নিত করা শ্রেষ্ঠ পর্যবেক্ষকের পক্ষেও সম্ভব হয় না। এবং কারণ কাচ আর কেলাসিত পদার্থের গঠনের মৌলিক পার্থক্য। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনিয়তাকার পদার্থের মধ্যে কণিকাগুলি বিশৃঙ্খল অবস্থায় বিন্যস্ত থাকে। কাচের গঠন তরলের মত। শক্ত কাচের মধ্যে অণুগুলির বিন্যাস বিশৃঙ্খল। তাই কাচের তাপমাত্রা বাড়ানোর মানে শুধুমাত্র এর ভিতরকার অণুগুলির স্পন্দনের বিস্তৃতি বাড়িয়ে তাদের আন্দোলিত হওয়ার স্বাধীনতা ক্রমশঃ বাড়িয়ে তোলা। এইজন্যই কাচ ধীরে ধীরে নরম হয় এবং অণুগুলির সুশৃঙ্খল বিন্যাস থেকে বিশৃঙ্খল বিন্যাসে পরিবর্তন সূচিত করে কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় হঠাৎ রূপান্তর দেখতে পাওয়া যায় না।

স্ফুটনাঙ্ক লেখচিত্র নিয়ে আলোচনা করার সময়ে আমরা বলেছিলাম যে, তরল এবং বাষ্প একে অন্যের জায়গায়ও থাকতে পারে, অবশ্য অস্থিত অবস্থায়—বাষ্পকে অতিশীতল করে স্ফুটনাঙ্ক লেখ-এর বাঁদিকে এবং তরলকে অতিতপ্ত করে স্ফুটনাঙ্ক লেখ-এর ডানদিকে নিয়ে আসা যায়।

কেলাস এবং তরল সম্পর্কেও কি একই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে? দেখা গিয়েছে যে, এক্ষেত্রে তুলনাটি অসম্পূর্ণ।

কোনো কেলাসকে গরম করলে, সেটি তার গলনাঙ্কে তরলে পরিণত হতে আরম্ভ করে। কেলাসকে অতিতপ্ত করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু তরলকে ঠাণ্ডা করার সময়ে যদি আমরা চাই তাহলে সহজেই গলনাঙ্ককে অতিক্রম করে যেতে পারি। অনেক তরলকেই আমরা বেশ খানিকটা অতিশীতল করতে পেরেছি। এমনকি এমন কতকগুলি তরলও আছে যাদের অতিশীতল করা সহজ, কিন্তু কেলাসে পরিণত করা শক্ত। যখন এই ধরনের কোনো তরলকে ঠাণ্ডা করা হয়, তখন তা

ক্রমশঃ বেশী বেশী সান্দ্র হতে হতে শেষকালে কেলাসিত না হয়েই শক্ত হয়ে যায়। এর উজ্জ্বল উদাহরণ কাচ।

জলকেও অতিশীতল করা সম্ভব। কুয়াসার বিন্দু, এমনকি দারুণ তুষার-পাতের সময়েও, কঠিনীভূত না হতে পারে। এই ধরনের অতিশীতল তরলে একই বস্তুর কেলাস যোগ করলে সঙ্গে সঙ্গে কেলাসীভবন আরম্ভ হয় (priming)।

তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে আলোড়ন কিংবা অন্য কারণেও বিলম্বিত কেলাসীভবন শুরু হতে পারে। আমরা জানি, কেলাসিত গ্লিসারিন প্রথম পাওয়া গিয়েছিল, রেলপথে গ্লিসারিন পরিবহণের সময়ে। বহুবৎসর রেখে দিলে কাচও কেলাসিত হতে শুরু করে (devitrify)।

কি করে কেলাস উৎপন্ন করা হয় (How to grow a crystal)

প্রায় সব পদার্থ থেকেই নির্দিষ্ট ভৌত পরিবেশে কেলাস উৎপন্ন করা যায়। কেলাস উৎপন্ন করা যায় পদার্থটির দ্রবণ অথবা গলিত অবস্থা থেকে, এমনকি তার বাষ্প থেকেও (প্রমাণ চাপেই আয়োডিন বাষ্প মধ্যবর্তী তরল অবস্থার ভিতর দিয়ে না গিয়ে, সরাসরি কঠিন কালো হীরকাকার কেলাস হিসেবে সঞ্চিত হয়)।

জলে খাদ্যলবণ বা চিনি দ্রবীভূত করে পরীক্ষা আরম্ভ করুন। ঘরের উষ্ণতায় (20°C) আপনি 70 গ্রাম পর্যন্ত খাদ্যলবণ এক গেলাস জলে (প্রায় 200 গ্রাম জল) দ্রবীভূত করতে পারেন। আরও বেশী লবণ যোগ করলে তা আর দ্রবীভূত হবে না, তলায় থিতিয়ে পড়বে। যে দ্রবণে দ্রাব (solute) আর দ্রবীভূত হতে পারে না তাকে সেই পদার্থের সম্পৃক্ত দ্রবণ বলে। তাপমাত্রা পরিবর্তিত করলে দ্রাবকে (solvent) দ্রাবের দ্রাব্যতাও পরিবর্তিত হয়। সকলেই জানেন, অধিকাংশ পদার্থই গরম জলে ঠাণ্ডা জলের তুলনায় বেশী মাত্রায় দ্রবীভূত হয়।

মনে করুন, আপনি একটি পদার্থের, ধরুন চিনির, সম্পৃক্ত দ্রবণ 30°C তাপমাত্রায় তৈরী করে, তাপমাত্রাকে 20°C-এ নিয়ে এলেন। 30°C-এ আপনি 223 গ্রাম চিনিকে 100 গ্রাম জলে দ্রবীভূত করতে পারেন, কিন্তু 20°C-এ মাত্র 205 গ্রাম। তাহলে 30°C থেকে 20°C-এ ঠাণ্ডা করার ফলে 18 গ্রাম চিনি বাড়তি হয়ে যাবে এবং পরিভাষা অনুযায়ী দ্রবণ থেকে অধঃক্ষিপ্ত হবে। সুতরাং সম্পৃক্ত দ্রবণকে ঠাণ্ডা করা, কেলাস উৎপন্ন করার একটি পদ্ধতি।

একই জিনিস আমরা ভিন্নভাবেও করতে পারি। খাদ্যলবণের একটি সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরী করে তাকে খোলা কাচের গেলাসে রেখে দিন। কয়েকদিন পরে দেখবেন পাত্রের তলায় লবণের কেলাস জমেছে। এগুলি কেন উৎপন্ন হল? সাবধানে গেলাসটিকে আবার পরীক্ষা করুন। দেখবেন কেলাস উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি পরিবর্তন ঘটেছে ঃ জলের পরিমাণ কমে গিয়েছে। জল

বাষ্পায়িত হয়েছে এবং বাড়তি পদার্থ ফেলে গেছে দ্রবণের মধ্যে। সুতরাং কেলাস উৎপন্ন করার আর একটি পদ্ধতি হল দ্রবণকে বাষ্পায়িত করা।

দ্রবণ থেকে কেলাস কিভাবে উৎপন্ন হয় ?

আমরা উল্লেখ করেছি যে, দ্রবণ থেকে কেলাস অধঃক্ষিপ্ত হয়। তার মানে কি এই যে, পুরো এক সপ্তাহ কোনো কেলাস উৎপন্ন হয় না আর তারপর একটি বিশেষ মুহূর্তে ভোজবাজির মত তাদের আবির্ভাব ঘটে ? না, ব্যাপারটা তা নয় ; কেলাস বেড়ে ওঠে। অবশ্য এই কেলাস গড়ে ওঠার প্রথম পর্যায় আপনি খালি চোখে দেখতে পাবেন না। প্রথমে দ্রাবের ইতস্ততঃ সঞ্চারমান কয়েকটি অণু বা পরমাণু ঘটনাচক্রে এমনভাবে সমবেত হয় যা তাদের কেলাস ল্যাটিস বিন্যাসের প্রায় অনুরূপ। এই ধরনের পরমাণু বা অণুর জোটকে কেন্দ্রক (nucleus) বলে।

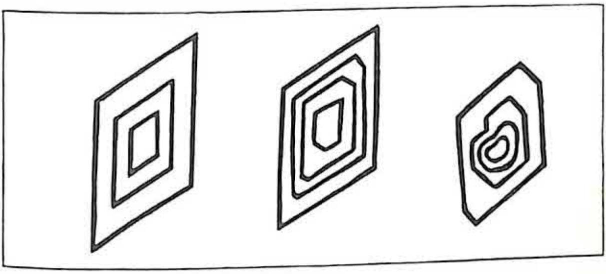
পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ঐ কেন্দ্রকগুলি অনেক বেশী ঘনঘন তৈরী হয় যদি দ্রবণের মধ্যে ধূলিকণা ইত্যাদি বাইরের কোনো বস্তুর সূক্ষ্ম চূর্ণ উপস্থিত থাকে। সম্পৃক্ত দ্রবণে সূক্ষ্ম কেলাস বীজ হিসেবে উপস্থিত থাকলে কেলাসী-ভবন প্রক্রিয়া দ্রুততম আর সহজতম হয়। সেক্ষেত্রে দ্রবণ থেকে অধঃক্ষিপ্ত দ্রাব নতুন কেলাস কেন্দ্রক গঠন করার চেয়ে বীজ কেলাসকে বড় করার কাজেই বেশী লিপ্ত থাকে।

অবশ্য কেন্দ্রকের ক্রমবৃদ্ধি প্রক্রিয়া বীজ কেলাসের ক্রমবৃদ্ধি প্রক্রিয়া থেকে কোনোভাবেই স্বতন্ত্র নয়। বীজ কেলাস ব্যবহারের সুবিধে এই যে, বীজ কেলাস দ্রবণ থেকে যে সব পদার্থ পৃথক হচ্ছে তাদের নিজের কাছে টেনে নিয়ে আসে, আর এইভাবে বহুসংখ্যক কেন্দ্রক গঠনে বাধা দেয়। যদি একই সঙ্গে বহুসংখ্যক কেন্দ্রক গঠিত হয়, তাহলে তারা ক্রমবৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরস্পরকে বাধা দেয় আর তার ফলে বড় আকারের কেলাস গড়ে উঠতে পারে না।

কিভাবে দ্রবণ থেকে পৃথকীভূত পরমাণু বা অণুরা কেন্দ্রকের বহির্তলে নিজেদের বিন্যস্ত করে ?

দেখা গেছে যে, কেন্দ্রক বা বীজ কেলাসের ক্রমবৃদ্ধির সময়ে আপাতঃ দৃষ্টিতে তাদের বহির্তল নিজের নিজের লম্ব অভিমুখে বিকশিত হয়, অর্থাৎ বিকাশের পরে তাদের অবস্থান হয় পূর্ব অবস্থানের সমান্তরাল (যেন কেলাসটি স্ফীত হয়ে উঠেছে)। স্বভাবতই বহির্তলগুলির অন্তর্বর্তী কোণ সমান থাকে (আমরা আগেই জেনেছি যে, এই কোণগুলির অপরিবর্তনীয় মান কেলাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এর কারণ ল্যাটিস বিন্যাস)।

একই পদার্থের তিনটি বিভিন্ন কেলাসের ক্রমবৃদ্ধির রূপ কতকগুলি ক্রমিক সীমানা অঙ্কন করে চিত্র 4.6-এ প্রদর্শিত হল। অণুবীক্ষণের সাহায্যেও একই



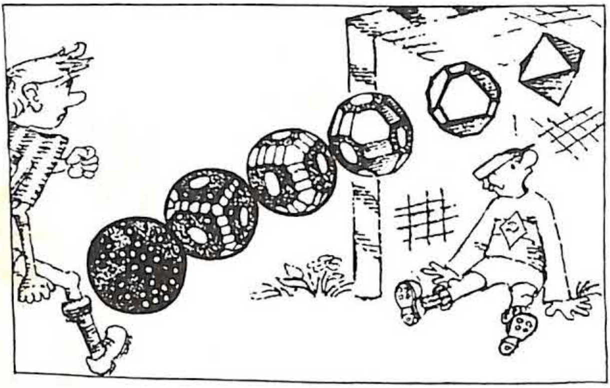
চিত্র 4.6

ধরনের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। বাঁদিকের কেলাসটিতে বহির্তলের সংখ্যা ক্রমবৃদ্ধির সময়ে একই থেকে গেছে। মধ্যের ছবিতে দেখা যাচ্ছে কিভাবে ক্রমবৃদ্ধির সময়ে এক নতুন বহির্তলের আবির্ভাব ঘটেছিল (ডানদিকে ওপরে) যা পরে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

লক্ষণীয় যে বহির্তলের ক্রমবৃদ্ধির হার, অর্থাৎ যে গতিবেগে বহির্তলটি নিজের প্রাথমিক অবস্থানের সমান্তরাল অবস্থানে থেকে আপাতদৃষ্টিতে অগ্রসর হচ্ছে, সব বহির্তলের ক্ষেত্রে সমান নয়। আমরা আরও দেখতে পাই যে, যে বহির্তল অদৃশ্য হচ্ছে সেটির ক্রমবৃদ্ধির হারই ছিল দ্রুততম, যেমন মধ্যের কেলাসের বাঁদিকের নীচের বহির্তল। আবার যে বহির্তলের ক্রমবৃদ্ধির হার সবচেয়ে ধীর, সেটির বিকাশই সবচেয়ে বেশী পূর্ণাঙ্গ। নিয়ম অনুসারে কোনো বিকশিত কেলাস তার ধীরতম গতিতে বিকাশমান বহির্তল দ্বারাই সীমায়িত থাকে।

উপরোক্ত বক্তব্য চিত্র 4.6-এর ডানদিকের কেলাসটির বিষয়ে আলোচনা করলে পরিষ্কার হয়ে উঠবে। এক্ষেত্রে একটি আকারহীন খণ্ডাংশ শেষ পর্যন্ত অন্যান্য কেলাসগুলির মত আকার গড়ে তুলতে পারলো, মূলতঃ ক্রমবৃদ্ধির হারের উক্ত বিভিন্নতার জন্য। অন্যান্য বহির্তল খারিজ করে নির্দিষ্ট কয়েকটি বহির্তল ক্রমশঃ বিকশিত হয়ে উঠলো আর কেলাসটি তার ফলে অর্জন করলো তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসূচক নির্দিষ্ট আকার বা habit।

বীজ কেলাস হিসেবে একটি গোলক নিয়ে, দ্রবণকে পরপর অল্প ঠাণ্ডা আর অল্প গরম করে গেলে, খুব সুন্দর মধ্যবর্তী নানান আকার দেখতে পাওয়া যাবে। গরম করার সময়ে দ্রবণটি অসম্পৃক্ত হয়ে উঠবে আর বীজ কেলাস আংশিকভাবে দ্রবীভূত হবে। আবার ঠাণ্ডা করলে দ্রবণটি অতিসম্পৃক্ত হয়ে বীজ কেলাসটির



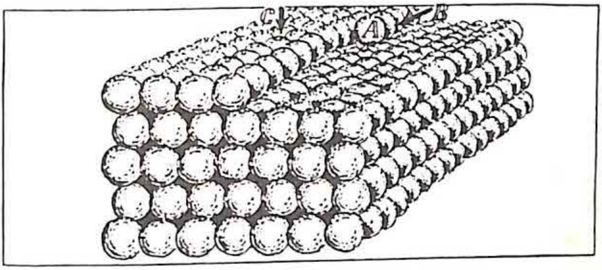
চিত্র 4.7

ক্রমবৃদ্ধি ঘটাবে। কিন্তু দ্রবীভূত হওয়ার আগে অণুগুলি যেমনভাবে সংলগ্ন ছিল ক্রমবৃদ্ধির সময়ে আর সেভাবে সংলগ্ন হবে না, কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে সংলগ্ন হওয়ার প্রবণতা দেখাবে। এইভাবে পদার্থটি গোলকের কয়েকটি অঞ্চল ছেড়ে অন্য কয়েকটি অঞ্চলে জমতে শুরু করবে।

প্রথমে গোলকটির গায়ে কয়েকটি ছোট ছোট বৃত্তাকার বহির্তল আবির্ভূত হবে। এই সব বৃত্তগুলির আকার ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে এবং পরস্পর স্পর্শ করার পর একত্রিত হয়ে সরলরৈখিক বাহু গঠন করবে। গোলকটি একটি বহুতলকে পরিণত হবে। তারপর কতকগুলি বহির্তলের ক্রমবৃদ্ধির হার অন্যগুলির ক্রমবৃদ্ধির হারকে ছাপিয়ে যাবে, বহির্তলগুলির অংশবিশেষ ছোট হতে হতে অদৃশ্য হবে। শেষ পর্যন্ত কেলাসটি গ্রহণ করবে তার বৈশিষ্ট্য সূচক আকার বা habit (চিত্র 4.7)।

কেলাসের ক্রমবৃদ্ধি লক্ষ্য করার সময়ে যে বৈশিষ্ট্য আমাদের অবাক করে, তা হল—এর বহির্তলগুলির আপাতঃ সমান্তরাল গতি। এর অর্থ, দ্রবণ থেকে যে পদার্থটুকু পৃথক হচ্ছে, তা বহির্তলগুলির ওপর স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হয় এবং আগের স্তরটি পূর্ণাঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত পরের স্তর আরম্ভ হয় না।

চিত্র 4.৪-এ পরমাণুর অসম্পূর্ণ সন্নিবেশ দেখানো হয়েছে। কেলাসে সংযুক্ত হওয়ার সময়ে একটি নতুন পরমাণুর পক্ষে বিভিন্ন ইংরাজী বর্ণ দ্বারা সূচিত অবস্থানগুলির মধ্যে ঠিক কোন অবস্থান গ্রহণ করার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী? নিঃসন্দেহে ***K*** দ্বারা সূচিত অবস্থান। কেননা এখানে নতুন পরমাণুটি



চিত্র 4.8

তিন দিক থেকে প্রতিবেশী পরমাণু দ্বারা আকর্ষিত হচ্ছে। কিন্তু ***L*** দ্বারা সূচিত অবস্থানে দুই দিক থেকে এবং ***M*** দ্বারা সূচিত অবস্থানে মাত্র একদিক থেকে। এজন্যই প্রথমে একটি সারি, তারপর একটি স্তর পূর্ণ হয় এবং পরিশেষে শুরু হয় নতুন স্তরের উৎপত্তি।

অনেক ক্ষেত্রে একটি পদার্থের গলিত অবস্থা থেকে তার কেলাস পাওয়া যায়। প্রকৃতিতে এর উদাহরণ অজস্র ; ব্যাসল্ট ; গ্রানাইট এবং অন্যান্য আগ্নেয় শিলার উৎপত্তি হয়েছে পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ অগ্নিময় গলিত পদার্থ বা ম্যাগ্মা থেকে।

আসুন, কেলাসিত কোনো পদার্থ, যেমন খাদ্যলবণ উত্তপ্ত করি! 804°C তাপমাত্রা পর্যন্ত লবণ কেলাসগুলি খুব কমই পরিবর্তিত হবে ; সেগুলি সামান্য সম্প্রসারিত হবে, কিন্তু তাদের কঠিন অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। পাত্রের মধ্যে উপযুক্ত তাপমান যন্ত্র বসানো থাকলে দেখা যাবে যে, তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটছে সমগতিতে। 804°C-এ আমরা দুটি পরস্পর সম্পর্কিত ঘটনা দেখতে পাবো ঃ কেলাসগুলি গলতে শুরু করেছে এবং তাপমাত্রাও আর বাড়ছে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সবটুকু কেলাস না গলছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়বে না। এরপর যখন তাপমাত্রা আবার বাড়তে শুরু করবে তখন বোঝা যাবে যে, আমরা শুধু একটি তরলকে উত্তপ্ত করছি। সমস্ত কেলাসিত পদার্থের নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক আছে। বরফ 0°C-এ গলে, লোহা 1527°C-এ এবং পারা গলে 0°C থেকে 39° নীচে ইত্যাদি।

আমরা আগেই জেনেছি যে, প্রত্যেকটি ছোট কেলাসে পরমাণু বা অণুগুলি শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় সন্নিবিষ্ট থাকে এবং নিজের নিজের সাম্য অবস্থানের চারদিকে সামান্য মাত্রায় স্পন্দিত হয়। উত্তপ্ত করলে স্পন্দনশীল কণিকাগুলির গতিবেগ এবং স্পন্দনের বিস্তার বাড়ে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কণিকাগুলির

গতিবেগের এই বৃদ্ধি প্রকৃতির মৌলিক নিয়মগুলির অন্যতম এবং কঠিন, তরল বা গ্যাসীয়—সব অবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

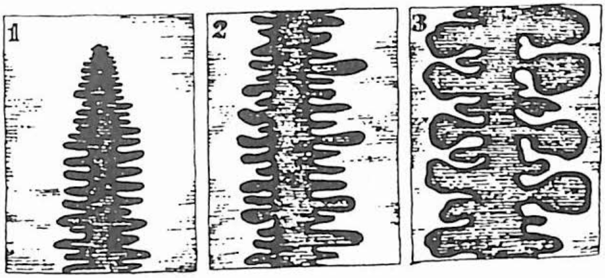
যখন কেলাসের তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট উচ্চ মানে পৌঁছায়, তখন কণিকাগুলির স্পন্দনের মাত্রা এতো প্রচণ্ড হয় যে, কণিকাগুলির পক্ষে সঠিক বিন্যাস বজায় রাখা আর সম্ভব হয় না এবং কেলাসটি গলে যায়। গলন আরম্ভ হওয়ার পর, সরবরাহ করা উত্তাপ আর কণিকাগুলির গতিবেগ বাড়ায় না, কেলাসের ল্যাটিস ভাঙ্গার কাজে নিযুক্ত হয়। এজন্যেই সবটুকু পদার্থের গলন সম্পূর্ণ হওয়ার আগে তাপমাত্রা আর বাড়ে না। পরবর্তী পর্যায়ে সরবরাহকৃত উত্তাপ তরলের কণিকাগুলির গতিবেগ বাড়ায়।

আমাদের আলোচ্য বিষয় গলিত অবস্থা থেকে কেলাসন অর্থাৎ হিমায়নের (freezing) ক্ষেত্রে, পূর্বলিখিত ঘটনাগুলি উল্টোভাবে ঘটে: তরলকে ঠাণ্ডা করলে তার কণিকাগুলির বিশৃঙ্খল গতি কমে যায়। একটি নির্দিষ্ট উপযুক্ত নিম্ন তাপমাত্রা স্থাপিত হলে কণিকাগুলির গতিবেগ এতো কমে যায় যে, তাদের মধ্যে কতকগুলি অন্যদের সাপেক্ষে একটি সুশৃঙ্খল বিন্যাস গড়ে তুলতে আরম্ভ করে এবং উৎপন্ন করে একটি কেলাস কেন্দ্রক। যতক্ষণ না পদার্থটির সবটুকু হিমায়িত বা কঠিনীভূত হচ্ছে, ততক্ষণ তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় না। নিয়মানুযায়ী এই তাপমাত্রার মান গলনাঙ্কের সমান।

বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে গলিত পদার্থ থেকে হিমায়ন আরম্ভ হয় একসঙ্গে অনেকগুলি জায়গায়। ছোট কেলাসগুলি পূর্ববর্ণিত পদ্ধতিতে পদার্থটির বৈশিষ্ট্যসূচক সুসম বহুতলক হিসেবে বিকশিত হতে থাকে। অবশ্য এই ধরনের স্বাধীন বিকাশ শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যায়, কেননা বিকাশশীল ছোট ছোট কেলাসগুলি পরস্পরের সংস্পর্শে আসায় স্পর্শবিন্দুগুলিতে আর ক্রমবৃদ্ধি ঘটতে পারে না। এর ফলে কঠিনীভূত পদার্থটির গঠন হয় দানাভরা। এই দানাগুলির প্রত্যেকটি এক একটি ছোট কেলাস, যার নিয়মানুগ আকার সম্পূর্ণভাবে গড়ে উঠতে পারে নি।

অনেকগুলি বিষয়ের বিশেষতঃ শীতলীকরণের গতির ওপর নির্ভর করে একটি কঠিন পদার্থের দেহ ছোট ছোট কিংবা বড় বড় দানা দিয়ে গড়ে উঠতে পারে। শীতলীকরণের গতি যত মন্থর হয়, দানাগুলি হয় তত বড়। কেলাসিত পদার্থের দানার মাপ এক মিলিমিটারের এক লক্ষাংশ থেকে কয়েক মিলিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দানার কেলাস গঠন অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখতে পাওয়া যায়। বেশীর ভাগ কঠিন পদার্থেরই এই ধরনের কেলাস গঠন আছে।

ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে ধাতুর হিমায়ন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।



চিত্র 4.9

পদার্থবিদ্‌রা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঢালাই কারখানার ছাঁচের মধ্যে গলিত ধাতুর কঠিনীভবন প্রক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখেছেন।

গলিত ধাতু যখন ঠাণ্ডা করা হয় তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার মধ্যে গাছের আকারের কেলাস বা 'ডেনড্রাইট' (dendrite) গড়ে ওঠে। অনেক সময়ে এই ডেনড্রাইটগুলি সাজানো থাকে এলোমেলোভাবে, আবার কখনো কখনো পরস্পরের সমান্তরালভাবে।

চিত্র 4.9-তে একটি একক ডেনড্রাইটের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় দেখানো হয়েছে। অনুরূপ অবস্থায় ডেনড্রাইটটি গলিত ধাতুর মধ্যে অন্য আরেকটি ডেনড্রাইটের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগে আকারে অতিরিক্ত বড় হয়ে নিজের শাখাগুলির ভেতরকার সব ফাঁক ভরাট করে তুলতে পারে। সেক্ষেত্রে কঠিনীভূত ঢালাইটির মধ্যে আমরা কোনো ডেনড্রাইটকেই খুঁজে পাবো না। কিন্তু ঘটনাস্রোত অন্যদিকেও বইতে পারে : বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়েই বিভিন্ন ডেনড্রাইট পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে একের মধ্যে আরেকটি (একের শাখাগুলি অন্যের শাখার ভিতরকার ফাঁকের মধ্যে) বিকশিত হতে শুরু করে।

এজন্যে আমরা এমন বিভিন্ন ঢালাই পেতে পারি যাদের ভিতরকার দানাগুলির (চিত্র 2.22-এ প্রদর্শিত) গঠন বিভিন্ন। ধাতুর ধর্ম মূলতঃ এই গঠনের ওপর নির্ভর করে। শীতলীকরণের মাত্রা এবং ছাঁচ থেকে তাপবর্জন ব্যবস্থা অদল-বদল করে আমরা কঠিনীভবনের সময়ে ধাতুর চরিত্র নিয়ন্ত্রিত করতে পারি।

যদি আমরা একটিমাত্র বড় কেলাস গড়ে তুলতে চাই, তাহলে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে একটিমাত্র জায়গায় কেলাস গড়ে ওঠে। কিন্তু যদি তা সত্ত্বেও একাধিক জায়গায় কেলাস গড়ে উঠতে শুরু করে তাহলে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন যাতে তাদের মধ্যে কেবলমাত্র একটিই বড় হয়ে উঠতে পারে।

গলনীয় ধাতুর কেলাস গঠনের জন্যে অনেক সময়ে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত অনুসৃত হয়। একটি লম্বিততল টেস্টটিউবের মধ্যে ধাতুটিকে প্রথমে গলানো হয়। তারপর টেস্টটিউবটিকে একটি সুতোয় বেঁধে আস্তে আস্তে উল্লম্ব চোঙাকৃতি চুল্লীর মধ্যে নামানো হয়। টেস্টটিউবের লম্বিত তলদেশ ক্রমশঃ চুল্লী থেকে বাইরে আসে আর ঠাণ্ডা হয়। শুরু হয় কেলাসন। প্রথমে কতকগুলি ছোট ছোট কেলাস উৎপন্ন হয়, কিন্তু যেগুলি পাশের দিকে বাড়ে সেগুলি শীঘ্রই টেস্টটিউবের দেয়ালের সংস্পর্শে আসে এবং তাদের ক্রমবৃদ্ধি মন্থর হয়ে যায়। কেবলমাত্র যে কেলাসটি টেস্টটিউবের অক্ষ বরাবর অর্থাৎ গলিত ধাতুর কেন্দ্রের দিকে বাড়ে, সেটিই সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে। টেস্টটিউবটিকে যত নামানো হয় ততই গলিত ধাতুর নতুন নতুন অংশ নিম্নতাপমাত্রার অঞ্চলে প্রবেশ করে এই অদ্বিতীয় বিকাশশীল কেলাসটির খাদ্য জোগায়। তাই ছোট ছোট সবগুলি কেলাসের মধ্যে কেবলমাত্র এটিই শেষ পর্যন্ত স্থায়িত্বলাভ করে ; টেস্টটিউবটিকে যত নীচে নামানো হয় ততই এটি টেস্টটিউবের অক্ষ বরাবর বড় হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত সবটুকু গলিত ধাতু একটিমাত্র কেলাসের রূপে কঠিনীভূত হয়।

চুনির দুর্গল কেলাস গড়ে তোলার পদ্ধতির মূলে রয়েছে এবই নীতি। অগ্নিশিখার ভিতর দিয়ে চুনির সূক্ষ্ম চূর্ণ ঢেলে দেওয়া হয়। ফলে চূর্ণের কণিকাগুলি গলে যায় ; বিন্দু বিন্দু আকারে এগুলি নীচে রাখা একটি দুর্গল পাত্রে ঝরে পড়ে কেলাস কণিকা সৃষ্টি করে। সব কেলাস কণিকাগুলিই বাড়তে চায়, কিন্তু এখানেও যেটি ঝরে পড়া বিন্দুগুলিকে 'অভ্যর্থনা' করার মতো সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে, একমাত্র সেটিই বিকশিত হয়।

কিন্তু বড়ো কেলাসের প্রয়োজন কি ?

শিল্প এবং বিজ্ঞানে অনেক সময়েই বড়ো কেলাসের প্রয়োজন হয়। প্রযুক্তি বিজ্ঞানে সিগনেট (Seignette) লবণ এবং কোয়ার্টজের দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, কেননা এগুলি যান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপকে (যেমন চাপ) বিভব প্রভেদে রূপান্তরিত করতে পারে।

আলোকসংক্রান্ত প্রযুক্তি বিজ্ঞানে ক্যালসাইট, খাদ্য লবণ, ফ্লোরাইট ইত্যাদির বড়ো কেলাস ব্যবহৃত হয়।

ঘড়ি তৈরী করার জন্য চুনি, নীলা এবং আরও কয়েকপ্রকার মূল্যবান মণির কেলাসের প্রয়োজন হয়। এর কারণ, সাধারণ ঘড়ির চলমান অংশগুলিকে ঘণ্টায় প্রায় 20,000 বার স্পন্দিত হতে হয়। তাই এগুলির অক্ষপ্রান্তের এবং এগুলি যাদের মধ্যে ঘোরে সেই বিয়ারিংগুলির উচ্চমান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 0·07—0·15 mm ব্যাসযুক্ত অক্ষপ্রান্তের জন্য চুনি বা নীলার বিয়ারিং ব্যবহার করলে সবচেয়ে কম ক্ষয় হয়। উপরোক্ত পদার্থগুলির মনুষ্যনির্মিত কেলাস

অত্যন্ত দৃঢ় এবং ইস্পাতের ঘর্ষণে খুব কম পরিমাণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। লক্ষণীয় যে, মনুষ্যনির্মিত মণি প্রাকৃতিক মণির চেয়ে অনেক বেশী ভালোভাবে উপরোক্ত ভূমিকা পালন করে।

শিল্পজগতে অর্ধপরিবাহী (সিলিকন) একক কেলাসের অভ্যুদয় সবচেয়ে বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। এই সব কেলাস ছাড়া আধুনিক যোগাযোগ-ইলেকট্রনিক্সের অস্তিত্ব কল্পনা করাও যায় না।

গলনাঙ্কের ওপর চাপের প্রভাব (Influence of Pressure on Melting Point):

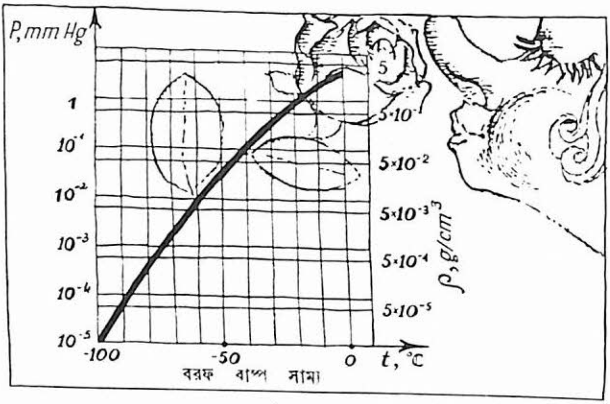
চাপ পরিবর্তিত হলে গলনাঙ্কেরও পরিবর্তন হয়। স্ফুটনাঙ্ক সম্পর্কে আলোচনার সময়ে আমরা একই ধরনের সম্পর্ক দেখেছি। চাপ যত বাড়ে, স্ফুটনাঙ্কও তত বাড়ে। সাধারণভাবে এই নিয়ম গলনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অবশ্য অল্প কয়েকটি পদার্থ আছে যাদের আচরণে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়: এদের গলনাঙ্ক চাপ বাড়ালে কমে।

উপরোক্ত আচরণের আসল কারণ এই যে, কঠিন পদার্থগুলির অধিকাংশেরই ঘনত্ব তাদের তরল অপেক্ষা বেশী। এই নিয়মের ব্যতিক্রম যেসব পদার্থের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিশেষ করে সেগুলিরই গলনাঙ্ক চাপের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়, যেমন জল। বরফ জলের চেয়ে হাল্কা এবং তার গলনাঙ্ক চাপ বাড়ালে কমে যায়।

সংকোচন ঘনতর অবস্থা সৃষ্টিতে সাহায্য করে। যদি কঠিন তরল অপেক্ষা ঘনতর হয় তাহলে সংকোচন কঠিনীভবনকে সাহায্য করে এবং বাধা দেয় গলনকে। কিন্তু যদি সংকোচনের ফলে গলন বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে তার অর্থ পদার্থটি আগে যে তাপমাত্রায় গলে যেতো এখন সেই তাপমাত্রায় কঠিনই থাকবে, অর্থাৎ চাপ বাড়ালে গলনাঙ্ক বাড়বে। ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রগুলিতে তরল কঠিন অপেক্ষা ঘনতর হয় এবং তাই চাপ তরল সৃষ্টিতে সাহায্য করে, অর্থাৎ গলনাঙ্ক কমিয়ে দেয়।

গলনাঙ্কের ওপর চাপের প্রভাব স্ফুটনের ক্ষেত্রে অনুরূপ প্রভাবের তুলনায় অনেক কম। 100 kgf cm^2 পরিমাণ চাপ বাড়ালে বরফের গলনাঙ্ক কমে মাত্র 1°C।

কেন স্কেট বরফের ওপর পিছ্লে চলে, কিন্তু একই রকম অতি মসৃণ মেঝেতে পিছ্লোতে পারে না? একমাত্র যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর হল জলের উৎপত্তি, যা স্কেটের রানারকে (runner) ঘর্ষণ বাধা থেকে মুক্ত করে। কিন্তু রানার দ্বারা প্রযুক্ত চাপ সাধারণভাবে কখনোই 100 kgf/cm^2-এর বেশী হতে পারে না এবং এইটুকু চাপের ফলে বরফের গলনাঙ্ক রানারের তলায় এতো কমে যেতে পারে না যাতে বরফ গলে। এই সমস্যা সমাধানে বর্তমানে আমি এইটুকুই মাত্র জানাবো যে,



চিত্র 4.10

ভোঁতা রানার সংযুক্ত স্কেট বরফের ওপর খুব আস্তে যায়। রানারকে ধারালো করতে হয়, যাতে তা বরফ কাটতে পারে। অনুরূপ অবস্থায় রানারের শুধু ধারালো প্রান্ত বরফের সংস্পর্শে আসে এবং লক্ষ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ প্রয়োগ করে বরফ গলিয়ে দেয়।

কঠিনের বাষ্পায়ন (Evaporation of Solids) ঃ

যখন বাষ্পায়ন হচ্ছে বলা হয় তখন সাধারণতঃ ধরে নেওয়া হয় যে, একটি তরল বাষ্পায়িত হচ্ছে। কিন্তু কঠিন পদার্থও বাষ্পায়িত হতে পারে। কঠিনের বাষ্পায়নকে অনেক সময়ে ঊর্ধ্বপাতন বলা হয়।

যেমন ন্যাফ্‌থ্যালিন এমন এক কঠিন পদার্থ, যা বাষ্পায়িত হয়। ন্যাফ্‌থ্যালিন 80°C তাপমাত্রায় গলে যায়, কিন্তু ঘরের তাপমাত্রায় বাষ্পায়িত হয়। এই ধর্মের জন্যেই ন্যাফ্‌থ্যালিনকে কাপড়-কাটা পোকা তাড়ানোর জন্যে ব্যবহার করা হয়। পশমের কোটে ন্যাফ্‌থ্যালিন চূর্ণ ছড়িয়ে দিলে কোটটি ন্যাফ্‌থ্যালিন বাষ্পে সম্পৃক্ত হয়ে এমন পরিবেশ গড়ে তোলে যা কাপড়-কাটা পোকা সহ্য করতে পারে না। সব গন্ধযুক্ত কঠিন পদার্থই বেশ কিছু পরিমাণে বাষ্পায়িত হয়। বস্তুতঃ ঐ পদার্থগুলি থেকে কিছু কিছু অণু বেরিয়ে আমাদের নাকে পেঁছানোর জন্যই আমরা গন্ধ টের পাই।

অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কঠিন পদার্থগুলি অতি সামান্য পরিমাণে ঊর্ধ্বপাতিত হয়, অনেক সময়ে এই ঊর্ধ্বপাতনের মাত্রা এতোই নগণ্য হয় যে, সর্বাধিক যত্নে পরীক্ষা চালিয়েও তা ধরা যায় না। নীতিগতভাবে সব কঠিন পদার্থই (হ্যাঁ, এমনকি লোহা বা তামাও) বাষ্পায়িত হয়। যদি আমরা

ঊর্ধ্বপাতনকে সনাক্ত করতে না পারি, তাহলে তার একমাত্র অর্থ পদার্থটির বাষ্পীয় ঘনত্ব খুবই নগণ্য। কঠিনের সঙ্গে সাম্যাবস্থায় থাকা সম্পৃক্ত বাষ্পের ঘনত্ব, তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (চিত্র 4.10)। সহজেই প্রমাণ করা যায় যে, যে সব পদার্থ থেকে ঘরের উষ্ণতায় তীব্র গন্ধ বেরোয়, নিম্ন তাপমাত্রায় তাদের সেই গন্ধ পাওয়া যায় না।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কঠিন পদার্থের সম্পৃক্ত বাষ্পীয় ঘনত্ব বেশী বাড়ানো সম্ভব হয় না। এর কারণ অত্যন্ত সহজ– পদার্থটি তার আগেই গলে যায়।

বরফও বাষ্পায়িত হয়। শীতপ্রধান দেশের গৃহিনীরা একথা ভালোই জানেন আর সেজন্যে তুষারপাতের সময়েও কাচা কাপড়-চোপড় শুকোবার জন্যে ঝুলিয়ে দেন। প্রথমে জল জমে বরফ হয়ে যায় কিন্তু তারপর সেই বরফ বাষ্পায়িত হলে বোঝা যায় কাপড় শুকিয়েছে।

ত্রিদশা বিন্দু (Triple Point) ঃ

আমরা দেখেছি যে অনেক সময় কঠিন, তরল এবং গ্যাসের মধ্যে যে কোনো এক জোড়া সাম্যাবস্থায় থাকতে পারে।

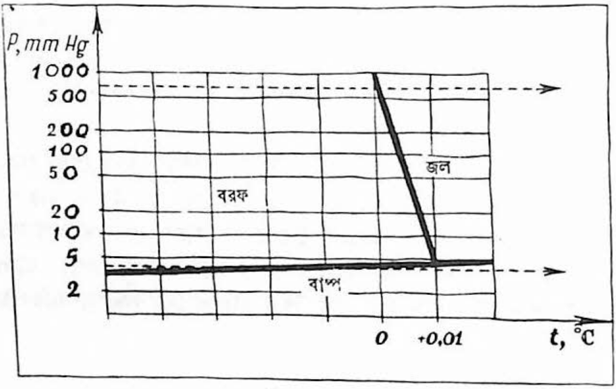
কিন্তু পদার্থের এই তিন অবস্থা কি একসঙ্গে সাম্যাবস্থায় থাকতে পারে? সত্যি পারে, চাপ-তাপমাত্রা লেখচিত্রে এই রকম একটি বিন্দুর অস্তিত্ব আছে। একে বলে ত্রিদশা বিন্দু (triple point)। এর অবস্থান ঠিক কোথায়?

যদি জলের ওপর ভাসমান বরফ নিয়ে আবদ্ধ কোনো পাত্রে 0°C তাপমাত্রায় রাখা হয়, জলের (এবং বরফের) বাষ্প মুক্ত অংশে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে। চাপ 4·6 mm পারদের চাপের সমান হয়ে উঠলে বাষ্পায়ন বন্ধ হয়, মুক্ত অঞ্চল বাষ্পে সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে। তিনটি দশা, বরফ, জল এবং বাষ্প সাম্যাবস্থায় এসে পৌঁছায়। এটিই ত্রিদশা বিন্দু।

চিত্র 4.11-তে জলের ক্ষেত্রে তার বিভিন্ন অবস্থাগুলির সম্পর্ক লেখচিত্রের সাহায্যে পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে। যে কোনো পদার্থের ক্ষেত্রেই অনুরূপ লেখচিত্র গড়ে তোলা যায়।

চিত্রে প্রদর্শিত লেখরেখাগুলি আমাদের পরিচিত—এগুলি বরফ আর জলীয় বাষ্পের সাম্যাবস্থাসূচক রেখা, বরফ আর জলের সাম্যাবস্থাসূচক রেখা এবং জল আর জলীয় বাষ্পের সাম্যাবস্থাসূচক রেখা। প্রথা অনুযায়ী চাপকে উল্লম্ব অক্ষ এবং তাপমাত্রাকে আনুভূমিক অক্ষ বরাবর চিহ্নিত করা হয়েছে।

উপরোক্ত তিনটি রেখা ত্রিদশা বিন্দুতে মিলিত হয়ে লেখচিত্রকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করেছে—বরফের থাকার জায়গা, জলের থাকার জায়গা আর জলীয় বাষ্পের থাকার জায়গা।



চিত্র 4.11

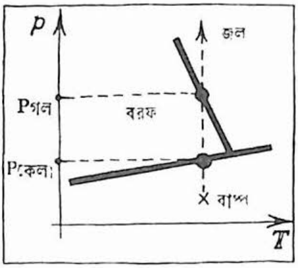
দশাচিত্র সুসংবদ্ধ সারপুস্তিকার কাজ করে। এর সাহায্যে বোঝা যায় নির্দিষ্ট চাপ ও তাপমাত্রায় একটি পদার্থকে কোন অবস্থায় দেখতে পাওয়া যাবে।

যদি জল বা জলীয় বাষ্পকে বাঁদিকের অঞ্চলের নির্দেশক অবস্থার মধ্যে রাখা হয়, তাহলে তা বরফে পরিণত হবে। যদি জল বা বরফকে নীচের অঞ্চলে রাখা হয় তাহলে পাওয়া যাবে জলীয় বাষ্প। ডানদিকের অঞ্চলে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হবে আর বরফ গলে তৈরী করবে জল।

দশা-লেখচিত্রের সাহায্যে সঙ্গে সঙ্গে বলা যায়, একটি পদার্থকে গরম করলে কিংবা সংকুচিত করলে কি ঘটবে। স্থির চাপে তাপমাত্রার বৃদ্ধি লেখচিত্রে একটি আনুভূমিক সরলরেখা দ্বারা সূচিত হবে। পদার্থটির দশাজ্ঞাপক বিন্দু ঐ সরলরেখা বরাবর বাঁদিক থেকে ডানদিকে এগোবে।

লেখচিত্রে অনুরূপ দুটি সরলরেখা আঁকা হয়েছে, যাদের মধ্যে একটি প্রমাণ চাপে তাপমাত্রা বৃদ্ধি সূচিত করেছে। এই সরলরেখা ত্রিদশা বিন্দুর ওপরে অবস্থিত। তাই এই সরলরেখা প্রথমে গলনাঙ্ক রেখাকে ছেদ করবে এবং তারপর চিত্রের বাইরে অনেক দূরে বাষ্পায়ন রেখাকেও। প্রমাণ চাপে বরফ 0°C-এ গলবে আর উদ্ভূত জল ফুটবে 100°C-এ।

কিন্তু খুব নিম্ন চাপে, ধরুন 5 mm পারদ চাপেরও অল্প নীচে বরফকে উত্তপ্ত করলে পরিস্থিতি ভিন্নতর হবে। সংশ্লিষ্ট তাপন প্রক্রিয়াকে ত্রিদশা বিন্দুর অল্প নীচে একটি সরলরেখা দ্বারা সূচিত করা হয়েছে। গলনাঙ্ক আর স্ফুটন রেখাদুটি এই সরলরেখাকে ছেদ করে নি। সুতরাং এই অতি নিম্ন চাপে বরফকে গরম করলে তা সরাসরি বাষ্পে পরিণত হবে।



চিত্র 4.12

চিত্র 4.12-তে একই লেখচিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছে যে, যখন কাটা চিহ্ন দ্বারা সূচিত অবস্থায় জলীয় বাষ্পকে সংকুচিত করা হবে, তখন কি ঘটবে। জলীয় বাষ্প প্রথমে বরফে পরিণত হবে, তারপর তা গলবে। লেখচিত্র দেখে সঙ্গে সঙ্গে বলা যায়, ঠিক কত চাপে কেলাস গড়ে উঠতে শুরু করবে আর কখনই বা শুরু হবে গলন।

সব পদার্থের দশা-লেখচিত্রই সদৃশ। প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্ন পদার্থের ক্ষেত্রে যে বিভিন্নতা দেখা যায় তার কারণ লেখচিত্রে ত্রিদশা বিন্দুর অবস্থানে দারুন বিভিন্নতা।

আসলে আমরা যে পরিবেশে বাস করি তা প্রমাণ অবস্থার চাপের কাছাকাছি ; যেমন, এমন এক চাপের মধ্যে যার মান এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপের কাছাকাছি। তাই প্রত্যেক পদার্থের ক্ষেত্রে প্রমাণ চাপ রেখার পরিপ্রেক্ষিতে তার ত্রিদশা বিন্দুর অবস্থান, আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যদি কোনো পদার্থের ত্রিদশা বিন্দুর সংশ্লিষ্ট চাপ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের কম হয় তাহলে, আমরা যারা প্রমাণ অবস্থায় বাস করি তাদের কাছে, পদার্থটি গরম করলে গলে যায় এমন এক পদার্থ। তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে পদার্থটি প্রথমে তরলে পরিণত হবে আর তারপর এক সময়ে ফুটতে আরম্ভ করবে।

অপরপক্ষে পদার্থটির ত্রিদশা বিন্দুর সংশ্লিষ্ট চাপ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের বেশী হলে আমরা পদার্থটিকে গরম করে তরলে পরিণত করতে পারবো না, সেটি সরাসরি বাষ্পে রূপান্তরিত হবে। ‘শুষ্ক বরফ’ এইরকম ব্যবহারই করে, যা আইসক্রীম বিক্রেতাদের কাছে খুবই সুবিধাজনক। তারা ‘শুষ্ক বরফের’ টুকরো আইসক্রীমের ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে দেয় এবং এর ফলে আইসক্রীম ভিজে যাবে এমন আশঙ্কা করে না। ‘শুষ্ক বরফ’ কঠিন কার্বনডাইঅক্সাইড (CO_2)। এর ত্রিদশা বিন্দুর অবস্থান 73 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে। তাই যখন কঠিন কার্বন-ডাইঅক্সাইডকে উত্তপ্ত করা হয়, তখন এবং অবস্থানির্দেশক বিন্দু একটি

আনুভূমিক সরলরেখা বরাবর অগ্রসর হয়ে শুধুমাত্র কঠিনের বাষ্পায়ন রেখাকে ছেদ করে (ঠিক যেমনটি দেখা যায় প্রায় 5 mm পারদচাপে সাধারণ বরফকে উত্তপ্ত করলে)।

কেলভিন স্কেলে তাপমাত্রার এক ডিগ্রী বা কেলভিন (বর্তমানে S.I. পদ্ধতিতে এইভাবেই বলা হয়) কি করে নির্ধারণ করা হয়, তা আমরা আগেই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছি। তখন আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল তাপমাত্রা যে নীতির ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়, সেই নীতি। কিন্তু সব পরিমাপক কেন্দ্রে আদর্শ গ্যাস থার্মোমিটার থাকে না। সেজন্য পদার্থের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে যে প্রকৃতিদত্ত নির্দিষ্ট তাপমাত্রা থাকে, তার সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

ঐ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, জলের ত্রিদশা বিন্দু। জলের তাপগতিবিদ্যা-সম্মত ত্রিদশা বিন্দুর তাপমাত্রার 1/273·16 অংশকে বর্তমানে এক কেলভিন হিসেবে গ্রহণ করা হয়। অক্সিজেনের ত্রিদশা বিন্দুকে ধরা হয় 54·361 K ; সোনার গলনাঙ্ককে 1337·58 K। এই স্থির বিন্দুগুলিকে ব্যবহার করে আমরা যে কোনো থার্মোমিটার চিহ্নিত করতে পারি।

একই পরমাণু কিন্তু ভিন্ন কেলাস (The Same Atoms but Different Crystals) :

অনুজ্জ্বল নরম গ্রাফাইট, যা দিয়ে আমরা লিখি এবং উজ্জ্বল, স্বচ্ছ অতিদৃঢ় হীরক, কাঁচ কাটার জন্যে যা ব্যবহৃত হয়, এই দুই বস্তুই একই পরমাণু—কার্বন পরমাণু দিয়ে গড়া। তাহলে একই উপাদানে গড়া এই দুই বস্তুর ধর্মে এতো পার্থক্য কেন ?

মনে করার চেষ্টা করুন স্তরবিশিষ্ট গ্রাফাইট ল্যাটিসের কথা, যার প্রতি পরমাণুকে ঘিরে রয়েছে নিকটতম তিনটি প্রতিবেশী এবং হীরকের ল্যাটিসের কথা, যার প্রতি পরমাণুকে বেষ্টণ করে আছে নিকটতম চারটি প্রতিবেশী। এই দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কেলাসের ধর্ম তার ভেতরকার পরমাণুগুলির বিন্যাসের ওপর নির্ভর করে। দুহাজার বা তিন হাজার ডিগ্রী তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে এমন অগ্নিসহ মুচি (fireproof crucible) প্রস্তুত করা হয় গ্রাফাইট দিয়ে, কিন্তু হীরক 700°C তাপমাত্রার ওপরে পুড়তে শুরু করে ; গ্রাফাইটের আপেক্ষিক গুরুত্ব 2·3, কিন্তু হীরকের 3·5 ; গ্রাফাইট তড়িৎ পরিবহণ করতে পারে কিন্তু হীরক পারে না, ইত্যাদি।

বিভিন্ন রকম কেলাস গঠন করার ক্ষমতা শুধু কার্বনের একচেটে নয়। প্রায় প্রতিটি রাসায়নিক মৌল এবং শুধু মৌল নয়, রাসায়নিক পদার্থ, একাধিক রূপে থাকতে পারে। ছয়টি বিভিন্ন রূপের বরফ, নয়টি বিভিন্ন রূপের গন্ধক এবং চারটি বিভিন্ন রূপের লোহা এ যাবৎ সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

দশা লেখচিত্র নিয়ে আলোচনার সময়ে আমরা বিভিন্ন রূপের কেলাস সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করিনি, কঠিন অবস্থা দেখতে পাওয়া যাবে এমন একটিমাত্র অঞ্চলের কথা বলেছি। কিন্তু অনেক পদার্থের ক্ষেত্রে এই অঞ্চল আবার একাধিক উপঅঞ্চলে বিভক্ত, যাদের এক একটির মধ্যে পদার্থটির একটিমাত্র রূপ, বা যাকে বলা হয় একটি নির্দিষ্ট কঠিন দশা, (একটি নির্দিষ্ট কেলাস গঠন) দেখতে পাওয়া যায়।

চাপ ও তাপমাত্রার নির্দিষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রত্যেক কেলাস দশার নিজস্ব ক্ষেত্র আছে, যার মধ্যে তাকে সুস্থিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এক কেলাস রূপের অন্য এক রূপে পরিবর্তনের নিয়মগুলি গলন এবং বাষ্পায়নের নিয়মাবলীর অনুরূপ।

কোনো নির্দিষ্ট চাপে এমন তাপমাত্রা খুঁজে বের করা যায়, যখন দুই ধরনের কেলাস একসঙ্গে থাকতে পারে। তাপমাত্রা বাড়ালে একধরনের কেলাস দ্বিতীয় ধরনের কেলাসে রূপান্তরিত হয়। তাপমাত্রা কমালে পরিবর্তন হয় উল্টোদিকে।

লাল গন্ধককে হলুদে গন্ধকে পরিণত করতে হলে 110°C-এর নিম্নতর তাপমাত্রার প্রয়োজন। এই তাপমাত্রার ওপরে গলনাঙ্কের তাপমাত্রা পর্যন্ত লাল গন্ধকের পরমাণু বিন্যাস সুস্থিত। তাপমাত্রা কমলে পরমাণুর স্পন্দন কমে এবং 110°C থেকে প্রকৃতি পরমাণুগুলির জন্য আরো বেশী উপযুক্ত অন্য এক বিন্যাস বেছে নেয়। এক ধরনের কেলাস রূপান্তরিত হয় অন্য আরেক ধরনের কেলাসে।

বরফের ছয় রকম বিভিন্ন কেলাসের আলাদা আলাদা নামকরণ করা হয় নি। তার বদলে বলা হয় বরফ-এক, বরফ-দুই,……বরফ-সাত। ছয় রকমের বিভিন্ন কেলাস, তবু বরফ-সাত নাম এলো কেন? এর কারণ বারবার পরীক্ষা সত্ত্বেও বরফ-চারের উপস্থিতি সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

জলকে 0°C তাপমাত্রার কাছাকাছি 2000 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে সঙ্কুচিত করলে বরফ-পাঁচ পাওয়া যায় এবং বরফ-ছয় পাওয়া যায় প্রায় 6000 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে।

বরফ-দুই আর বরফ-তিন শুধু 0°C তাপমাত্রার নীচে সুস্থিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

বরফ-সাত বেশ গরম বরফ; এটি পাওয়া যায় গরম জলকে 20,000 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে রেখে দিলে।

সাধারণ বরফ ছাড়া অন্য সব ধরনের বরফ কেলাসই জলের চেয়ে ভারী। প্রমাণ অবস্থায় তৈরী বরফে ব্যতিক্রান্ত ধর্ম দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু অন্যান্য অবস্থায় প্রস্তুত বরফ সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী আচরণ করে।

আমরা একটু আগে বলেছি যে, বিভিন্ন কেলাস রূপের অস্তিত্বের অঞ্চল বিভিন্ন। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে কি করে হীরক আর গ্রাফাইটের একই অবস্থার মধ্যে অস্তিত্ব সম্ভব ?

কেলাস জগতে এই ধরনের বেনিয়ম হামেসাই দেখা যায়। 'অপরের অধিকৃত অঞ্চলে' বেঁচে থাকার ক্ষমতা, কেলাস জগতে প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বাষ্প বা তরলকে অন্যের অঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার জন্য নানান ধরনের কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, কিন্তু কেলাসের জগতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐভাবে কারিকুরি করার দরকার হয় না।

কেলাসের অতিতাপন এবং অতিশীতলীকরণ ব্যাখ্যা করা হয় এই বলে যে, অতিরিক্ত ভীড়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বিন্যাসকে অন্য আর এক বিন্যাসে পরিবর্তিত করা খুবই কঠিন। হলুদে গন্ধকের 95·5°C-এ লাল গন্ধকে রূপান্তরিত হওয়া উচিত। কিন্তু মোটামুটি দ্রুতহারে উত্তপ্ত করলে এই রূপান্তর তাপমাত্রা অতিক্রান্ত হয়ে 113°C-এ এসে পেঁছায়।,

যখন বিভিন্ন রূপের কেলাস নিজেদের সংস্পর্শে থাকে, তখনই রূপান্তর বিন্দু সবচেয়ে সহজে সনাক্ত করা যায়। হলুদে আর লাল গন্ধককে পরস্পরের সংস্পর্শে এনে তাপমাত্রা 96°C-এ স্থির রাখলে, লাল গন্ধক হলুদে গন্ধককে 'খেয়ে ফেলবে', কিন্তু যদি তাপমাত্রা 95°C-এ স্থির রাখা হয় তাহলে হলুদে গন্ধকই 'ভক্ষণ' করবে লাল গন্ধককে। অতিতাপন এবং অতিশীতলীকরণের সময়ে কেলাস-কেলাস রূপান্তর, কেলাস-তরল রূপান্তর যেমন দ্রুত হয় তেমন না হয়ে অনেক বিলম্বিত হয়ে থাকে।

অনেক সময়ে অনেক পদার্থের এমন রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যেগুলিকে সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশে পাওয়া যাবে বলে মনে করা হতো।

+13°C-এ সাদা টিনের ধূসর টিনে রূপান্তরিত হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ সাদা টিনের জিনিস ব্যবহার করি এবং দেখি যে শীতকালেও তাদের কোনো পরিবর্তন হয় না। সাদা টিন 20°—30° অতিশীতলীকরণ অনায়াসে সহ্য করতে পারে। অবশ্য অতিরিক্ত শীত পড়লে সাদা টিন ধূসর টিনে রূপান্তরিত হয়। এ বিষয়ে জ্ঞানের অভাবের জন্যেই 1912 খৃষ্টাব্দে স্কটের দক্ষিণ মেরু অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। অভিযানের সময়ে যে তরল জ্বালানী নেওয়া হয়েছিল, তা রাখা ছিল টিন দিয়ে ঝালাই করা পাত্রে। ভয়ানক তুষারপাতের সময়ে সাদা টিন ধূসর টিনের চূর্ণে পরিণত হয়েছিল এবং পাত্রের ঝালাই খুলে গিয়ে জ্বালানী পড়ে গিয়েছিল। সাদা টিনের ওপর ধূসর ছোপের আবির্ভাবকে যে টিন প্লেগ বলা হয়, তা নেহাৎ অকারণে নয়।

গন্ধকের মতন সাদা টিনও 13°C তাপমাত্রার অল্প নীচে ধূসর টিনে পরিণত হয়, যদি তার ওপর অল্প ধূসর টিনের চূর্ণ পড়ে।

একই পদার্থের বিভিন্ন রূপে অবস্থানের ক্ষমতা এবং তাদের পারস্পরিক রূপান্তরে বিলম্ব, প্রযুক্তিবিজ্ঞানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণ তাপমাত্রায় লোহা দেহকেন্দ্রিক ঘনকাকৃতি ল্যাটিস উৎপন্ন করে। লোহার পরমাণুগুলি থাকে ঘনকের কেন্দ্রে আর শীর্ষবিন্দুতে। প্রত্যেক পরমাণুর প্রতিবেশীর সংখ্যা আট। উচ্চ তাপমাত্রায় লোহার পরমাণুগুলি ঘনতর বিন্যাস গড়ে তোলে—যে বিন্যাসে প্রত্যেক পরমাণুর প্রতিবেশী সংখ্যা বারো। যে লোহায় প্রতি পরমাণু আট প্রতিবেশীযুক্ত, তা নরম; আর যে লোহায় ঐ প্রতিবেশীসংখ্যা বারো, তা শক্ত। দেখা গেছে যে, ঘরের উষ্ণতাতেও শেষোক্ত ধরনের লোহা পাওয়া যায়। যে পদ্ধতিতে তা হয়, ধাতুনিষ্কাশনবিদ্যায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত সেই পদ্ধতিকে বলে দৃঢ়ীকরণ (hardening)।

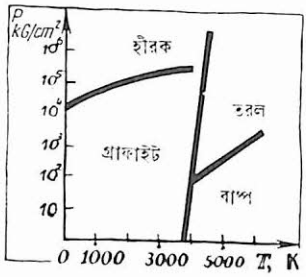
দৃঢ়ীকরণ পদ্ধতি খুব সরল—ধাতব বস্তুটিকে লোহিততপ্ত করে জলে বা তেলে নিক্ষেপ করা হয়। ফলে বস্তুটি এতো তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে যায় যে, উচ্চতর তাপমাত্রায় সুস্থিত গঠন আর বদ্‌লানোর সুযোগ পায় না। এই উচ্চতর তাপমাত্রার উপযুক্ত গঠন অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যেও সুদীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ থাকে; সুস্থিত গঠনের কেলাসে রূপান্তর ঘটে এতো ধীরে যে বাস্তবে বোঝাই যায় না।

লোহার দৃঢ়ীকরণ সম্পর্কে বলার সময়ে আমরা পুরোপুরি সঠিক কথা বলিনি। আসলে দৃঢ়ীকরণ করা হয় ইস্পাতকে, অর্থাৎ এমন লোহাকে যার মধ্যে শতাংশের কাছাকাছি কার্বন উপস্থিত থাকে। অতি সামান্য পরিমাণ কার্বন মেশানো থাকলে দৃঢ় লোহার নরম লোহায় রূপান্তর বিলম্বিত হয় এবং সহজতর হয় দৃঢ়ীকরণ পদ্ধতি। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ লোহাকে দৃঢ়ীকরণ করা সম্ভব নয়, কেননা অতি দ্রুত শীতল করলেও বিশুদ্ধ লোহা গঠন পরিবর্তনের জন্যে যথেষ্ট সময় পায়।

দশা লেখচিত্রের আকারের ওপর নির্ভর করে তাপমাত্রা বা চাপের পরিবর্তনের সাহায্যে প্রয়োজনীয় রূপান্তর ঘটানো সম্ভব।

শুধুমাত্র চাপ পরিবর্তিত করেও অনেক ক্ষেত্রে এক ধরনের কেলাসকে অন্য এক ধরনের কেলাসে রূপান্তরিত করা যায়। কালো ফস্‌ফরাসকে এইভাবেই পাওয়া গিয়েছিল।

একই সঙ্গে উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপের প্রভাবেই গ্রাফাইটকে হীরকে রূপান্তরিত করা যায়। চিত্র 4.13-তে কার্বনের দশা লেখচিত্র প্রদর্শিত হল। 10,000 বায়ুমণ্ডলীয় চাপের নীচে এবং 4000 K তাপমাত্রার কম উষ্ণতায় কার্বনের



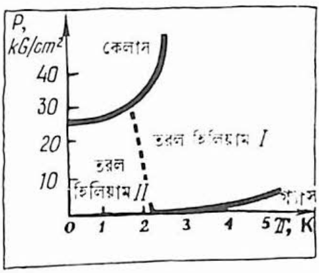
চিত্র 4.13

সুস্থিত রূপ গ্রাফাইট। সুতরাং সাধারণ অবস্থায় হীরকের উপস্থিতির অর্থ 'পরের রাজ্যে' বাস করা। তাই হীরককে গ্রাফাইটে রূপান্তরিত করা খুব বেশী শক্ত নয়। কিন্তু বিপরীত রূপান্তরই বেশী কৌতূহলোদ্দীপক। শুধুমাত্র চাপ বাড়িয়ে গ্রাফাইটকে হীরকে পরিবর্তিত করতে আমরা সফল হইনি। কঠিন অবস্থায় দশান্তর ঘটে খুবই ধীর গতিতে। দশা লেখচিত্রের আকার এক্ষেত্রে আমাদের সঠিক পথের সন্ধান দেয়ঃ গ্রাফাইটের ওপর চাপ বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রাও বাড়াতে হবে। তাহলে আমরা (চিত্রের ডানদিকের ওপরের অংশে) প্রথমে পাবো তরল কার্বন। এরপর একে উচ্চচাপ বজায় রেখে ধীরে ধীরে শীতল করলে, আমরা হীরকের অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারবো।

এই ধরনের পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ যে সম্ভব তা 1955 খৃষ্টাব্দে প্রমাণিত হয়েছে এবং বর্তমানে সমস্যাটিকে প্রযুক্তিগত দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে সমাধান করা সম্ভব হয়েছে।

আশ্চর্যজনক তরল (An Amaging Liquid) **:**

কোনো পদার্থের তাপমাত্রা কমাতে থাকলে, আগেই হোক আর পরেই হোক, শেষপর্যন্ত পদার্থটি কঠিনীভূত হয়ে কেলাস গঠন করবে। তাছাড়া এই শীতলীকরণ যে কোনো চাপেই করা হোক না কেন, শেষ ফলাফল একই হবে। আমরা যে সব ভৌত নিয়মের সঙ্গে ইতিমধ্যে পরিচিত হয়েছি সেগুলির আলোকে এই ধরনের পরিবর্তন সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। বস্তুতঃ তাপমাত্রা কমানোর অর্থ তাপীয় গতির হার কমিয়ে দেওয়া। যখন অণুগুলির গতি এতো কমে যাবে যে, পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার বলের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না, তখন সেগুলি একটি নির্দিষ্ট বিন্যাসে বিন্যস্ত হয়ে কেলাস গঠন করবে। আরও ঠাণ্ডা করতে থাকলে অণুগুলি ক্রমে ক্রমে তাদের সমস্ত গতিশক্তি হারাবে এবং পরম শূন্য তাপাঙ্কে আমরা আশা করবো এমন এক পদার্থ যার অণুগুলি সম্পূর্ণ নিশ্চল অবস্থায় নিয়মানুগ ল্যাটিস গঠনের মধ্যে বিন্যস্ত হয়ে আছে।



চিত্র 4.14

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, প্রায় সব পদার্থই ঐভাবে ব্যবহার করে। সব পদার্থ, শুধু একটি মাত্র অসাধারণ পদার্থ ছাড়া ; এই অসাধারণ পদার্থটি হিলিয়ম। আমরা ইতিমধ্যেই পাঠকদের হিলিয়ম সংক্রান্ত কয়েকটি তথ্য সরবরাহ করেছি। সংকট তাপমাত্রা বিষয়ে এর রেকর্ড আছে। অন্য কোনো পদার্থেরই 4·3 K-এর নীচে সংকট তাপমাত্রা হয় না। অবশ্য শুধু এই ধরনের রেকর্ড থাকাটা খুব একটা আশ্চর্যের কিছু নয়। আশ্চর্য হওয়ার আসল কারণটা একটু আলাদা ; হিলিয়ামকে সংকট তাপমাত্রার নীচে ঠাণ্ডা করে প্রায় পরম শূন্য তাপাঙ্কের কাছাকাছি নিয়ে এলেও কঠিন হিলিয়ম পাওয়া যায় না। এমনকি পরম শূন্য তাপমাত্রাতেও হিলিয়ম তরলই থাকে।

আমরা গতি সম্পর্কে যে সব নিয়ম আপনাদের আগে জানিয়েছি, সেগুলির আলোকে হিলিয়মের উপরোক্ত আচরণ কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যায় না এবং এই আচরণ প্রাকৃতিক নিয়মগুলির তথাকথিত সার্বজনীনতাও যে সীমাবদ্ধ হতে পারে তারই এক নিদর্শন।

আমরা জানি, কোনো পদার্থ তরল হলে তার অণু বা পরমাণুগুলি গতিশীল। কিন্তু তাকে পরম শূন্য তাপমাত্রায় ঠাণ্ডা করার অর্থ তার ভেতর থেকে সবটুকু গতিশক্তি কেড়ে নেওয়া। তাহলে মানতেই হবে যে হিলিয়ামের মধ্যে এমন এক গতিশক্তি আছে যাকে কেড়ে নেওয়া যায় না। এই সিদ্ধান্ত আমাদের এযাবৎ জানা বলবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গতিহীন। আমাদের পরিচিত বলবিদ্যা অনুযায়ী একটি বস্তুর গতিশক্তি সম্পূর্ণভাবে কেড়ে নিয়ে তাকে পুরোপুরি গতিহীন করে দেওয়া যায় ; অনুরূপভাবে শীতলীকরণের সাহায্যে অনুগুলির পাত্রের দেয়ালের সঙ্গে সংঘাতের ফলে সৃষ্ট শক্তি কেড়ে নিয়ে আণবিক গতিকেও পুরোপুরি স্তব্ধ করে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু এই বলবিদ্যা নিশ্চয়ই হিলিয়মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

হিলিয়মের এই অদ্ভুত আচরণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে

অঙ্গুলী নির্দেশ করে। এই প্রথম আমরা বুঝতে পারি যে, দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুর গতিসংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলবিদ্যার মৌলিক নিয়মাবলী, যাদের পদার্থবিদ্যার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হতো, পরমাণুদের জগতে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

পরম শূন্য তাপমাত্রাতেও হিলিয়মের কেলাসিত না হওয়ার ঘটনাকে, আমরা কোনো মতেই আমাদের এ যাবৎ জানা বলবিদ্যার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারি না। পরমাণুরা বলবিদ্যার নিয়ম মেনে চলে না, স্বীকার করে যে, যে স্ববিরোধিতার মধ্যে আমরা এই প্রথম এসে পড়লাম তা আসলে পদার্থবিদ্যায় আরও বেশী জাজ্বল্যমান অনেকগুলি স্ববিরোধিতার শৃঙ্খলের প্রথম গ্রন্থি।

এই সব স্ববিরোধিতার ফলে পারমাণবিক গতি সম্পর্কিত বলবিদ্যার ভিত্তি সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দিল। এই সংশোধন অত্যন্ত মৌলিক এবং তা প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের সমগ্র ধ্যানধারণাকে বদলাতে সাহায্য করেছে।

পারমাণবিক গতি সম্পর্কিত বলবিদ্যার ক্ষেত্রে মৌলিক সংশোধনের মানে এই নয় যে, আমরা যে বলবিদ্যার নিয়মগুলি এতদিন মেনে এসেছি তা ভুল বলে বিসর্জন দেবো। পাঠকদের অনাবশ্যক বিষয় শেখানো খুবই খারাপ। পুরোনো বলবিদ্যা বড় বস্তুর জগতে সম্পূর্ণ সঠিক। পদার্থবিদ্যার সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত। একই সঙ্গে মনে রাখা উচিত যে পুরোনো বলবিদ্যার অনেক নিয়ম অবিকৃতভাবে নতুন বলবিদ্যার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শক্তির অবিনশ্বরতা সূত্র এগুলির অন্যতম।

পরম শূন্য তাপমাত্রাতেও অনপনেয় শক্তির অস্তিত্ব একমাত্র হিলিয়মের বিশেষ ধর্ম নয়। দেখা গেছে যে, সব পদার্থেরই 'শূন্য' শক্তি আছে। শুধু হিলিয়মের ক্ষেত্রে এই শক্তির মান পরমাণুগুলিকে সুবিন্যস্ত কেলাস ল্যাটিস গঠনে বাধা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু তা বলে যেন ভাববেন না যে হিলিয়ম কঠিন কেলাসের আকারে থাকতে পারে না। হিলিয়মকে কেলাসিত করার জন্যে শুধু দরকার প্রায় 25 বায়ুমণ্ডলীর চাপের প্রয়োগ। উক্ত মাত্রার ওপরে চাপ রেখে শীতলীকরণ করলে সম্পূর্ণ সাধারণ ধর্মবিশিষ্ট কঠিন কেলাসিত হিলিয়ম পাওয়া যায়। হিলিয়মের কেলাস ল্যাটিসের গঠন তলকেন্দ্রিক ঘনকাকার।

হিলিয়মের দশা লেখচিত্র চিত্র 4.14-তে প্রদর্শিত হয়েছে। অন্য সব পদার্থের দশা লেখচিত্র থেকে এর অসাধারণ প্রভেদ এই যে, হিলিয়মের দশা লেখচিত্রে কোনো ত্রিদশা বিন্দু নেই। গলনাঙ্ক রেখা এবং স্ফুটনাঙ্ক রেখা পরস্পরকে ছেদ করে নি।

৫. দ্রবণ

দ্রবণ কি (What a Solution is) ঃ

ঝোলে নুন ঢেলে চামচ দিয়ে নাড়লে, খানিক পরে নুনের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভাববেন না যে, লবণ কণিকা খুব ছোট বলে খালি চোখে দেখা যাচ্ছে না। যে কোনো ভাবেই চেষ্টা করা হোক না কেন, ঝোলের মধ্যে লবণের একটি ক্ষুদ্র কণিকাকেও আবিষ্কার করা যাবে না, কেননা সেগুলি দ্রবীভূত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ঝোলের মধ্যে মরিচ গুঁড়ো ফেললে সেগুলি দ্রবীভূত হবে না। কয়েক দিন ধরে নাড়লেও ছোট ছোট কালো গুঁড়ো অদৃশ্য হবে না।

কিন্তু কোনো পদার্থ দ্রবীভূত হয়েছে বললে, ঠিক কি বোঝায় ? যে সব পরমাণু বা অণু পদার্থটি তৈরী করেছে, সেগুলি তো অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না, পারে কি ? নিশ্চয়ই পারে না আর হয়ও না। দ্রবীভূত করার সময়ে পদার্থটির শুধুমাত্র একটি বিশেষ রূপের দানা বা কেলাস, অর্থাৎ অণু বিন্যাসের একটি মাত্র বিশেষ রূপ অদৃশ্য হয়। দ্রাবণের অর্থ একটি মিশ্রণকে এমনভাবে আলোড়িত করা, যার ফলে এক ধরনের পদার্থের অণু আরেক ধরনের পদার্থের অণুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। 'দ্রবণ' বলতে বোঝায় বিভিন্ন পদার্থের অণু বা পরমাণুর মিশ্রণ।

দ্রবণের মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণ 'দ্রাব' (solute) দ্রবীভূত থাকতে পারে। দ্রবণের সংযুক্তি বোঝা যায় তার গাঢ়ত্ব থেকে ; যেমন, দ্রাবের গ্রামে প্রকাশিত মোট ওজন এবং দ্রবণের লিটারে প্রকাশিত মোট আয়তনের অনুপাত থেকে।

দ্রবণে দ্রাব যোগ করতে থাকলে দ্রবণের গাঢ়ত্ব ক্রমশঃ বাড়ে, কিন্তু তার একটি সীমা আছে। আগেই হোক আর পরেই হোক দ্রবণটি এক সময়ে সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে এবং আরও বেশী দ্রাব গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। সম্পৃক্ত দ্রবণের গাঢ়ত্বকে অর্থাৎ দ্রবণের সর্বোচ্চ সীমার গাঢ়ত্বকে বলে 'দ্রাব্যতা'।

গরম জলে বিস্ময়কর পরিমাণ চিনি দ্রবীভূত করা যায়। 80°C-এ এক গেলাস ভর্তি জল কোনো অবশিষ্ট না রেখে 720 গ্রাম চিনি দ্রবীভূত করতে পারে। এই সম্পৃক্ত দ্রবণ বেশ ঘন আর সান্দ্র। যাঁরা রান্নাবান্না করেন তাঁরা একে বলেন চিনির সিরাপ। উপরে আমরা চিনির ওজনের যে সংখ্যাটি ব্যবহার করেছি তা 0·2 লিটার আয়তনের পাত্র সম্পর্কে প্রযোজ্য। সুতরাং

80°C তাপমাত্রায় চিনির সম্পৃক্ত দ্রবণের গাঢ়ত্ব 3600 g l (যাকে পড়া হয় গ্রাম পার লিটার)।

অনেক পদার্থের দ্রাব্যতা তাপমাত্রার উপর খুব বেশী পরিমাণে নির্ভর করে। ঘরের উষ্ণতায় (20°C) চিনির দ্রাব্যতা কমে দাঁড়ায় 2000 g l। কিন্তু খাদ্য-লবণের দ্রাব্যতা তাপমাত্রা পরিবর্তনের সঙ্গে যৎসামান্য বদলায়।

জলে চিনি বা খাদ্যলবণ বেশ কিছু পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। কিন্তু ন্যাফ্‌থ্যালিন জলে প্রায় অদ্রাব্য। বিভিন্ন পদার্থ বিভিন্ন দ্রাবকে বিভিন্ন মাত্রায় দ্রবীভূত হয়।

এককেলাস গঠনের জন্য দ্রবণ ব্যবহৃত হয়। সম্পৃক্ত দ্রবণে দ্রাবের একটি ছোট কেলাস ঝুলিয়ে রাখলে, দ্রাবক যত বাষ্পায়িত হয়, ততই দ্রাব দ্রবণ থেকে পৃথক হয়ে কেলাসের বহির্তলে জমতে থাকে। তাছাড়া কেলাসের বহির্তলে এসে জমার সময়ে অণুগুলি নির্দিষ্ট বিন্যাসের শৃঙ্খলা মেনে চলে এবং তার ফলে ছোট কেলাসটি ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠে পরিণত হয় একটি এককেলাসে (monocrystal)।

তরল এবং গ্যাসের দ্রবণ (Solutions of Liquids and Gases) ঃ

একটি তরলকে কি অন্য একটি তরলের মধ্যে দ্রবীভূত করা সম্ভব ? নিশ্চয় সম্ভব। যেমন ভদ্‌কা জলে অ্যালকোহলের দ্রবণ (কিংবা অ্যালকোহলে জলের দ্রবণও বলতে পারেন—কি বলবেন সেটা নির্ভর করে কোনটি বেশী আছে তার ওপর)। ভদ্‌কা সত্যিকার দ্রবণ ; এর মধ্যে জল আর অ্যালকোহলের অণু সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিশে আছে।

অবশ্য দুটি তরল মেশালেই সবসময়ে এইরকম ফল হয় না।

জলে কেরোসিন ঢেলে মেশাবার চেষ্টা করুন। আপনি যেভাবেই মেশাবার চেষ্ট করুন না কেন, কিছুতেই এক সমসত্ত্ব মিশ্রণ তৈরী করতে পারবেন না। ঝোলে মরিচ দ্রবীভূত করার প্রয়াসের মতো আপনার এ চেষ্টাও ব্যর্থ হবে। যখনি আপনি আলোড়ন বন্ধ করবেন, তখনি তরল দুটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর তৈরী করবে ঃ ভারী জল আসবে তলায়, হাল্‌কা কেরোসিন উপরে। কেরোসিনের সঙ্গে জল আর অ্যালকোহলের সঙ্গে জল দ্রাব্যতার পরিপ্রেক্ষিতে বিপরীতধর্মী সমবায়।

অবশ্য মাঝামাঝি উদাহরণও আছে। জলের সঙ্গে ইথার মেশালে পাত্রে দুটি স্পষ্ট ভিন্ন ভিন্ন স্তর দেখা যাবে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, উপরের স্তরে ইথার আর নীচের স্তরে জল জমেছে। আসলে কিন্তু এই দুই স্তরেই আছে দ্রবণ ঃ নীচের স্তরে জলের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় আছে ইথারের একটি

অংশ (গাঢ়ত্ব প্রতি লিটার জলে 25 গ্রাম ইথার) এবং উপরের স্তরে ইথারের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় জল (গাঢ়ত্ব 60 g l)।

এবার গ্যাসীয় দ্রবণের বিষয়ে আসা যাক। স্পষ্টতঃ একটি গ্যাসের মধ্যে অন্য যে কোনো গ্যাস অসীম পরিমাণে দ্রবীভূত হতে পারে। দুটি গ্যাস সবসময়েই এমনভাবে মেশে যে একটির সব অণু অন্যের অণুর ঝাঁকের মধ্যে পুরোপুরি অনুপ্রবিষ্ট হয়। কেননা গ্যাস অণুর পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া খুব সামান্য আর তাই অন্য গ্যাসের উপস্থিতিতে কোনো গ্যাসের ব্যবহার প্রায় এমনি যে সে প্রতিবেশীর অস্তিত্ব সম্পর্কে নির্বিকার।

তরলে গ্যাসও দ্রবীভূত হতে পারে। অবশ্য অসীম পরিমাণে নয়, সীমাবদ্ধ পরিমাণে, ঠিক কঠিন পদার্থের মতই। তাছাড়া বিভিন্ন গ্যাস দ্রবীভূত হয় বিভিন্ন মাত্রায় এবং এই পার্থক্য বিরাটও হতে পারে। জলে বিপুল পরিমাণ অ্যামোনিয়া দ্রবীভূত হয় (আধ গেলাস জলে প্রায় 100 গ্রাম) এবং হাইড্রোজেন সালফাইড কিংবা কার্বনডাইঅক্সাইডও প্রচুর পরিমাণে। অক্সিজেন আর নাইট্রোজেনের জলে দ্রাব্যতা খুবই সামান্য (ঠাণ্ডা জলে যথাক্রমে 0·07 এবং 0·03 g/l)। অর্থাৎ শীতল জলে দ্রবীভূত মোট বায়ুর পরিমাণ এক গ্রামের এক শতাংশ মাত্র। কিন্তু এই সামান্য পরিমাণেরও পার্থিব জীবনের ওপর দারুণ প্রভাব আছে, কেননা মৎস্য জাতীয় প্রাণীরা এই দ্রবীভূত অক্সিজেনকেই শ্বাসকার্যের জন্য ব্যবহার করে।

চাপ যত বাড়ে, গ্যাসও তত বেশী পরিমাণে তরলে দ্রবীভূত হয়। দ্রবীভূত গ্যাসের পরিমাণ খুব বেশী না হলে, এই পরিমাণ তরলতলের উপরকার গ্যাসের চাপের সঙ্গে সমানুপাতিক থাকে।

কে আর সোডা-লেমোনেড খেয়ে তেষ্টা মিটায় নি বলুন! চাপের উপর দ্রবীভূত গ্যাস পরিমাণের নির্ভরশীলতার ভিত্তিতেই সোডা তৈরী করা হয়। উচ্চচাপে কার্বনডাইঅক্সাইডকে চালনা করা হয় জলের মধ্যে (সোডা বিক্রয়ের দোকানে রাখা গ্যাস সিলিণ্ডার থেকে)। সোডা গেলাসে ঢাললে, চাপ কমে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমান হয় আর জল থেকে বাড়তি গ্যাস বেরোতে থাকে বুদবুদের আকারে।

উপরোক্ত কারণেই গভীর জলের ডুবুরীর পক্ষে হঠাৎ গভীর জল ছেড়ে উপরে ওঠা উচিত নয়। গভীর জলের উচ্চচাপের জন্য ডুবুরীর রক্তে বাড়তি বাতাস দ্রবীভূত হয়। ওঠার সময়ে হঠাৎ চাপ কমে বাড়তি বাতাস বুদবুদের আকারে বেরোয় আর তা ধমনীর মধ্যে রক্ত চলাচল বন্ধ করে দেয়।

কঠিন দ্রবণ (Solid Solutions) ঃ

সাধারণতঃ আমরা তরলের ক্ষেত্রেই 'দ্রবণ' শব্দটি ব্যবহার করি। কিন্তু এমন কঠিন মিশ্রণও আছে যার মধ্যে পরমাণু আর অণু মেশানো থাকে সমসত্ত্বভাবে। কঠিন দ্রবণ কি করে তৈরী করা হয়? খল-নুড়ি দিয়ে বেটে আপনি তা করতে পারবেন না। আপনাকে প্রথমে কঠিন দুটি পদার্থকেই তরলে পরিণত করতে হবে, অর্থাৎ গলাতে হবে; তারপর তরল দুটি মিশিয়ে অপেক্ষা করতে হবে কঠিনীভূত হবার জন্য। অন্যভাবেও চেষ্টা করা যেতে পারে ঃ কোনো উপযুক্ত তরলে কঠিন দুটি দ্রবীভূত করার পর বাষ্পায়নের সাহায্যে দ্রাবককে দূরীভূত করে। উপরোক্ত উপায়গুলি অনুসরণ করলে কঠিন দ্রবণ পাওয়া যেতে পারে। পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। কঠিন দ্রবণ দুর্লভ। নোনা জলে চিনি ফেললে, তা অনায়াসেই দ্রবীভূত হবে। কিন্তু জলকে বাষ্পায়িত করুন ঃ কাপের তলায় দেখতে পাবেন চিনি আর নুনের খুব ছোট আলাদা আলাদা কেলাস। চিনি আর নুনের কঠিন দ্রবণ দেখতে পাবেন না।

বিস্‌মাথ আর ক্যাড্‌মিয়মকে একই মুচিতে গলাতে পারেন। ঠাণ্ডা করার পর অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে, পাশাপাশি বিস্‌মাথ আর ক্যাডমিয়মের আলাদা আলাদা কেলাস দেখতে পাবেন। বিস্‌মাথ আর ক্যাড্‌মিয়মও কঠিন দ্রবণ তৈরী করে না।

কঠিন দ্রবণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে, একমাত্র না হলেও একটি প্রয়োজনীয় শর্ত, মিশ্রিত দুটি পদার্থের অণু বা পরমাণুর আকার আর আয়তনের দিক থেকে পরস্পর আসক্তি! অনুরূপ ক্ষেত্রে গলিত মিশ্রণটি হিমায়িত করলে শুধু এক ধরনের কেলাস দেখতে পাওয়া যাবে। কেলাসের ল্যাটিস বিন্দুগুলিতে সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যাবে বিশৃঙ্খলভাবে মেশানো পদার্থ-দুটির যে কোনো একটির পরমাণু (বা অণু)।

প্রযুক্তিবিজ্ঞানে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ধাতুসংকরগুলি সাধারণতঃ কঠিন দ্রবণ। সামান্য পরিমাণ দ্রবীভূত পদার্থও মূলগতভাবে ধাতুর ধর্ম বদলে দিতে পারে। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রযুক্তিবিজ্ঞানে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একটি বস্তু—ইস্পাত। ইস্পাত লৌহের মধ্যে দ্রবীভূত সামান্য পরিমাণ কার্বনের (ওজনের হিসাবে প্রায় 0·5%, অর্থাৎ 40টি লৌহ পরমাণু পিছু একটি কার্বন পরমাণু) এক কঠিন দ্রবণ, যাতে কার্বন পরমাণুগুলিকে লৌহপরমাণুগুলির মধ্যে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

লোহার মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক কার্বন পরমাণু দ্রবীভূত থাকে। কিন্তু যে কোনো অনুপাতে মিশিয়েও কতকগুলি কঠিন দ্রবণ প্রস্তুত করা যায়। সোনা আর

তামার ধাতুসংকরকে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়। সোনা আর তামা দুয়েরই কেলাস-ল্যাটিস একধরনের—তলকেন্দ্রিক ঘনকাকৃতি। তামা আর সোনার ধাতুসংকরের ল্যাটিসও একই রকম দেখতে। তামা-সোনার ধাতুসংকরে তামার অনুপাত ক্রমশঃ বাড়ালে ল্যাটিসে সোনার পরমাণুর জায়গাগুলি ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে তামার পরমাণু দ্বারা অধিকৃত হবে। তাছাড়া এই ধরনের প্রতিস্থাপন ঘটবে এলোমেলোভাবে, তামার পরমাণুগুলি ল্যাটিস বিন্দুগুলিতে বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ানো থাকবে।

তামা আর সোনার ধাতুসংকরকে বলা চলে প্রতিস্থাপনের দ্রবণ ঃ কিন্তু ইস্পাতের প্রকৃতি অন্যরকম, তাকে বলা চলে অনুপ্রবেশের দ্রবণ।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে কঠিন দ্রবণ প্রস্তুত করা সম্ভব হয় না, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ঠাণ্ডা করার পরে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে এই সব ক্ষেত্রে উভয় পদার্থের অতিক্ষুদ্র কেলাসকে পাশাপাশি অবস্থান করতে দেখা যায়।

কি করে দ্রবণ হিমীভূত হয় (How Solutions Freeze) ঃ

যে কোনো লবণের জলীয় দ্রবণ নিয়ে শীতল করতে থাকলে, দেখা যায় যে হিমাঙ্ক নীচে নেমে গেছে। শূন্য ডিগ্রী পার হয়ে যায়, তবু দ্রবণটি কঠিনে পরিণত হয় না। তাপমাত্রাকে শূন্য ডিগ্রীর বেশ কিছু নীচে নামাবার পরই একমাত্র দেখা যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেলাস আবির্ভূত হচ্ছে। কেলাসগুলি বরফের ছোট ছোট কেলাস ঃ লবণ কঠিন বরফে দ্রবীভূত হয় না।

দ্রবণের গাঢ়ত্বের ওপর তার হিমাঙ্ক নির্ভর করে। দ্রবণের গাঢ়ত্ব বাড়ালে তার হিমাঙ্ক কমে। সম্পৃক্ত দ্রবণের হিমাঙ্ক সবচেয়ে কম। দ্রবণের হিমাঙ্কের অবনয়নের মান মোটেই কম নয় ঃ খাদ্যলবণের সম্পৃক্ত দ্রবণ $-21°C$ তাপমাত্রায় হিমীভূত হয়। অন্যান্য লবণের সাহায্যে আমরা তাপমাত্রাকে আরও অবনমিত করতে পারি ; যেমন ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড ব্যবহার করে আমরা দ্রবণের হিমাঙ্ককে $-55°C$ পর্যন্ত নামাতে পারি।

এবার হিমায়ন প্রক্রিয়া কিভাবে ঘটে, তা বিবেচনা করা যাক। কোনো দ্রবণ থেকে প্রথম বরফ কেলাসটি পৃথক হওয়ার পর দ্রবণটির গাঢ়ত্ব বেড়ে যায়। যেহেতু দ্রবণে দ্রাব অণুর অনুপাত বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে জলের কেলাসিত হওয়ার পথে বাধা এবং কমে দ্রবণের হিমাঙ্ক। তাপমাত্রা আরো না কমালে, কেলাসন বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তাপমাত্রা আরো কমাতে থাকলে জলের (বা অন্য দ্রাবকের) ছোট ছোট কেলাস ক্রমাগত আলাদা হতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত দ্রবণটি সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে। এরপর দ্রবণে দ্রাব্যের পরিমাণ আরো বাড়ানো অসম্ভব হয়ে ওঠে এবং দ্রবণটি একসঙ্গে কঠিনীভূত হয় ; তাছাড়া এই হিমীভূত দ্রবণকে অণুবীক্ষণ

যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলে দেখা যায় অতিক্ষুদ্র বরফ কেলাসের পাশাপাশি অতিক্ষুদ্র লবণ কেলাস।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, দ্রবণের হিমায়ন তরলের হিমায়ন থেকে আলাদা। হিমায়ন প্রক্রিয়া একটি বিস্তৃত তাপমাত্রা অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকে।

হিমীভূত বস্তুর বহির্তলে লবণ ছড়িয়ে দিলে কি ঘটবে? রেলইয়ার্ড কর্মীরা প্রশ্নটির উত্তর জানেন—লবণ বরফের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে গলতে আরম্ভ করে। অবশ্য এই প্রক্রিয়া একমাত্র তখনই ঘটা সম্ভব যখন লবণের সম্পৃক্ত দ্রবণের হিমাঙ্ক বায়ুতাপমাত্রার চেয়ে কম হয়। যদি এই শর্ত পূরিত হয়, তাহলে বরফ আর লবণ মিশ্রণের আবির্ভাব ঘটছে অন্যের দশা অঞ্চলে, অর্থাৎ দ্রবণের সুস্থিত অঞ্চলে। সুতরাং বরফ আর লবণের মিশ্রণ দ্রবণে পরিণত হবে, অর্থাৎ বরফ গলে জলে পরিণত হবে আর সেই জলে দ্রবীভূত হবে লবণ। শেষপর্যন্ত হয় সব বরফটুকু গলে যাবে, কিংবা এমন গাঢ়ত্বের দ্রবণ উৎপন্ন হবে যার গলনাঙ্ক পরিবেশের তাপমাত্রার সমান।

ধরুন 100 m^2 ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট কোনো রেলইয়ার্ড 1 cm পুরু বরফের আস্তরণে ঢাকা পড়েছে। জমা বরফের পরিমাণ কিন্তু মোটেই নগণ্য নয়, প্রায় এক টনের মতো। এবার হিসেব করা যাক, বায়ুতাপমাত্রা $-3°C$ হলে, জমা বরফ গলাবার জন্যে কতখানি লবণের প্রয়োজন হবে। উপরোক্ত তাপমাত্রার সমান মানের হিমাঙ্ক যে লবণ দ্রবণের তার গাঢ়ত্ব 45 g/l। এক লিটার জল জমে এক কিলোগ্রাম বরফের কাছাকাছি হয়। সুতরাং এক টন বরফকে $-3°C$ তাপমাত্রায় গলাতে দরকার লাগবে 45 কিলোগ্রাম লবণের। অবশ্য বাস্তবে অনেক কম লবণ ব্যবহৃত হয়, কেননা পুরোপুরি সবটুকু বরফ গলাবার চেষ্টা কেউ করে না।

লবণের সঙ্গে বরফ মেশালে বরফ গলে জলে পরিণত হয় আর সেই জলে দ্রবীভূত হয় লবণ। কিন্তু গলনের জন্য উত্তাপের প্রয়োজন আর বরফ এই প্রয়োজনীয় উত্তাপ সংগ্রহ করে তার পরিবেশ থেকে। তাই বরফে লবণ যোগ করলে তাপমাত্রা কমে।

এখন আমরা সাধারণতঃ বাজার থেকে আইসক্রীম কিনি, কিন্তু আগেকার দিনে আইসক্রীম শুধু বাড়ীতেই তৈরী করা হতো। এজন্য শীতক হিসেবে ব্যবহার করা হতো লবণ আর জলের মিশ্রণকে।

দ্রবণের স্ফুটন (Boiling of Solutions) ঃ

দ্রবণের স্ফুটনের সঙ্গে তার হিমায়নের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে।

দ্রাবের উপস্থিতি কেলাসন প্রক্রিয়ায় বাধা দেয়। একই কারণে দ্রাবক স্ফুটনকেও বাধা দেয়। উভয় ক্ষেত্রেই মনে হয় যেন বাইরের অণুগুলি দ্রবণকে যতদূর সম্ভব

লঘু অবস্থায় রাখার জন্যে লড়াই চালাচ্ছে। অন্যভাবে বলা যায় যে, বাইরের অণুগুলি মূল বস্তুটির সেই দশাকে স্থিতিশীল করতে চায় যা তাদের দ্রবীভূত অবস্থায় রাখতে সক্ষম (অর্থাৎ মূল বস্তুটির অস্তিত্বকে সাহায্য করে)।

এজন্যই বাইরের অণু তরলের কেলাসনকে বিলম্বিত করে এবং গলনাঙ্ককে নীচে নামিয়ে আনে। একই কারণে তারা স্ফুটনকে বাধা দেয় এবং স্ফুটনাঙ্ককে উঁচুতে তোলে।

মজার ব্যাপার এই যে, গাঢ়ত্বের এক নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত (খুব গাঢ় দ্রবণের ক্ষেত্র ছাড়া) দ্রবণের গলনাঙ্কের অবনয়ন কিংবা স্ফুটনাঙ্কের বৃদ্ধি দ্রাবের ধর্মের উপর প্রায় নির্ভর করে না, কিন্তু নির্ধারিত হয় শুধুমাত্র দ্রাব অণুর সংখ্যা দিয়ে। এই কৌতূহলোদ্দীপক প্রক্রিয়াকে তাই দ্রবীভূত পদার্থের আণবিক ভর নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করা হয়। এজন্য ব্যবহৃত হয় এমন একটি বহুল প্রচলিত সমীকরণ (এখানে আমরা তা দিচ্ছি না) যা গলনাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্কের পরিবর্তনকে দ্রবণের একক আয়তনে উপস্থিত অণুসংখ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত করেছে।

জলের স্ফুটনাঙ্ক বৃদ্ধির হার তার গলনাঙ্ক হ্রাসের হারের তুলনায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। যেমন প্রায় 3·5% লবণযুক্ত সমুদ্রের জলের স্ফুটনাঙ্ক 100·6°C, যদিও তার গলনাঙ্ক হ্রাসের মাত্রা 2°C।

যদি কোনো তরল অন্য একটির তুলনায় উচ্চতর তাপমাত্রায় ফোটে তাহলে (একই তাপমাত্রায়) তার বাষ্প চাপ কম। সুতরাং দ্রবণের বাষ্পচাপ স্পষ্টতঃ বিশুদ্ধ দ্রাবকের বাষ্পচাপের চেয়ে কম। নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান থেকে বিষয়টি স্পষ্টতর হবে ঃ জলীয় বাষ্পের চাপ 20°C তাপমাত্রায় 17·5 mm Hg কিন্তু একই তাপমাত্রায় খাদ্যলবণে সম্পৃক্ত জলীয় দ্রবণের চাপ 13·2 mm Hg।

15 mm পারদচাপযুক্ত বাষ্প জলের ক্ষেত্রে অসম্পৃক্ত কিন্তু খাদ্যলবণের সম্পৃক্ত জলীয় দ্রবণের ক্ষেত্রে অতিসম্পৃক্ত। এই ধরনের দ্রবণের উপস্থিতিতে বাষ্প ঘনীভূত হয়ে দ্রবণের সঙ্গে যুক্ত হবার চেষ্টা করবে। অবশ্য শুধুমাত্র খাদ্যলবণের দ্রবণই নয়, খাদ্যলবণ চূর্ণও এইভাবে বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প গ্রহণ করবে। বস্তুতঃ খাদ্যলবণের উপর প্রথম যে জলবিন্দু পড়বে, সেটিই পর্যাপ্ত পরিমাণ লবণকে দ্রবীভূত করে সম্পৃক্ত দ্রবণ গড়ে তুলবে।

খাদ্যলবণের দ্বারা বায়ু থেকে জলীয় বাষ্প শোষিত হয় বলে খাদ্যলবণ ভিজে যায়। নিমন্ত্রণকর্তারা ব্যাপারটা ভালোভাবেই জানেন, কেননা মধ্যে মধ্যে তাঁদের এজন্য বিব্রত হতে হয়। কিন্তু দ্রবণের উপস্থিতিতে বাষ্পচাপের হ্রাস সুবিধাও করতে পারে ঃ বায়ু শুষ্ক করার ল্যাবরেটরি পদ্ধতিতে উপরোক্ত

প্রক্রিয়ার সুযোগ গ্রহণ করা যায়। সেক্ষেত্রে বায়ুকে চালিত করা হয় ক্যালসিয়ম ক্লোরাইডের ভিতর দিয়ে, জলীয় বাষ্প মুক্ত করার বিষয়ে যার ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য। যেখানে সোডিয়ম ক্লোরাইডের সম্পৃক্ত লবণের বাষ্পচাপ 13·2 mm Hg, ক্যালসিয়ম ক্লোরাইডের মাত্র 5·6 mm Hg। বায়ুকে যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়ম ক্লোরাইডের ভিতর দিয়ে চালনা করলে বাষ্পচাপ কমে উপরোক্ত মানে পৌঁছবে (1 kg ক্যালসিয়ম ক্লোরাইডের মধ্যে প্রায় 1 kg জল শোষণ করার মতো 'জায়গা' থাকে)। বাষ্পচাপের ঐ মান এতোই নগণ্য যে প্রাপ্ত বায়ুকে শুষ্ক বায়ু হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

কি করে লবণকে অশুদ্ধিমুক্ত করা হয় (How Liquids are freed of Admixtures) ঃ

তরলকে অশুদ্ধিমুক্ত করার জন্যে প্রচলিত গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে পাতন প্রণালী অন্যতম। এই পদ্ধতিতে তরলকে ফুটিয়ে উৎপন্ন বাষ্পকে শীতকের মধ্যে চালনা করা হয়। শীতল হবার পর বাষ্প আবার তরলে পরিণত হয়, কিন্তু এই তরল প্রারম্ভিক তরলের তুলনায় অনেক বেশী বিশুদ্ধ।

পাতনের সাহায্যে তরলকে দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ থেকে মুক্ত করা খুব সহজ। এই ধরনের অশুদ্ধির অণু জলীয় বাষ্পের মধ্যে থাকে না বললেই চলে। এইভাবেই প্রস্তুত করা হয় পাতিত জল—খনিজ অশুদ্ধি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, বিস্বাদ বিশুদ্ধ জল।

অবশ্য বাষ্পায়নের সাহায্য গ্রহণ করেও আমরা তরল অশুদ্ধি দূর করতে পারি এবং পৃথক করতে পারি দুই বা ততোধিক তরলের মিশ্রণকে। এক্ষেত্রে মিশ্রণের উপাদান তরল দুটির স্ফুটন সমান সহজে হয় না, এই বৈষম্যই পৃথকীকরণের ভিত্তি।

এবার দেখা যাক সমায়তনে মিশ্রিত দুটি তরলের মিশ্রণ, যেমন জলের আর ইথাইল অ্যালকোহলের (100 প্রুফ ভদ্‌কা) মিশ্রণ, স্ফুটনের সময় কিভাবে ব্যবহার করে।

প্রমাণ চাপে জল 100°C এবং অ্যালকোহল 78°C-এ ফোটে। আলোচ্য মিশ্রণটি মাঝামাঝি তাপমাত্রায়, যেমন 81·2°C তাপমাত্রায় ফুটবে। অ্যালকোহল বেশী সহজে ফোটে, সুতরাং তার বাষ্পচাপ বেশী হয় এবং 50% অ্যালকোহল আছে এমন তরল মিশ্রণ প্রাথমিকভাবে যে বাষ্প উৎপন্ন করে তার মধ্যে 80% অ্যালকোহল থাকে।

এইভাবে যে বাষ্প পাওয়া যায় তাকে শীতকে পাঠিয়ে আমরা এমন তরল প্রস্তুত করতে পারি যার মধ্যে অ্যালকোহলের পরিমাণ আগের চেয়ে বেশী। পদ্ধতিটির পুনরাবৃত্তিও করা চলে। অবশ্য সহজেই বোঝা যায় যে, পদ্ধতিটি বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়, কেননা প্রতিবার পাতনের ফলে তরলের পরিমাণ অল্প থেকে অল্পতর হয়ে ওঠে। এইভাবে তরলের অপচয় যাতে না ঘটে সেজন্য তথাকথিত আংশিক পাতন স্তম্ভ (fractionating column) ব্যবহার করে তরলকে বিশুদ্ধ করা হয়।

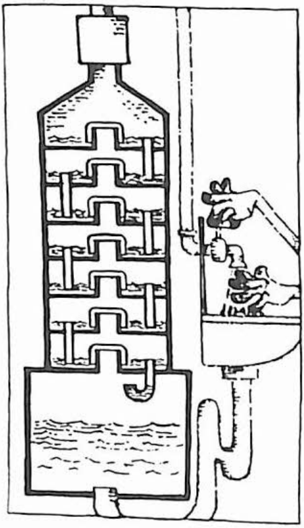
আংশিক পাতন স্তম্ভের গঠন আর কার্যপ্রণালীর ভিত্তি নিম্নরূপ। একটি উল্লম্ব স্তম্ভ কল্পনা করে নিন যার নিম্নাংশে তরল মিশ্রণটি রাখা আছে। স্তম্ভটির নীচের দিকে উত্তাপ দেওয়ার আর উপরের দিকে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা আছে। স্ফুটনের ফলে নির্গত বাষ্প উপরে উঠে ঘণীভূত হয় এবং উৎপন্ন তরল নীচের দিকে নামতে থাকে। নির্দিষ্ট পরিমাণ উত্তাপ নীচের দিকে প্রয়োগ এবং উপরের দিকে অপসারণ করে আবদ্ধ স্তম্ভটির মধ্যে উর্ধ্বগামী বাষ্প এবং নিম্নগামী তরলের বিপরীতমুখী স্রোতধারার সৃষ্টি করা হয়।

এবার স্তম্ভটির মধ্যে একটি আনুভূমিক প্রস্থচ্ছেদ বিবেচনা করা যাক। এই প্রস্থচ্ছেদের ভিতর দিয়ে তরল নীচের দিকে এবং বাষ্প উপরের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে ; তাছাড়া তরল মিশ্রণের সংগঠক কোনো পদার্থই অবশিষ্ট থাকছে না। যদি আমরা অ্যালকোহল আর জলের মিশ্রণ আছে এমন কোনো স্তম্ভ বিবেচনা করি, তাহলে তার ভিতর দিয়ে উর্ধ্বগামী আর নিম্নগামী অ্যালকোহলের পরিমাণ কিংবা উর্ধ্বগামী আর নিম্নগামী জলের পরিমাণ সমান হবে।

যেহেতু তরল নীচে নামছে আর বাষ্প উপরে উঠছে, সুতরাং তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, স্তম্ভের যে কোনো উচ্চতায় তরল আর বাষ্পের সংযুতি অভিন্ন।

কিন্তু একটু আগেই ব্যাখ্যা করে বোঝানো হয়েছে যে, দুটি পদার্থের মিশ্রণের ক্ষেত্রে বাষ্প আর তরলের সাম্যাবস্থার জন্য প্রয়োজন এই দুইটি দশার অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলির অনুপাতে বিভিন্নতা। তাই স্তম্ভের সব উচ্চতাতেই বাষ্পের তরলে এবং তরলের বাষ্পে রূপান্তর ঘটতে থাকবে। তাছাড়া বেশী স্ফুটনাংক বিশিষ্ট উপাদানের ঘনীভবন এবং কম স্ফুটনাংক বিশিষ্ট উপাদানের তরল থেকে বাষ্পে রূপান্তর ঘটবে।

সুতরাং মোটের উপর দেখা যাবে যে, উর্ধ্বগামী বাষ্প নিম্ন স্ফুটনাংক বিশিষ্ট উপাদানকে সঙ্গে টেনে নিচ্ছে এবং নিম্নগামী তরল ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে উর্ধ্বতর স্ফুটনাংক বিশিষ্ট উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। ফলে বিভিন্ন উচ্চতায় মিশ্রণে উপস্থিত উপাদানগুলির অনুপাত বিভিন্ন হয়ে উঠবে ঃ উচ্চতা যত বেশী হবে



চিত্র 5.1

মিশ্রণে উপস্থিত নিম্ন স্ফুটনাঙ্কবিশিষ্ট উপাদানের অনুপাত ততই বাড়বে]। আদর্শ ক্ষেত্রে একদম উপরে পাওয়া যাবে নিম্নস্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট উপাদানের একটি বিশুদ্ধ স্তর এবং একদম নীচে ঊর্ধ্বস্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট উপাদানের একটি বিশিষ্ট স্তর।

উপর থেকে নিম্নস্ফুটনাঙ্কবিশিষ্ট উপাদানকে এবং নীচ থেকে ঊর্ধ্বস্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট উপাদানকে এরপর ধীরে ধীরে অপসারিত করা হবে যাতে আদর্শ অবস্থা বিপন্ন না হয়।

এই পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া বা রেক্‌টিফিকেশন (rectification) বাস্তবায়িত করার জন্য তরল আর গ্যাসের বিপরীতমুখী স্রোতকে নিবিড়ভাবে পরস্পরমিশ্রিত করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। এজন্য স্তম্ভের ভিতর অনেকগুলি প্লেটকে একের উপর আরেকটি সাজিয়ে এবং উপছে পড়ার নল (overflow pipe) দ্বারা সংযুক্ত করে, বাষ্প আর তরল স্রোতের প্রবাহের পথে বাধার সৃষ্টি করা হয়। কোনো প্লেট অতিরিক্ত ভরে গেলে তরল প্রবাহিত হয়ে নীচের প্লেটে চলে আসে। ঊর্ধ্বগামী বাষ্প (0·3—1 m/s) তরলের অগভীর স্তর ভেদ করে উপরে ওঠে। স্তরের কাঠামো চিত্র 5·1-এ প্রদর্শিত হল।

উপরোক্ত উপায়ে সবসময়ে তরলকে সম্পূর্ণ অশুদ্ধি মুক্ত করা যায় না। কতকগুলি মিশ্রণের ক্ষেত্রে এক ধরনের 'অস্বস্তিকর' ধর্ম দেখতে পাওয়া যায়ঃ

এদের এমন এক নির্দিষ্ট সংযুতি (composition) থাকে, যে সংযুতিতে বাষ্পায়িত অণুগুলির মধ্যে উপাদানগুলির অনুপাতকে তরলের মধ্যে উপস্থিত উপাদানগুলির অনুপাতের সমান থাকতে দেখা যায়। স্পষ্টতঃ এই সব ক্ষেত্রে উপরোক্ত উপায়ে মিশ্রণকে তার নির্দিষ্ট সংযুতির চেয়ে বেশী বিশুদ্ধ করা সম্ভব নয়। এই ধরনের মিশ্রণের এক উদাহরণ 4% জল এবং 96% অ্যালকোহলের মিশ্রণ। পূর্বোক্ত উপায়ে পৃথকীকরণের চেষ্টা করলে আমরা সর্বোচ্চ 96% গাঢ় অ্যালকোহল পেতে পারি।

রাসায়নিক প্রযুক্তিবিজ্ঞানে তরলের আংশিক পাতন বা রেকটিফিকেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী। যেমন, খনিজ তেল থেকে এই আংশিক পাতন প্রণালীর সাহায্যেই গ্যাসোলিন প্রস্তুত করা হয়।

মজার কথা এই যে, অক্সিজেন প্রস্তুত করার সবচেয়ে সস্তা পদ্ধতি এই আংশিক পাতন প্রণালী। অবশ্য তা করতে হলে প্রথমে বায়ুকে তরলীভূত করার প্রয়োজন। পরে এই তরলীভূত বায়ুকে আংশিক পাতনের সাহায্যে পৃথক করলে প্রায় বিশুদ্ধ অবস্থায় নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন পাওয়া যাবে।

কঠিনের বিশুদ্ধীকরণ (Purification of solids) :

কোনো রাসায়নিক যৌগের প্যাকেটের দিকে লক্ষ্য করলে যৌগটির নামের সঙ্গে 'বিশুদ্ধ', 'রাসায়নিক বিশ্লেষণের পক্ষে বিশুদ্ধ', 'বর্ণালীবীক্ষণভিত্তিক বিশুদ্ধ' ইত্যাদি বিশেষণ সংযুক্ত থাকতে দেখা যায়। এই বিশেষণগুলি বিশুদ্ধতার মাত্রা নির্দেশ করে : 'বিশুদ্ধ' মানে তুলনামূলকভাবে নিম্নমানের বিশুদ্ধতা— যার মধ্যে 1% পর্যন্ত অশুদ্ধি থাকতে পারে ; 'বিশ্লেষণের পক্ষে বিশুদ্ধ' মানে অশুদ্ধির পরিমাণ সর্বোচ্চ 0·1% ; 'বর্ণালীবীক্ষণভিত্তিক বিশুদ্ধ' সহজে প্রস্তুত করা সম্ভব নয়, কেননা বর্ণালীবীক্ষণের সাহায্যে শতকরা এক ভাগের সহস্রাংশ পর্যন্ত অশুদ্ধির উপস্থিতি সনাক্ত করা যায়। 'বর্ণালীবীক্ষণভিত্তিক বিশুদ্ধ' ছাপ থাকলে আমরা নিশ্চিন্ত হই যে পদার্থটির বিশুদ্ধতা কমপক্ষে 'চার নয়' মানের, অর্থাৎ 99·99%-এর বেশী।

বিশুদ্ধ কঠিনের ব্যাপক চাহিদা আছে। এক শতাংশের হাজার ভাগের এক ভাগ অশুদ্ধিও অনেক ভৌতধর্ম বদলে দিতে পারে এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানে, যেমন অর্ধপরিবাহী প্রস্তুতির সমস্যা সমাধানে, প্রযুক্তিবিদ্‌দের প্রয়োজন হয় 'সাত নয়ের' বিশুদ্ধতা। অর্থাৎ এক কোটি প্রয়োজনীয় পরমাণুর মধ্যে একটিমাত্র অপ্রয়োজনীয় পরমাণুর উপস্থিতিও প্রযুক্তিগত সমস্যা সমাধানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই ধরনের অতিবিশুদ্ধ পদার্থ প্রস্তুত করার জন্য আমরা বিশেষ পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করি।

অতিবিশুদ্ধ জারমেনিয়ম এবং সিলিকন (এ দুটি অর্ধপরিবাহী জগতের প্রতিনিধিস্থানীয়) প্রস্তুত করা যায় গলিত পদার্থ থেকে একটি বর্ধিষ্ণু কেলাসকে আস্তে আস্তে উপরে টেনে তুলে। একটি দণ্ডের মাথায় বীজ কেলাস আটকে দণ্ডটিকে গলিত সিলিকনের (কিংবা জারমেনিয়মের) বহির্তলের সংস্পর্শে আনা হয়। তারপর দণ্ডটিকে ধীরে ধীরে উপরে তোলা হয়। ফলে গলিত পদার্থ থেকে যে কেলাসটি বাইরে বেরিয়ে আসে তার মধ্যে আসল পদার্থটির পরমাণু বিন্যস্ত হয় এবং অশুদ্ধির পরমাণুগুলি পড়ে থাকে গলিত অবশিষ্টাংশের মধ্যে।

তথাকথিত 'আঞ্চলিক পরিশুদ্ধিকরণ' (zonal refining) প্রণালী আরও বেশী প্রচলিত এক প্রণালী। এই প্রণালীতে যে পদার্থটিকে বিশুদ্ধ করতে হবে সেটিকে প্রথমে একটি কয়েক মিলিমিটার ব্যাসযুক্ত দণ্ডে পরিণত করা হয়। তারপর সেই দণ্ডটিকে পরিবেষ্টন করে একটি ছোট চোঙাকৃতি চুল্লী জ্বালানো হয়। চুল্লীটির তাপমাত্রা ধাতুটিকে গলানোর পক্ষে পর্যাপ্ত রাখা হয় এবং তার ফলে ধাতুদণ্ডের যে অংশটি চুল্লীর ভিতরে থাকে তা গলে যায়। ফলে দণ্ড বরাবর গলিত ধাতুর একটি অঞ্চল নীচে নামতে থাকে।

সাধারণতঃ অশুদ্ধির পরমাণুগুলি কঠিন অপেক্ষা তরলে বেশী পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। সেজন্য গলিত অঞ্চলের কাছে অশুদ্ধির পরমাণুগুলি কঠিন অংশ ছেড়ে তরল অংশে চলে আসতে থাকে এবং ফিরে যেতে চায় না। এ যেন প্রবাহমান তরলের এক অঞ্চল অশুদ্ধির পরমাণুগুলিকে টেনে বার করে নিচ্ছে। দণ্ডটির বিপরীত দিকে গতির সময়ে চুল্লীটিকে বন্ধ রাখা হয় এবং দণ্ড বরাবর গলিত অঞ্চলটিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার প্রণালীর বেশ অনেকবার পুনরাবৃত্তি করা হয়। অনেকবার পুনরাবৃত্তি ঘটানোর পরে শেষপর্যন্ত অশুদ্ধিযুক্ত প্রান্তটিকে কেটে বাদ দেওয়া হয়। এইভাবে অতিবিশুদ্ধ পদার্থ প্রস্তুত করা হয় বায়ুনিরুদ্ধ জায়গায় কিংবা নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পরিবেশে।

অতিরিক্ত পরিমাণ অশুদ্ধি উপস্থিত থাকলে বিশুদ্ধিকরণের অন্যান্য পদ্ধতি অনুসৃত হয়। 'আঞ্চলিক পরিশুদ্ধিকরণ' প্রণালী কিংবা বীজকেলাসকে গলিত ধাতু থেকে ধীরে ধীরে টেনে তোলার প্রণালী কেবলমাত্র অনুসৃত হয় বিশুদ্ধিকরণের সর্বশেষ পর্যায়ে।

বহির্ধৃতি (Adsorption) :

খুব কম ক্ষেত্রেই গ্যাস কঠিন পদার্থে দ্রবীভূত হয়, অর্থাৎ কেলাস ভেদ করে। কিন্তু কঠিন পদার্থের গ্যাস শোষণ করার অন্য এক প্রণালী আছে। গ্যাসের অণু কঠিন পদার্থের বহির্তলে সঞ্চিত হতে পারে—এই বৈশিষ্ট্যসূচক সঞ্চয়নকে

'বহির্ধৃতি' (adsorption) বলা হয়। সুতরাং বহির্ধৃতি* ঘটে তখনি, যখন গ্যাস পদার্থটির দেহের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না, কিন্তু বহির্তলে সফলভাবে সংলগ্ন হতে পারে।

বহির্ধৃতির অর্থ বহির্তলে শোষণ। কিন্তু এই ধরনের প্রক্রিয়া কি কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে? বস্তুতঃ একটি খুব বড় বহির্তলেও এক অণু গভীর স্তরের ওজন এক গ্রামের নগণ্য এক অংশ।

কাগজ কলম নিয়ে হিসেব করা যাক! একটি অণুর বহির্তলের ক্ষেত্রফল প্রায় $10\ \text{Å}^2$ অর্থাৎ $10^{-15}\ cm^2$। সুতরাং এক বর্গ সেণ্টিমিটার স্থানে 10^{15} সংখ্যক অণু সাজানো যাবে। অনেক অণুরই ওজন কম, যেমন জলের অণুর 3×10^{-8} গ্রাম। এমনকি এক বর্গমিটার স্থানেও মাত্র 0·0003 গ্রাম ওজনের জলের অণুর জায়গা হতে পারে।

কয়েকশো বর্গমিটার পরিমিত তলে সঞ্চিত পদার্থের পরিমাণ অবশ্য অত নগণ্য নয়। $100\ m^2$ স্থানে 0·03 গ্রাম (10^{21} অণু) জল থাকতে পারে।

কিন্তু এত বড় মাপের তল কি ল্যাবরেটরি পদ্ধতিতে ব্যবহার করা সম্ভব? একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, অনেক সময়ে অতিক্ষুদ্র কণার আকার থাকলে এক চামচ পদার্থেরও কয়েকশো বর্গমিটার বহির্তল হতে পারে।

এক সেণ্টিমিটার বাহুবিশিষ্ট একটি ঘনকের বহির্তলের ক্ষেত্রফল $6\ cm^2$। এবার ঘনকটিকে 0·5 cm বাহুবিশিষ্ট আটটি ঘনকে ভাগ করা যাক। প্রত্যেকটি ছোট ঘনকের বহির্তলের ক্ষেত্রফল দাঁড়াবে $0{\cdot}25\ cm^2$। এরকম মোট $8 \times 6 =$ 48টি বহির্তল পাওয়া যাবে। মোট বহির্তলের পরিমাণ দাঁড়াবে $12\ cm^2$। সুতরাং বহির্তলের ক্ষেত্রফল দ্বিগুণ হয়ে উঠবে।

এইভাবে পদার্থটির দেহের প্রতিটি বিভাজন তার বহির্তলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। মনে করুন 1 cm বাহুযুক্ত একটি ঘনককে এক মাইক্রোমিটার বাহুযুক্ত ঘনকাকার চূর্ণে পরিণত করা হল। যেহেতু $1\ \mu m = 10^{-4}\ cm$, সুতরাং বড় ঘনকটি 10^{12} খণ্ডে বিভক্ত হবে। প্রত্যেক খণ্ডের (সরলীকরণের জন্যে যাদের ঘনকাকার কল্পনা করা হয়েছে) বহির্তলের পরিমাণ $6\ \mu m^2$ অর্থাৎ $6 \times 10^{-8}\ cm^2$। তাহলে খণ্ডগুলির বহির্তলের মোট পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে $6 \times 10^4\ cm^2$ অর্থাৎ $6\ m^2$। তাছাড়া এই বিভাজন প্রক্রিয়াকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আপেক্ষিক বহির্তলের ক্ষেত্রফল (অর্থাৎ এক গ্রাম পদার্থের বহির্তলের ক্ষেত্রফল) বিপুল পরিমাণ হতে পারে। বিভাজন যত

---

* বহির্ধৃতি (adsorption)-কে শোষণ (absorption)-এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। যে কোনোভাবে গ্রহণ করাকেই শোষণ বলে।

বেশী হয়, এর মানও তত বেড়ে যায়—কেননা দানার বহির্তলের ক্ষেত্রফল তার একমাত্রিক মানের (linear dimension) বর্গের অনুপাতে কমে, কিন্তু একক আয়তনে উপস্থিত দানার সংখ্যা বাড়ে উক্ত একমাত্রিক মানের ঘনফলের অনুপাতে। একটি গেলাসের মধ্যে এক গ্রাম জল ঢাললে গেলাসের তলায় জমা জলের বহির্তলের ক্ষেত্রফল দাঁড়ায় কয়েক বর্গ সেণ্টিমিটার। ঐ এক গ্রাম জলই বৃষ্টির ফোঁটার আকার নিলে বহির্তলের ক্ষেত্রফল বেড়ে হয় কয়েক দশক বর্গ সেণ্টিমিটার। কিন্তু এক গ্রাম ওজনের কুয়াসার কণিকার ক্ষেত্রে বহির্তলের ক্ষেত্রফলের মোট পরিমাণ কয়েকশো বর্গ মিটার।

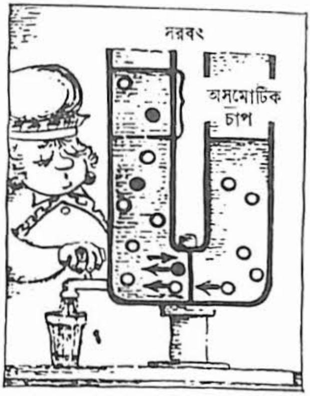
আপনি যদি এক টুকরো কয়লা নিয়ে গুঁড়ো করেন (যত বেশী সূক্ষ্ম হয় ততই ভালো), তাহলে তা অ্যামোনিয়া, কার্বনডাইঅক্সাইড এবং অন্য অনেক বিষাক্ত গ্যাসকে শোষণ করতে পারবে। গ্যাসমুখোস তৈরী করার সময়ে কয়লার এই ধর্মের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। কয়লাকে খুব সহজেই গুঁড়ো করা যায় এবং এই সব গুঁড়োর একমাত্রিক মান কমে দাঁড়ায় প্রায় দশ আংস্ট্রম্‌সের কাছাকাছি। সুতরাং এই বিশেষ রূপের এক গ্রাম কয়লার বহির্তলের ক্ষেত্রফল বিপুল—প্রায় কয়েকশো বর্গমিটার। একটি গ্যাস মুখোসে ব্যবহৃত কয়লা কয়েক দশক লিটার গ্যাস শোষণ করতে পারে।

রাসায়নিক শিল্পে ব্যাপকভাবে বহির্ধৃত ধর্মের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। বহির্তলে শোষিত বিভিন্ন গ্যাসের অণু পরস্পরের ঘনিষ্ট সংস্রবে এসে অনেক বেশী সহজে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়। রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি ত্বরান্বিত করার জন্য বহুক্ষেত্রে ধাতু (নিকেল, কপার ইত্যাদি) বা কয়লার সূক্ষ্ম চূর্ণ ব্যবহার করা হয়। যে সব পদার্থ এইভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবৃদ্ধি করে তাদের অনুঘটক (catalyst) বলে।

আস্রবণ (Osmosis) ঃ

জীবকলার (living tissues) মধ্যে এমন সব বিশেষ ধরনের পর্দা (membrane) দেখতে পাওয়া যায়, যারা নিজেদের ভিতর দিয়ে জল অণু চলাচলে বাধা না দিলেও জলে দ্রবীভূত অন্যান্য পদার্থের অণুকে বাধা দেয়। এই ধরনের পর্দার ধর্মের জন্যেই আস্রবণ নামে ভৌত প্রক্রিয়া ঘটতে দেখা যায়।

মনে করুন একটি U-আকারের নলকে এই ধরনের এক অর্ধভেদ্য পর্দার সাহায্যে দুইটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। একটি অংশে ঢালা হল কোনো দ্রবণ এবং অপর অংশে জল বা উক্ত দ্রবণে ব্যবহৃত দ্রাবক। দুটি অংশে সমপরিমাণ তরল ঢেলে তাদের বহির্তলকে একই আনুভূমিক তলে আনার পরেও কিন্তু দেখা



চিত্র 5.2

যাবে যে সাম্যাবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কিছুক্ষণ পরে উভয় অংশে তরলের উচ্চতা বিভিন্ন হয়ে উঠবে। দেখা যাবে যে, যে অংশে দ্রবণ ঢালা হয়েছে তার উচ্চতা বেড়ে গেছে। অর্ধভেদ্য পর্দা দিয়ে আলাদা করা জল দ্রবণের ভেতরে ঢুকে তাকে পাতলা করে দিচ্ছে। এই প্রক্রিয়াকেই বলা হয় আস্রবণ প্রক্রিয়া এবং দুটি অংশে তরলের উচ্চতার অন্তরকে আস্রবণশীল চাপ (Osmotic pressure)।

কিন্তু আস্রবণশীল চাপের কারণ কি ? চিত্র 5.2-এর পরীক্ষা পাত্রের বাঁদিকের অংশে প্রযুক্ত মোট চাপ জলের চাপ আর দ্রাবের চাপের যোগফল। কিন্তু চলাচলের দরজা খোলা শুধুমাত্র জলের জন্য আর তাই অর্ধভেদ্য পর্দার উপস্থিতিতে সাম্যাবস্থা বাঁদিকের মোট চাপ ডানদিকের মোট চাপের সমান হলে আসবে না, আসবে একমাত্র তখনি যখন ডানদিকের বিশুদ্ধ জলের চাপ বাঁদিকের দ্রবণের 'জল' অংশের চাপের সমান হবে। সুতরাং দুদিকের অংশে মোট চাপের অন্তর সূচিত করবে দ্রাবের চাপকে।

এই বাড়তি চাপটুকুই আস্রবণশীল চাপ। পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, আস্রবণশীল চাপের পরিমাণ, দ্রাব যদি গ্যাসীয় অবস্থায় একই আয়তন অধিকার করে থাকতো, তাহলে তা যে চাপ প্রয়োগ করতো, সেই চাপের সমান। সেজন্য আস্রবণশীল চাপের মান যে বেশ বড় অঙ্কের হবে তা স্বাভাবিক। এক লিটার জলে 20 গ্রাম চিনি দ্রবীভূত করলে যে আস্রবণশীল চাপের উদ্ভব হবে, তা 14 mm দীর্ঘ জলের স্তম্ভকে ধরে রাখতে পারে।

হয়তো অনেক পাঠকদের মনে অপ্রীতিকর স্মৃতির উদ্রেক হবে, তবু এবার আমরা আলোচনা করবো, কিভাবে কতগুলি লবণ দ্রবণকে তাদের আস্রবণশীল

চাপের জন্য জোলাপ হিসেবে ব্যবহার করা চলে। আমাদের অন্ত্রের দেওয়াল কতকগুলি দ্রবণের ক্ষেত্রে অর্ধভেদ্য পর্দা হিসেবে কাজ করে। যদি কোনো লবণ অন্ত্রের দেওয়াল ভেদ করে যেতে না পারে (গ্লোবার লবণের ক্ষেত্রে এমন হয়), তাহলে অন্ত্রের মধ্যে আস্রবণশীল চাপের উৎপত্তি হয় এবং এই চাপ দেহ থেকে জীবকলার মাধ্যমে জল শোষণ করে অন্ত্রে নিয়ে আসে।

কেন খুব বেশী নোনা জল মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে না ? প্রমাণিত হয়েছে যে, এক্ষেত্রেও দোষ আস্রবণশীল চাপের। মূত্রাশয় এমন মূত্র ত্যাগ করতে পারে না যার আস্রবণশীল চাপ দেহের জীবকলার ভিতরকার আস্রবণশীল চাপের চেয়ে বেশী। এজন্য সমুদ্রের লবণাক্ত জল পান করলে তা জীবকলার মধ্যে ঢুকতে তো পারেই না, উপরন্তু জীবকলার ভিতর থেকে উপস্থিত জলকে বের করে নিয়ে এসে মূত্রের সঙ্গে ত্যাগ করে।

৬. আণবিক বলবিদ্যা

ঘর্ষণ বল (Frictional Forces) ঃ

ঘর্ষণ শব্দটিকে আমরা এই প্রথম ব্যবহার করছি না। তাছাড়া গতি সম্পর্কে বাস্তব আলোচনা করার সময়ে ঘর্ষণ শব্দটি উহ্য রাখা কি কোনোভাবে সম্ভবপর? আমাদের চারপাশে যে সব বস্তু রয়েছে তাদের গতি সবসময়েই ঘর্ষণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। গাড়ীর মোটর বন্ধ করে দিলে গাড়ী থেমে যায় ; পেণ্ডুলাম দুলতে দুলতে অনেকক্ষণ পরে আপনা আপনি দোলা বন্ধ করে দেয় ; সূর্যমুখীর তেলে একটি ছোট ধাতব বল ফেললে সেটি ধীরে ধীরে ডুবতে থাকে। একটি তল বরাবর চলন্ত কোনো বস্তু কেন থেমে যায়? তেলের মধ্যে বস্তু আস্তে আস্তে ডোবে কেন? উত্তরে আমরা বলি ঃ এর কারণ কোনো বস্তু অন্য কোনো বস্তুর তল সংলগ্ন অবস্থায় গতিশীল হলে ঘর্ষণ বলের বাধার সম্মুখীন হয়।

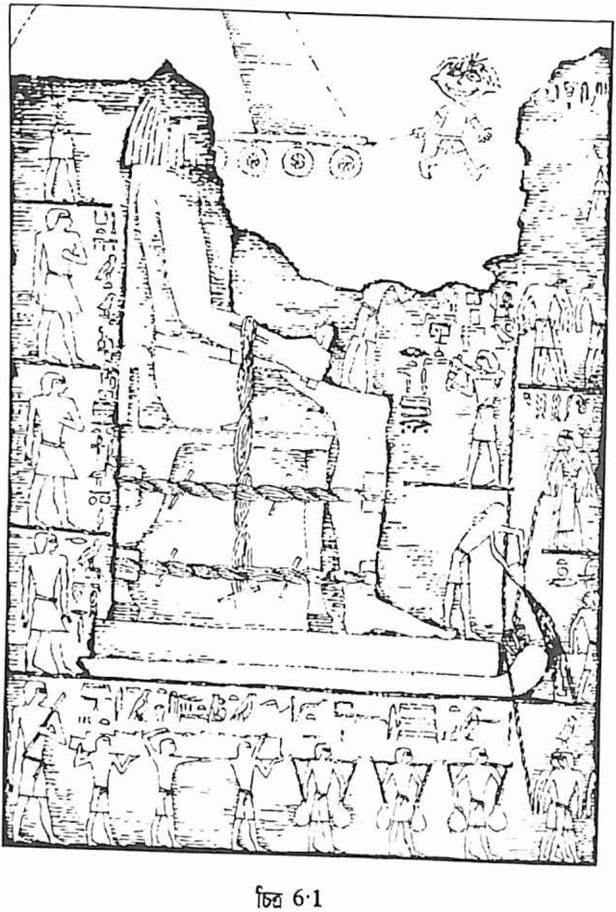
কিন্তু ঘর্ষণ বল শুধুমাত্র গতির ফলেই সৃষ্ট হয় না।

আপনি হয়তো অতীতে কোনোদিন ঘরের আসবাবপত্র সরিয়েছেন। আপনি তো জানেন একটা ভারী বইয়ের তাক সরানো কত শক্ত। যে বল এই সরানোর প্রচেষ্টাকে বাধা দেয় তার নাম স্থিত-ঘর্ষণ (static friction)।

কোনো বস্তুকে টেনে নিয়ে যাওয়ার কিংবা ঘোরানোর সময়েও ঘর্ষণ বলের উদ্ভব হয়। এই ভৌত প্রক্রিয়াদুটি কিছু ভিন্ন। তাই আমরা তাদের আলাদা আলাদা নাম দিয়েছি, চল-ঘর্ষণ (sliding friction) এবং আবর্ত-ঘর্ষণ (rolling friction)। চল-ঘর্ষণ আবর্ত-ঘর্ষণের তুলনায় কয়েক দশক গুণ বেশী।

অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াও ঘটে খুব সহজে। তুষারের উপর দিয়ে শ্লেজ ধীরে ধীরে এগোয়। বরফের উপরে স্কেট এগোয় আরও অনেক বেশী দ্রুতগতিতে।

কিন্তু ঘর্ষণ বলের কারণ কি? কঠিন পদার্থগুলির মধ্যে ঘর্ষণ বল খুব কমই গতির উপর নির্ভরশীল, কিন্তু নির্ভর করে বস্তুর ওজনের উপর। একটি বস্তুর ওজন দ্বিগুণ করে দিলে তাকে গতিশীল করা এবং টেনে নিয়ে যাওয়া দ্বিগুণ শক্ত। অবশ্য আমরা বক্তব্যটিকে পুরোপুরি সঠিকভাবে প্রয়োগ করি নি ঃ আসলে ওজন তত বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয়, যত গুরুত্বপূর্ণ সেই বল যা বস্তুটিকে তলের উপর



চিত্র 6·1

চেপে রেখেছে। একটি বস্তু হাল্‌কা হলেও যদি আমরা তাকে হাত দিয়ে খুব জোরে চেপে রাখি, তাহলেও নিশ্চয় ঘর্ষণ বল বাড়বে। যদি কোনো বস্তুকে যে বল তলের উপর চেপে রেখেছে (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা বস্তুটির ওজনের সমান) সেই বলকে P দ্বারা সূচিত করা হয়, তাহলে ঘর্ষণ বল F_{fr}-কে নিম্নলিখিত সরল সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় ঃ

$$F_{fr} = kP$$

কিন্তু কিভাবে তলের ধর্মকে হিসেবের মধ্যে আনা যায়? কেননা একথা সবাই জানেন যে, একই শ্লেজ রানারের উপর লোহা আট্‌কানো আছে কিনা, তার উপর নির্ভর করে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন গতিতে চলবে। তলের ধর্মকে হিসেবের মধ্যে আনার জন্য একটি আনুপাতিক ধ্রুবক k ব্যবহার করা হয়, যার নাম ঘর্ষণ গুনাঙ্ক (friction coefficient)।

ধাতুর কাঠের উপর ঘর্ষণ গুণাঙ্ক প্রায় 0·5, অর্থাৎ মসৃণ কাঠের টেবিলের উপর 2 kg ভরের একটি ধাতব বস্তুকে গতিশীল করার জন্য প্রয়োজন কমপক্ষে 1 kgf বল। কিন্তু বরফের উপর ইস্পাতের ঘর্ষণ গুণাঙ্ক অনেক কম, মাত্র 0·027 ; অর্থাৎ একই বস্তুকে বরফের উপর গতিশীল করার জন্য প্রয়োজনীয় বল মাত্র 0·054 kgf।

চল-ঘর্ষণ গুণাঙ্ক কমাবার প্রাচীন প্রচেষ্টাগুলির একটিকে আনুমানিক 1650 খৃষ্টপূর্বাব্দে চিত্রিত এক মিশরীয় গম্বুজের ম্যুরালে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে (চিত্র 6·1)। চিত্রে দেখা যাচ্ছে একজন ক্রীতদাস একটি ভারী মূর্তিবাহী শ্লেজের রানারের নীচে তেল ঢালছে।

পূর্বোক্ত সমীকরণে তলের ক্ষেত্রফলের কোনো ভূমিকা নেই : ঘর্ষণ বল পরস্পর ঘর্ষণশীল বস্তুদুটির সংযোগতলের ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভরশীল নয়। এক কিলোগ্রাম ওজনের একটি চওড়া ইস্পাতের পাতকে এবং অনেক অল্প সংযোগতল আছে এমন একই ওজনের ইস্পাতের পিণ্ডকে গতিশীল করতে কিংবা সমবেগে সরিয়ে নিয়ে যেতে একই পরিমাণ বলের প্রয়োজন হয়।

চল-ঘর্ষণ বল সম্পর্কে আরো একটি বক্তব্য আছে। কোনো বস্তুকে প্রথমে গতিশীল করা, তাকে সমবেগে সরানোর চেয়ে বেশী শক্ত। গতি আরম্ভ হওয়ার মুহূর্তের ঘর্ষণ বল (স্থিত ঘর্ষণ) পরবর্তীকালে বস্তুটিকে গতিশীল রাখার সময়ের ঘর্ষণ বলের চেয়ে প্রায় 20—30% বেশী।

আবর্ত-ঘর্ষণ, যেমন চাকা ঘোরার সময়ে দেখা যায়, ব্যাপারটা কি? চল ঘর্ষণের মতই যত বেশী পরিমাণ বল চাকাকে তলের ওপর চেপে রাখবে, আবর্ত ঘর্ষণের পরিমাণ ততই বাড়বে। তাছাড়া দেখা গেছে যে, আবর্ত ঘর্ষণ বল চাকার ব্যাসার্ধের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক। এটা বোঝা অবশ্য শক্ত নয়, কেননা চাকা যত বড় হবে ততই যে তলের উপর সেটি গড়াচ্ছে সেই তলের বন্ধুরতা কম বোঝা যাবে।

কোনো বস্তুকে ঘোরাতে আরম্ভ করার এবং সরাতে আরম্ভ করার প্রয়োজনীয় বল তুলনা করলে লক্ষ্যণীয় পার্থক্য চোখে পড়ে। যেমন, পিচের রাস্তার উপর দিয়ে 1 tonf ওজনের একটি ইস্পাতের কড়িকে টেনে নিয়ে যেতে প্রায় 200 kgf পরিমাণ বল প্রয়োগের প্রয়োজন হয়—যা করার সাধ্য আছে কেবলমাত্র কোনো



চিত্র 6·2

ব্যায়ামবিদের। কিন্তু ঐ একই ইস্পাতের কড়িকে ঠেলাগাড়ীতে চাপিয়ে একটা বাচ্চা ছেলেও টেনে নিয়ে যেতে পারবে—সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বলের পরিমাণ 10 kgf-এরও কম।

আবর্ত-ঘর্ষণ যে চল-ঘর্ষণকে হারিয়ে দিয়েছে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সঙ্গত কারণেই মানব জাতি অতি প্রাচীন কাল থেকে পরিবহণ ব্যবস্থায় চাকার সাহায্য গ্রহণ করেছে।

রানারের বদলে চাকার ব্যবহার শুরু হতেই আবর্ত-ঘর্ষণের জয় সম্পূর্ণ হয় নি, কেননা চাকাকেও তো একটা অ্যাক্সিলে (axle) আটকাতে হয়। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, বিয়ারিং-এর (bearing) সঙ্গে অ্যাক্সিলের ঘর্ষণ বিলুপ্ত করা অসম্ভব। বহু শতাব্দী যাবৎ মানুষ এ কথাই ভাবতো আর বিয়ারিং এর চল-ঘর্ষণ কমাবার জন্য ব্যবহার করতো বিভিন্ন পিচ্ছিলকারী পদার্থ বা লুব্রিক্যান্ট (lucbricant)। লুব্রিক্যান্টও কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেনি—চল-ঘর্ষণকে 8-10 গুণ কমিয়ে এনেছিল। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লুব্রিক্যান্ট প্রয়োগ করা সত্ত্বেও চল-ঘর্ষণের পরিমাণ এতো বেশী যে, প্রচুর শক্তির অপচয় ঘটে। এই বিষয়টি গত শতাব্দীতে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এজন্যই পরবর্তীকালে বিয়ারিং-এর মধ্যে চল-ঘর্ষণের বদলে আবর্ত-ঘর্ষণের ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্যোগ শুরু হয়। সেই উদ্যোগ সফল হয় বলবিয়ারিং-এর সাহায্য গ্রহণ করে। বলবিয়ারিং ব্যবস্থায় অ্যাক্সিল আর বুশের (bush) মধ্যে ছোট ছোট বল রাখা হয়। চাকা ঘুরলে বুশের মধ্যে বল ঘুরতে থাকে আর বলের উপর ঘোরে অ্যাক্সিল। চিত্র 6.2-এর মধ্যে বলবিয়ারিং-এর কার্যপ্রণালী প্রদর্শিত হল। উক্ত প্রণালীতে চল-ঘর্ষণ আবর্ত-ঘর্ষণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয় এবং তার ফলে ঘর্ষণের মাত্রা যায় কয়েক দশক গুণ কমে।

আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানে বল এবং রোলার বিয়ারিং-এর ভূমিকা এতো বড় যে বলে শেষ করা যায় না। এগুলি তৈরী করার জন্য বল, চোঙাকৃতি রোলার, শঙ্কু আকৃতি রোলার ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। আধুনিক কালে ছোট বড় সব যন্ত্রেই এই ধরনের বিয়ারিং থাকে। এক মিলিমিটার ব্যাসযুক্ত বলবিয়ারিং যেমন আছে তেমনি আছে অতিকায় যন্ত্রের জন্য এমন বিয়ারিং যার ওজন এক টনেরও বেশী। বিয়ারিং-এর বল (আপনারা নিশ্চয়ই কোনো না কোনো দোকানের শোকেসে এদের দেখেছেন) নানান মাপের হতে পারে—এক মিলিমিটারের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ থেকে শুরু করে কয়েক সেণ্টিমিটার ব্যাসের বিয়ারিং বল দেখতে পাওয়া যায়।

তরল ও গ্যাসীয় পদার্থে সান্দ্র ঘর্ষণ (Viscous Friction in Liquids and Gases) ঃ

এযাবৎ আমরা আলোচনা করে এসেছি শুষ্ক ঘর্ষণ সম্পর্কে, অর্থাৎ দুটি কঠিন বস্তুর সংস্পর্শের ফলে সৃষ্ট ঘর্ষণ সম্পর্কে। কিন্তু ভাসন্ত কিংবা উড়ন্ত বস্তুও ঘর্ষণ বলের প্রভাবাধীন। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে ঘর্ষণের উৎস আলাদা—শুষ্ক ঘর্ষণের বদলে সিক্ত ঘর্ষণ।

জল বা বায়ুর মধ্যে গতিশীল বস্তু যে ধরনের বাধার সম্মুখীন হয়, সেগুলির নিয়ন্ত্রক নিয়মাবলী আমাদের পূর্বালোচিত শুষ্ক ঘর্ষণের নিয়মকানুন থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন।

তরল ও গ্যাসের ঘর্ষণজনিত বাধাদানের পদ্ধতি আলাদা করা যায় না। তাই নীচে যা আলোচনা করা হবে তা তরল আর গ্যাস দুয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। যখন আমরা 'প্রবাহী' বা 'ফ্লুইড' (fluid) শব্দটি ব্যবহার করবো তখন তার দ্বারা তরল বা গ্যাস যে কোনো একটি বোঝাবে।

শুষ্ক আর সিক্ত ঘর্ষণের মধ্যে একটি প্রধান প্রভেদ, সিক্ত ঘর্ষণের সময়ে 'সিক্ত স্থিত ঘর্ষণের' অনুপস্থিতি ঃ জলে বা বায়ুতে ঝোলানো কোনো বস্তুকে সাধারণতঃ খুব সামান্য বলপ্রয়োগেই নড়ানো যায়। কিন্তু গতিশীল কোনো বস্তু যে ঘর্ষণজনিত বাধার সম্মুখীন হয় তা গতিবেগ, বস্তুর আকার ও আয়তন এবং ফ্লুইডের চরিত্রের ওপর নির্ভরশীল। ফ্লুইডের মধ্যে বস্তুর গতি সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, সিক্ত ঘর্ষণ শুধুমাত্র একটি নিয়ম মেনে চলে না। সিক্ত ঘর্ষণ দুটি নিয়ম মেনে চলে ঃ একটি নিম্নমাত্রার গতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অন্যটি উচ্চমাত্রার। দুটি আলাদা নিয়মের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, কোনো কঠিন বস্তু ফ্লুইড মাধ্যমের ভিতর দিয়ে যখন দ্রুতগতিতে এবং যখন ধীর গতিতে অগ্রসর হয়, তখন বস্তুটির চারিপাশে মাধ্যমের প্রবাহ ঘটে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে।

ধীরগতির ক্ষেত্রে বাধা বল বা পিছুটান (drag) বস্তুটির গতিবেগ এবং দৈর্ঘ্য ভিত্তিক পরিমাপের উপর নির্ভরশীল ঃ

$F \propto vL$

কিন্তু পরিমাপের উপর নির্ভরশীলতা বলতে আমরা কি বুঝবো, যদি না বস্তুটির সঠিক আকার জানা থাকে ? আসলে যা বোঝানো হয়েছে তা এই যে, সম্পূর্ণ একই আকৃতির (অর্থাৎ তুলনীয় অংশগুলি যখন একই অনুপাতের) দুটি বস্তুর ক্ষেত্রে পিছুটানের অনুপাত বস্তুদুটির দৈর্ঘ্যের অনুপাতের সমান।

পিছুটান ফ্লুইডের ধর্মের ওপর অত্যন্ত বেশী পরিমাণে নির্ভরশীল। একই বস্তু একই গতিতে বিভিন্ন মাধ্যমের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময়ে যে ঘর্ষণ বল অনুভব করে, সেগুলিকে তুলনা করলে দেখা যায় যে, মাধ্যম যত বেশী পুরু হয়, বা সঠিক পরিভাষায় যত বেশী সান্দ্র (viscous) হয়, বস্তুটি তত বেশী পিছুটান অনুভব করে। সেজন্য এই ঘর্ষণকে 'সান্দ্র ঘর্ষণ' আখ্যা দেওয়া বেশী যুক্তিযুক্ত। সহজেই বোঝা যায় কেন বাতাসের দেওয়া সান্দ্র ঘর্ষণ জলের দেওয়া সান্দ্র ঘর্ষণের তুলনায় 60 ভাগের এক ভাগ। আবার তরলের ক্ষেত্রেও একটি তরল জলের মত 'পাতলা' হতে পারে কিংবা পুরু হতে পারে টকে যাওয়া সর বা মধুর মত।

কত গতিতে কোনো কঠিন বস্তু একটি তরলের ভিতর দিয়ে পড়তে থাকে কিংবা কত গতিতে তরলটি একটি গর্ত দিয়ে বেরোতে থাকে, তার উপর ভিত্তি করে আমরা তরলটির সান্দ্রতার মাত্রা নির্ণয় করি।

একটি অর্ধ লিটার ফানেল থেকে সব জলটুকু পড়তে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগে। তরল খুব বেশী সান্দ্র হলে একই ফানেল থেকে টুপ টুপ করে পড়তে তার কয়েক ঘণ্টা, এমনকি কয়েক দিনও লেগে যেতে পারে। খুব বেশী সান্দ্র তরলের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ভূতত্ত্ববিদ্‌রা এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, কতকগুলি আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের (crater) ভিতরের দিকে জমানো লাভার গোলক দেখতে পাওয়া যায়। কি করে যে জ্বালামুখের ভিতরের দিকে লাভা জমে এই রকম গোলক তৈরী করেছে, প্রথম দৃষ্টিতে তা বুঝে ওঠা দুষ্কর। লাভাকে কঠিন পদার্থ হিসেবে বিবেচনা করলে ঘটনাটি ব্যাখ্যা করাও সম্ভব নয়। কিন্তু লাভাকে তরল হিসেবে গ্রহণ করলে বোঝা যায় যে, লাভাও অন্যান্য তরলের মত ব্যবহার করবে এবং বিন্দুর আকারে জ্বালামুখের মধ্যে ঝরে পড়বে। কিন্তু একটিমাত্র বিন্দু তৈরী হতে এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ সময়ের বদলে লাগবে কয়েক দশক বছর। যখন বিন্দুটি অতিরিক্ত ভারী হয়ে উঠবে তখন তা স্থানচ্যুত হয়ে জ্বালামুখের তলায় ঝরে পড়বে।

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সত্যিকার কঠিন পদার্থ আর অনিয়তাকার পদার্থকে, যার মিল কেলাসের চেয়ে তরলের সঙ্গেই বেশী, একই মানদণ্ডে বিচার করা উচিত নয়। লাভাও মূলতঃ ঐ ধরনের অনিয়তাকার পদার্থ। দেখে কঠিন বলে মনে হলেও আসলে তা অতি সান্দ্র তরল।

সীল করার মোম কি কঠিন পদার্থ, আপনি কি বলেন? দুটি কর্কের ছিপি নিয়ে আলাদা আলাদা কাপের মধ্যে রাখুন। তারপর একটির মধ্যে ঢালুন গলিত কোনো লবণ (যেমন সহজলভ্য শোরা) আর অন্যটির মধ্যে গলিত সীল করার মোম। দুটি তরলই সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে কর্কের ওপর জমে যাবে। তারপর কাপ দুটিকে কাবার্ডে ঢুকিয়ে বেশ কয়েকমাস রেখে দিন। কয়েকমাস পরে কাপদুটিকে বাইরে বের করে আনলে আপনি লবণ আর সীল করার মোমের তফাত বুঝতে পারবেন। যে কাপে কর্কটি লবণের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল সেটিকে তখনো কাপের তলায় একই জায়গায় দেখতে পাবেন। কিন্তু সীল করার মোমের তলায় যে কর্কটি চাপা ছিল, সেটিকে দেখতে পাবেন উপরে ভেসে উঠেছে। কিন্তু কিভাবে এ ঘটনা ঘটলো? খুবই সহজে ঃ কর্কটি উপরে চলে এলো ঠিক সেইভাবে, যেভাবে এটি ভেসে উঠতো জলের তলা থেকে। তফাত শুধু সময়ের ঃ যখন সান্দ্র ঘর্ষণের মাত্রা কম তখন কর্ক সঙ্গে সঙ্গে উপরে ভেসে ওঠে, কিন্তু খুব সান্দ্র তরলের ভিতর থেকে তার ভেসে উঠতে কয়েক মাস সময় লেগে যায়।

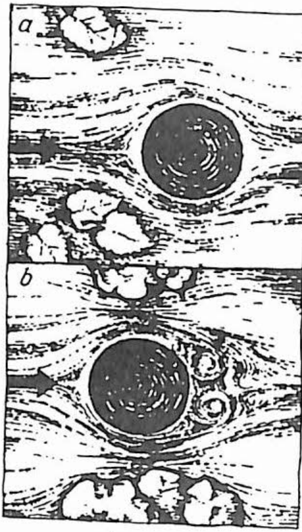
দ্রুতগতিকালে বাধাবল (Forces of Resistance at High Speeds) ঃ

এবার সিক্ত ঘর্ষণের নিয়মের ক্ষেত্রে ফিরে আসা যাক। এর আগে ব্যাখ্যা করে বোঝানো হয়েছে যে, ধীর গতির ক্ষেত্রে পিছুটান নির্ভর করে তরলের সান্দ্রতা, বস্তুটির দৈর্ঘ্যাভিত্তিক পরিমাপ আর গতিবেগের উপর। এবার দ্রুত গতির ক্ষেত্রে ঘর্ষণের নিয়ম নিয়ে আলোচনা করা যাক। কিন্তু সবার আগে ঠিক করতে হবে কোন গতিকে আমরা ধীর আর কোন গতিকে দ্রুত বলবো। অবশ্য আমরা সংশ্লিষ্ট গতির সাংখ্যমান সম্পর্কে আগ্রহী নই, আগ্রহী শুধু একটু জানতে যে, গতির মান উপরোক্ত সান্দ্র ঘর্ষণের নিয়ম মেনে চলার মতো যথেষ্ট কম কি না।

দেখা গেছে যে, গতি প্রতি সেকেণ্ডে এতো মিটারের কম হলে সান্দ্র ঘর্ষণের নিয়ম সর্বক্ষেত্রে কার্যকরী হবে, এই ধরনের ঘোষণা বাস্তবে করা সম্ভব নয়। আমাদের পূর্বালোচিত নিয়মের সীমা বস্তুর পরিমাপ এবং তরলের সান্দ্রতা আর ঘনত্বের উপরও নির্ভরশীল।

বায়ুর ক্ষেত্রে ধীরগতি বলতে বোঝায় যখন গতি

$\frac{0{\cdot}75}{L}$ cm/s-এর চেয়ে কম ;



চিত্র 6·3

জলের ক্ষেত্রে যখন গতি $\frac{0.05}{L}$ cm/s-এর চেয়ে কম ;

এবং ঘন মধুর মতো সান্দ্র তরলের ক্ষেত্রে যখন গতি $\frac{100}{L}$ cm/s-এর চেয়ে কম।

সুতরাং সান্দ্র ঘর্ষণের নিয়ম বায়ুর ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে জলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার অবকাশ নেই বললেই চলে: গতি যদি খুব কমও হয়, ধরুন 1 cm/s মানের কাছাকাছি, তাহলেও ঐ নিয়ম শুধুমাত্র অতিক্ষুদ্র মিলিমিটার মাপের কণিকার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যাবে। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময়ে যে বাধা অনুভূত হয়, তা কোনোমতেই সান্দ্র ঘর্ষণের নিয়মের অধীন নয়।

কিন্তু মাধ্যমের বাধা গতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, এই তথ্যের ব্যাখ্যা কি? অবশ্যই কারণটি খুঁজে পাওয়া যাবে, বস্তুটি যে তরলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, সেই তরলের প্রবাহের চরিত্রের পরিবর্তনের মধ্যে। চিত্র 6.3-এ তরলের মধ্যে ধাবমান দুইটি চোঙার (এদের অক্ষ কাগজের উপর লম্বভাবে রয়েছে) ছবি দেখানো হয়েছে। ধীর গতির ক্ষেত্রে তরলটি মসৃণভাবে চলন্ত বস্তুটির চারপাশ দিয়ে প্রবাহিত হবে—যে পিছুটান বস্তুটিকে অতিক্রম করতে হবে তা সান্দ্র ঘর্ষণের বল (চিত্র 6.3*a*)। দ্রুতগতির ক্ষেত্রে চলন্ত বস্তুটির

পিছনে তৈরী হবে এক জটিল অনিয়মিত প্রবাহ (চিত্র 6.3*b*)। অদ্ভুত আকারের আবর্ত আর ঘূর্ণি উৎপন্ন করে বিভিন্ন স্রোত জন্মাবে আর লুপ্ত হবে। ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হবে স্রোতগুলি দ্বারা উৎপন্ন চিত্র। অশান্ত প্রবাহ (turbulent flow) নামে পরিচিত এই ধরনের জটিল প্রবাহের আবির্ভাবের ফলে বাধার নিয়ম মৌলিকভাবে বদলে যায়।

বস্তুর পরিমাপ আর গতির সঙ্গে অশান্ত বাধার সম্পর্ক সান্দ্র বাধার সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ঃ অশান্ত বাধা বস্তুর গতির বর্গের এবং দৈর্ঘ্যভিত্তিক পরিমাপের বর্গের সঙ্গে সমানুপাতিক। এই ধরনের গতির সময় তরলে সান্দ্রতার কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে না ; নির্ধারক ভূমিকা গ্রহণ করে তরলের ঘনত্ব এবং হয়ে দাঁড়ায় পিছুটানের সমানুপাতিক। সুতরাং অশান্ত বাধার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সম্পর্ক প্রযোজ্য ঃ

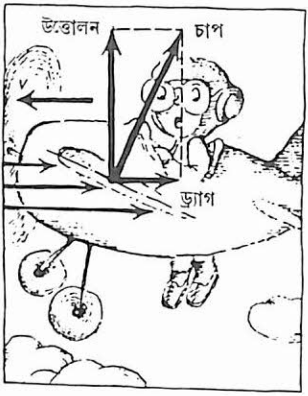
$$F \propto \rho v^2 L^2$$

যেখানে v গতির দ্রুততা, L বস্তুর দৈর্ঘ্যভিত্তিক পরিমাপ এবং ρ মাধ্যমের ঘনত্ব। উপরোক্ত সম্পর্কের মধ্যে যে আনুপাতিক ধ্রুবককে আমরা উহ্য রেখেছি, তার মান বস্তুর আকার অনুযায়ী বিভিন্ন মানের হতে পারে।

স্রোতরেখ আকার (Streamline Shape) ঃ

আগেই বলা হয়েছে যে, বায়ুর মধ্যে প্রায় সব ক্ষেত্রেই গতি 'দ্রুতগতির' পর্যায়ে পড়ে, অর্থাৎ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে সান্দ্র বাধার বদলে অশান্ত বাধা। এরোপ্লেন, পাখী কিংবা প্যারাস্যুট নিয়ে যারা ঝাঁপ দেয়, তারা, যে ধরনের বাধার সম্মুখীন হয়, তা অশান্ত বাধা। প্যারাস্যুট না নিয়ে যদি কোনো লোক বাতাসের মধ্যে ঝাঁপ দেয় তাহলে কিছুক্ষণ পরে তার পতন ঘটতে থাকবে সমবেগে (বাধাবল ওজনের ভারসাম্য রক্ষা করবে), কিন্তু সেই বেগ বেশ বেশী, প্রায় 50 m/s। প্যারাস্যুট খুললে পতনের বেগ অনেক মন্দীভূত হয়—সেক্ষেত্রে ঐ একই ওজনের ভারসাম্য রক্ষা করে গোটা প্যারাস্যুটের দ্বারা প্রদত্ত বাধা। যেহেতু বাধাবল গতিবেগ এবং বস্তুর দৈর্ঘ্যভিত্তিক পরিমাপ, দুয়ের সঙ্গেই সমানুপাতিক, তাই পতনশীল বস্তুর পরিমাপ যত বাড়বে পতনের গতিও যাবে সেই অনুপাতে কমে। প্যারাস্যুটের ব্যাস প্রায় 7 মিটার, যেখানে মানুষের শরীরের 'ব্যাস' মাত্র এক মিটারের কাছাকাছি। এজন্য পতনের গতি কমে দাঁড়াবে প্রায় 7 m/s। এই গতি থাকলে নিরাপদে অবতরণ সম্ভব।

বাধা বাড়ানোর সমস্যা যে বাধা কমানোর সমস্যার তুলনায় অনেক বেশী সহজে সমাধান করা যায়, সেকথা মানতেই হবে। মোটর গাড়ী বা এরোপ্লেনের ক্ষেত্রে বায়ুর বাধা কমানো, কিংবা সাবমেরিনের ক্ষেত্রে জলের বাধা কমানো, এখনো প্রযুক্তিবিজ্ঞানের গুরুতর সমস্যাগুলির অন্যতম।



চিত্র 6.4

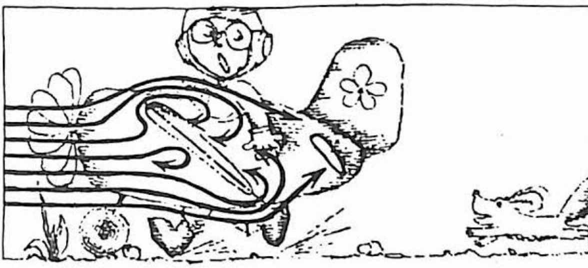
বস্তুর আকার বদল করে যে অশান্ত বাধাকে অনেকখানি কমানো যায়, তা প্রমাণিত হয়েছে। এজন্য দরকার অশান্ত প্রবাহকে যতদূর সম্ভব কমানো, কেননা এই প্রবাহই ঐ বাধার উৎস। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে বস্তুটিকে স্রোতরেখ করা হয়।

কিন্তু স্রোতরেখ হওয়ার জন্য কোন আকার শ্রেষ্ঠ ? প্রথম বিচারে মনে হতে পারে যে বস্তুটিকে এমন আকার দেওয়া দরকার যাতে তার সামনের দিক এক ছুঁচোলো বিন্দুতে এসে মেলে। মনে হতে পারে যে এই ধরনের একটি বিন্দু সবচেয়ে সফলভাবে বাতাস কাটতে পারবে। কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে যে বাতাস কাটার গুরুত্ব তত বেশী নয় যত বেশী গুরুত্ব তাকে আলোড়িত না করে বস্তুটির দেহ বরাবর মসৃণভাবে প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া।

ফ্লুইডের ভিতর দিয়ে গতিশীল বস্তুর সর্বোত্তম আকার হয়* তখনি, যখন তার সামনের দিকটা থাকে ভোঁতা আর পিছনের দিক ছুঁচোলো। এই ধরনের আকার হলে ফ্লুইডটি মসৃণভাবে প্রবাহিত হবে এবং অশান্ত প্রবাহ ঘটবে ন্যূনতম মাত্রায়। সামনের দিকে কোনরকম ছুঁচোলো প্রান্ত রাখা উচিত নয়, কেননা তা থেকে অশান্ত প্রবাহের সৃষ্টি হয়।

এরোপ্লেন-ডানার স্রোতরেখ আকার শুধুমাত্র গতির বিরুদ্ধে বাধাকে নিম্নতম মাত্রায় রাখে না, তার সম্মুখপ্রান্ত গতিমুখের উপরের দিকে বেঁকানো থাকলে উপরন্তু তা সর্বোচ্চ উত্তোলন সম্ভব করে। ডানার পাশ কাটিয়ে যাবার সময় বায়ু

* নৌকা কিংবা সমুদ্রগামী পোতের সামনের প্রান্তকে ছুঁচোলো রাখা হয় ঢেউ ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ যখন গতি তল বরাবর।



চিত্র 6.5

ডানাটিকে তার তলের লম্ব অভিমুখ বরাবর ধাক্কা দেয় (চিত্র 6.4)। স্পষ্টতঃ, ডানাটি উপযুক্তভাবে আনতে থাকলে এই বল উপরের দিকে ক্রিয়া করবে।

ডানার 'আক্রমণ কোণ' (angle of attack) বাড়ালে উত্তোলন (lift) বাড়ে। কিন্তু শুধুমাত্র জ্যামিতিক বিচার থেকে অগ্রসর হলে আমরা এই ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আক্রমণ কোণ যত বেশী বাড়ানো যায় ততই ভালো। কিন্তু বাস্তবে আক্রমণ কোণ বেশী বাড়ালে এরোপ্লেনের মসৃণ গতি ক্রমশঃ কঠিনতর হয়ে ওঠে এবং যেমন চিত্র 6.5-এ প্রদর্শিত হয়েছে তেমনি প্রচণ্ড অশান্ত প্রবাহ উৎপন্ন হয়, পিছুটান উৎকটভাবে বাড়ে আর উত্তোলন কমে যায়।

সান্দ্রতার অবসান (Disappearance of Viscosity) **:**

প্রায়ই কোনো ঘটনা কিংবা কোনো বস্তু বা বস্তুগোষ্ঠীর আচরণ ব্যাখ্যা করার সময় আমরা বহু পরিচিত দৃষ্টান্তের সাহায্য গ্রহণ করি। বলি, বস্তুটি যে এভাবে যাবে তা স্বাভাবিক, কেননা অন্যান্য বস্তুও যাওয়ার সময় এই নিয়মেই যায়। এইভাবে ব্যাখ্যার সাহায্যে নতুনকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বহু পরিচিতদের দলে অন্তর্ভুক্ত করার পদ্ধতি অধিকাংশ মানুষকেই সন্তুষ্ট করে। এজন্যই আমাদের পক্ষে তরল পদার্থের গতির নিয়ম ব্যাখ্যা করার বিষয়ে বিশেষ অসুবিধে হয়নি। যেহেতু সবাই স্বচক্ষে দেখেছেন কিভাবে জল প্রবাহিত হয়, তাই তাঁরা তরল পদার্থের গতির নিয়মকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে মেনে নেন।

যাই হোক, এমন এক অদ্ভুত তরলেরও অস্তিত্ব আছে, যার সঙ্গে অন্য কোনো তরলের মিল নেই এবং যার আচরণ এমন সব নিয়ম মেনে চলে যেগুলি কেবলমাত্র তার একার পক্ষে প্রযোজ্য। এই অদ্ভুত তরলের নাম তরল হিলিয়ম।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, তরল হিলিয়ম পরম শূন্য তাপমাত্রা পর্যন্ত তার তরল অবস্থা বজায় রাখতে পারে। অবশ্য 2 K (আরও সঠিকভাবে

বললে 2·19 K) তাপমাত্রার উপরের হিলিয়ম আর ঐ তাপমাত্রার নীচের হিলিয়ম সম্পূর্ণ আলাদা দুটি তরল। 2 K তাপমাত্রার উপরে তরল হিলিয়ম কোনো বিষয়েই অন্যান্য তরল থেকে স্বতন্ত্র নয়। কিন্তু এই তাপমাত্রার নীচে হিলিয়ম এক অদ্ভুত তরল। এই অদ্ভুত তরলের নাম রাখা হয়েছে হিলিয়ম II।

হিলিয়ম II-এর সবচেয়ে অদ্ভুত ধর্ম তার অতি প্রবাহমানতা, অর্থাৎ সান্দ্রতার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি, যা আবিষ্কার করেছিলেন পি. এল. কাপিৎসা 1938 খৃষ্টাব্দে।

অতিপ্রবাহমানতা পরীক্ষা করার জন্য একটি পাত্রের তলায় খুব সূক্ষ্ম—প্রায় আধ মাইক্রোমিটারের মতো চওড়া, ছিদ্র করার প্রয়োজন। এই ধরনের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে সাধারণ তরল পড়তেই চাইবে না এবং 2·19 K-এর উপরে তরল হিলিয়মও একই রকম ব্যবহার করবে। কিন্তু যে মুহূর্তে তাপমাত্রা কমিয়ে 2·19 K-এর সামান্য কম করা হবে, সেই মুহূর্তে তরল হিলিয়ম যে বিপুল বেগে ছিদ্র থেকে বেরোতে আরম্ভ করবে, তার কোনো তুলনা হয় না—তার পরিমাণ অন্ততঃ কয়েক হাজার গুণ বেশী। সূক্ষ্মতম ছিদ্র দিয়েও হিলিয়ম II প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসে, অর্থাৎ তার সান্দ্রতা সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত হয়ে যায়। হিলিয়মের এই অতিপ্রবাহমানতা ধর্ম থেকে উৎপন্ন হয়েছে তার আরো বেশী অদ্ভুত এক আচরণ। হিলিয়ম II, যে পাত্রে বা টেস্টটিউবে তাকে রাখা হয়েছে, তার গা বেয়ে উপরে উঠতে পারে। হিলিয়ম বাথের উপর ডিওয়ার পাত্রে (Dewar vessel) হিলিয়ম II রাখুন। দেখবেন, কোনো কারণ ছাড়াই তরল হিলিয়ম অদৃশ্য, খুব পাতলা সরের আকারে টেস্টটিউবের গা বেয়ে উপরে উঠবে এবং টেস্টটিউবের তলা থেকে বিন্দুর আকারে পড়তে থাকবে।

স্মরণ করুন পূর্বে আলোচিত কৈশিক বলের (capillary force) কথা ; পাত্রের দেওয়াল ভেজাতে পারে এমন প্রত্যেক তরল দেওয়াল বেয়ে উঠে তার গায়ে এমন অত্যন্ত পাতলা আবরণ তৈরী করে যার মান 10^{-6} cm। এই আবরণ চোখে দেখা যায় না এবং তা সাধারণভাবে সান্দ্র তরলের মত ব্যবহার করে না।

সান্দ্রতাহীন হিলিয়মের ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ নতুন চিত্র দেখতে পাই। বাস্তবে অতিসূক্ষ্ম ছিদ্রও অতিপ্রবাহমান হিলিয়মের পথ আটকাতে পারে না এবং তলের ওপর পাতলা আবরণ সূক্ষ্ম ছিদ্রের কাজ করে। সান্দ্রতাহীন তরল অত্যন্ত পাতলা স্তরেও প্রবাহিত হয়। পাত্রের দেওয়াল ঢেকে যে আবরণ গড়ে ওঠে তা সাইফনের কাজ করে আর তার ভিতর দিয়ে টেস্টটিউবের ভিতরকার হিলিয়ম দেওয়াল ডিঙিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

সাধারণ তরলের ক্ষেত্রে অবশ্যই এই ধরনের কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। সাধারণ সান্দ্রতাবিশিষ্ট তরল এই ধরনের যৎসামান্য পুরু সাইফনের ভিতর দিয়ে প্রায় এগোতেই পারে না। গতি এত আস্তে হয় যে, পুরো তরলটুকুর বাইরে বেরোতে লক্ষ লক্ষ বছর লেগে যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, হিলিয়ম II-এর সান্দ্রতা বলে কিছু নেই। তাহলে যুক্তির খাতিরে স্বীকার করতে হবে যে, এই ধরনের তরলের ভিতর দিয়ে যাবার সময় কঠিন পদার্থ কোনো রকম বাধার সম্মুখীন হবে না। তাহলে, একটি সুতোয় বাঁধা চাকতি নিয়ে তাকে হিলিয়ম II-এর মধ্যে রাখা যাক। তারপর সুতোটিকে একটু পাক দেওয়া যাক। এই সহজ পরীক্ষায় আমরা পেণ্ডুলামের মত একটা ব্যবস্থা গড়লাম—সুতোটি পর্যায়ক্রমে বিপরীত দিকে পাক খেতে থাকবে। তরলটি যদি কোনো বাধা না দেয় তাহলে আমরা আশা করবো যে সুতোর সঙ্গে সঙ্গে চাকতিও অনন্তকাল ধরে পর্যায়ক্রমে বিপরীত দিকে পাক খেয়ে চলবে। কিন্তু সে রকম কিছুই হবে না। অল্পক্ষণ পরেই, হিলিয়ম I নিয়ে পরীক্ষা করলে যত সময় লাগতো প্রায় ততটুকু সময় পরেই, চাকতিটি থেমে যাবে। কিন্তু কেন এমন হবে? যখন ছিদ্রের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন হিলিয়ম II সান্দ্রতাহীন তরলের মতো আচরণ করে, কিন্তু যখন কোনো কঠিন বস্তু তার ভিতর দিয়ে চলাচল করে, তখন তার পরিপ্রেক্ষিতে হিলিয়ম II-এর আচরণ সাধারণ সান্দ্র তরলের মতো। আচরণের এই ধরনের ভিন্নতা বাস্তবিকই সম্পূর্ণ অসাধারণ এবং দুর্বোধ্য।

এবার আপনাদের মনে করিয়ে দিই যে, হিলিয়ম পরম শূন্য তাপমাত্রা পর্যন্ত ঠাণ্ডা করলেও কঠিনীভূত হয় না। সমস্যার সারাংশ এই যে, গতি সম্পর্কে আমাদের এতদিন যে ধারণা ছিল, তা আর পর্যাপ্ত নয়। যেহেতু হিলিয়ম নিয়মবিরুদ্ধভাবে তরল অবস্থায় থাকে, তাই তার আচরণও যে নিয়ম বহির্ভূত হবে, এতে আশ্চর্যের কি আছে?

কেবলমাত্র গতি সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে, কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার ভিত্তিতে, তরল হিলিয়মের আচরণ বোধগম্য হতে পারে। এবার, কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার সাহায্যে কি করে তরল হিলিয়মের আচরণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সে সম্পর্কে সাধারণ রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করছি।

কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা খুব জটিল তত্ত্ব, যা বোঝা বেশ কঠিন। তাই পাঠক যদি কখনো দেখেন যে, তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বাস্তব আচরণের চেয়েও বেশী অদ্ভুত মনে হচ্ছে, তাহলেও আশ্চর্য হবেন না। দেখা গেছে যে, তরল হিলিয়মের প্রতিটি কণিকা একই সঙ্গে দুধরনের গতি প্রদর্শন করেঃ একটি গতি সান্দ্রতার সঙ্গে সম্পর্কহীন অতিপ্রবাহী, অন্যটি সাধারণ।

হিলিয়ম II এমন আচরণ করে যেন তা দুটি তরলের মিশ্রণ, যারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে 'একে অন্যের ভিতর দিয়ে' চলাচল করছে। একটি তরলের আচরণ সাধারণ, অর্থাৎ সাধারণ মানের সান্দ্রতা আছে, কিন্তু অন্যটি অতিপ্রবাহী।

যখন হিলিয়ম কোনো ছিদ্র দিয়ে প্রবাহিত হয় বা পাত্র ডিঙিয়ে বেরোয়, তখন আমরা অতিপ্রবাহমানতার চিহ্ন লক্ষ্য করি। কিন্তু হিলিয়মে ডোবানো চাক্‌তির দোলনের সময় বাধার সৃষ্টি হয়, কেননা তা হিলিয়মের সাধারণ অংশের জন্য অবশ্যম্ভাবী।

একই সঙ্গে দুধরনের গতির মধ্যে অংশগ্রহণ করার ক্ষমতার জন্য হিলিয়মের অস্বাভাবিক তাপপরিবহণ ক্ষমতা গড়ে উঠেছে। আগেই বলা হয়েছে যে, সাধারণতঃ তরলের তাপপরিবহণ ক্ষমতা অল্প। হিলিয়াম I-ও সাধারণ তরল হিসেবে কাজ করে। কিন্তু যখন হিলিয়ম II-তে রূপান্তর ঘটে তখন তার তাপপরিবহণ ক্ষমতা শত কোটি গুণ বেড়ে যায়। তাই হিলিয়াম II তামা বা রূপার মতো সাধারণ তাপ-সুপরিবাহী পদার্থের তুলনায় আরও বেশী ভালোভাবে তাপ পরিবহণ করতে পারে।

বাস্তব চিত্র এই যে, হিলিয়মের অতিপ্রবাহী অংশের চলাচল তাপ আদান-প্রদানের কাজে অংশগ্রহণ করে না। তাই যখন হিলিয়ম II-এর মধ্যে উষ্ণতার তারতম্য ঘটে, তখন দুটি বিপরীতমুখী স্রোতের উৎপত্তি হয় এবং তাদের মধ্যে একটি—যেটি সাধারণ—সেটিই তাপ বহন করে। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সাধারণ তাপপরিবহণ প্রক্রিয়া একদম মেলে না। সাধারণ তরলে তাপ সঞ্চালন হয় আণবিক সংঘাতের সাহায্যে। হিলিয়ম II-এর মধ্যে উত্তাপ হিলিয়মের সাধারণ অংশের সঙ্গে একত্রিতভাবে প্রবাহিত হয়—প্রবাহিত হয় তরলের মতো। শেষ পর্যন্ত এই বিশেষ ক্ষেত্রে এসে তাপপ্রবাহ শব্দের ব্যবহার পুরোপুরি সার্থক হয়ে উঠেছে। মূলতঃ তাপ সঞ্চালনের এই বিশেষ পদ্ধতিই তরল হিলিয়মের বিপুল তাপ-পরিবহণ ক্ষমতার কারণ।

হিলিয়মের তাপপরিবহণ ক্ষমতার এই ব্যাখ্যা হয়তো আপনার কাছে এতো অদ্ভুত মনে হচ্ছে যে, আপনি তা জানতে চাইছেন না। কিন্তু নিম্নলিখিত পরীক্ষা চালালে, যা বলা হয়েছে তার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবসান হবে।

তরল হিলিয়ম আছে এমন একটি টবের মধ্যে তরল হিলিয়মে কানায় কানায় ভরা একটি ডিওয়ার পাত্র রাখা হল। পাত্রটি টবের সঙ্গে একটি কৈশিক শাখানল দ্বারা সংযুক্ত। পাত্রের ভিতরকার হিলিয়ম বিদ্যুৎবাহী তারের সাহায্যে উত্তপ্ত করা হল, কিন্তু পাত্রটির দেওয়াল তাপ সঞ্চালনে সাহায্য করে না বলে উত্তাপ বাইরের হিলিয়মের মধ্যে আসতে পারলো না। কৈশিক নলটির শেষপ্রান্তে ঝুলিয়ে দেওয়া হল সূক্ষ্ম সুতোয় বাঁধা হাল্‌কা একটি পাখা। উত্তাপ যদি সত্যি

তরলের মতো প্রবাহিত হয়, তাহলে তা অবশ্যই পাখাটিকে ঘোরাবে। দেখা যাবে তাই ঘটছে। তাছাড়া পাত্রের ভিতরকার হিলিয়মের পরিমাণেও কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। কি করে এই অদ্ভুত কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করা সম্ভব? কেবলমাত্র একটি উপায়েঃ উত্তপ্ত করার সময়ে তরলের সাধারণ অংশে উত্তপ্ত স্থান থেকে শীতল স্থানের অভিমুখে এক স্রোতের সৃষ্টি হচ্ছে এবং অতিপ্রবাহী অংশে সৃষ্টি হচ্ছে বিপরীতমুখী অন্য এক স্রোতের। কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে হিলিয়মের পরিমাণে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না, কিন্তু যেহেতু তরলের সাধারণ অংশ উত্তাপকে সঙ্গে নিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, তাই এই অংশের সান্দ্র ঘর্ষণের ফলে পাখাটি ঘুরে যাচ্ছে।

উপরোক্ত পরীক্ষায় আরো প্রতিপন্ন হয় যে, অতিপ্রবাহী চলাচল তাপ সঞ্চালন করে না। এর আগে আমরা তরল হিলিয়মের পাত্রের কিনারা 'ডিঙিয়ে' যাওয়ার ক্ষমতার উল্লেখ করেছি। কিন্তু আসলে শুধু অতিপ্রবাহী অংশই এই ভাবে কিনারা ডিঙিয়ে পালায়, কিন্তু সাধারণ অংশ পাত্রের মধ্যেই পড়ে থাকে। আবার উত্তাপ শুধু হিলিয়মের সাধারণ অংশের সঙ্গেই সংযুক্ত থাকে এবং যে অতিপ্রবাহী অংশ পাত্রের কিনারা ডিঙিয়ে পালায়, তার সঙ্গে যায় না। তাই যতই হিলিয়ম পাত্রের কিনারা ডিঙিয়ে বাইরে চলে যেতে থাকে, ততই একই পরিমাণ উত্তাপ ভাগ করে নিতে থাকে ক্রমশঃ কমতে থাকা অবশিষ্টাংশ—ফলে পাত্রে পড়ে থাকা হিলিয়মের তাপমাত্রা ক্রমশঃ বেড়ে যাওয়া উচিত। পরীক্ষার ফলে এই অনুমানও সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

অতিপ্রবাহী গতি আর সাধারণ গতিতে অংশগ্রহণকারী হিলিয়মের পরিমাণ সমান নয়। এ দুয়ের অনুপাত তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল। তাপমাত্রা যত কম হয়, অতিপ্রবাহী অংশের অনুপাত হয় ততই বেশী। পরম শূন্যে তাপমাত্রায় হিলিয়মের সবটুকু অতিপ্রবাহী হয়ে ওঠে। তাপমাত্রা পরম শূন্য থেকে যত বাড়ানো হয়, হিলিয়মের তত বেশী বেশী অংশ সাধারণ হিলিয়মে পরিণত হতে থাকে এবং তাপমাত্রা 2·19 K-তে পৌঁছলে সবটুকু হিলিয়মই সাধারণ হিলিয়মে পরিণত হয়ে সাধারণ তরলের মতো আচরণ করে।

কিন্তু পাঠকের মনের মধ্যে ইতিমধ্যেই অনেক প্রশ্ন জমেছেঃ অতিপ্রবাহী হিলিয়ম বলতে আসলে কি বোঝায়, কি করে একই তরল অণু দুধরনের গতির মধ্যে অংশগ্রহণ করতে পারে, এবং কিভাবেই বা একই কণিকার ঐ দুধরনের গতি ব্যাখ্যা করা হয়?...দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দেওয়া এখনই আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। হিলিয়ম II-এর তত্ত্ব খুবই জটিল এবং তা ভালোভাবে বুঝতে হলে অনেক কিছু জানার প্রয়োজন।

নমনীয়তা (Plasticity) ঃ

কোনো বস্তু থেকে প্রযুক্ত বল সরিয়ে নেওয়া হলে, বস্তুটির আগের আকার ফিরে পাওয়ার ক্ষমতাকে 'স্থিতিস্থাপকতা' (elasticity) বলে। 1 m দৈর্ঘ্য এবং 1 mm^2 প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট একটি ইস্পাতের তারে এক কিলোগ্রাম ওজন বেঁধে দেওয়া হলে তারটি প্রসারিত হবে। প্রসারণের মাত্রা হবে খুবই সামান্য—সবশুদ্ধ 0·5 mm-এর মত, কিন্তু তা পরিমাপ করা শক্ত নয়। ওজন খুলে নিলে তারটি একই 0·5 mm পরিমাণ সংকুচিত হবে আর তাই তারটির দৈর্ঘ্য পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসবে। এই ধরনের আকার বিকৃতিকে স্থিতিস্থাপক (elastic) বলা হয়।

লক্ষ্য করুন, 1 mm^2 প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট একটি তারে 1 kgf পরিমাণ বল প্রযুক্ত হলে এবং 1 cm^2 প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট অন্য একটি তারে 100 kgf বল প্রযুক্ত হলে, বলা হয় যে দুটি তারই একই পরিমাণ যান্ত্রিক পীড়নের (mechanical stress) প্রভাবে রয়েছে। তাই একটি বস্তুর আচরণ বর্ণনা করার সময় সর্বদাই উল্লেখ করা প্রয়োজন, বস্তুটির উপর প্রযুক্ত বলের (প্রস্থচ্ছেদ জানা না থাকলে যা অর্থহীন) বদলে পীড়নের পরিমাণ, অর্থাৎ একক ক্ষেত্রফলের উপর প্রযুক্ত বলের পরিমাণ। ধাতু, কাঁচ, পাথর ইত্যাদি সাধারণ বস্তুকে মাত্র শতকরা কয়েক ভাগ পর্যন্ত স্থিতিস্থাপকভাবে প্রসারিত করা যায়। রবারকে স্থিতিস্থাপকভাবে শতকরা কয়েকশো ভাগ (অর্থাৎ প্রাথমিক দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ বা তিনগুণ) প্রসারিত করা যায় এবং ছেড়ে দিলে দেখা যায় যে, সেটি আবার তার প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে এসেছে।

অল্প পরিমাণ বলের আওতায়, কোনোরকম ব্যতিক্রম ছাড়া সব বস্তুই স্থিতিস্থাপক হিসেবে আচরণ করে। কিন্তু কতকগুলি বস্তুর ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতার সীমা এসে পড়ে অপেক্ষাকৃত আগে এবং অন্য কতকগুলি বস্তুর ক্ষেত্রে অনেক পরে। যেমন, সীসার মতো নরম ধাতু তার স্থিতিস্থাপক সীমায় এসে পেঁছয়, যদি ঐ ধাতুর 1 mm^2 প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট তারে মাত্র 0·2—0·3 kgf, ওজন ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ইস্পাতের মতো দৃঢ় বস্তুগুলির ক্ষেত্রে এই স্থিতিস্থাপক সীমা পূর্বোক্ত পরিমাণের প্রায় 100 গুণ বেশী, অর্থাৎ প্রায় 25 kgf। বলের প্রভাবে স্থিতিস্থাপক সীমা পার হয়ে গেলে বস্তু যে আচরণ করে, তার ভিত্তিতে বিভিন্ন বস্তুকে দুইটি পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে ঃ ভঙ্গুর (fragile), যেমন কাচ এবং নমনীয় (plastic), যেমন মাটি।

আপনি যদি একটু ভিজে মাটি আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরেন, তাহলে আপনার আঙ্গুলের চামড়ার, এমনকি জটিল ঘূর্ণিগুলোর, ছাপও তার গায়ে উঠে যাবে। এক খণ্ড সীসা কিংবা নরম লোহা যদি হাতুড়ি দিয়ে পেটান, তাহলে তার উপর

পেটানোর দাগ থেকে যাবে। কোনো বল আর এখন প্রয়োগ করা হচ্ছে না, কিন্তু বিকৃতি থেকে গেছে—এই বিকৃতিকে (deformation) বলে নমনীয় (plastic) বা স্থায়ী (permanent) বিকৃতি। কাচের উপর আপনি এইরকম বলপ্রয়োগের ছাপ ধরে রাখাত পারবেন না : খুব বেশী চেষ্টা করলে কাচটিই ভেঙ্গে যাবে। কতকগুলি ধাতু এবং ধাতুসংকর, যেমন ঢালাই লোহা, একই রকম ভঙ্গুর। হাতুড়ি দিয়ে পেটালে কাঁচা লোহার পাত্র চেপ্টে যায় কিন্তু ঢালাই লোহার কড়া যায় ভেঙ্গে। নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান থেকে আপনি ভঙ্গুর বস্তুর শক্তি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা গড়ে তুলতে পারবেন। এক টুকরো ঢালাই লোহাকে চূর্ণবিচূর্ণ করার জন্য প্রতি বর্গ মিলিমিটার ক্ষেত্রফলের তলের উপর প্রায় 50-80 kgf পরিমাণ বলপ্রয়োগের প্রয়োজন। ইঁটের ক্ষেত্রে এই মান অনেক কম, প্রায় 1·5—3 kgf।

অন্যান্য শ্রেণীবিভাগের মতো, বস্তুর ভঙ্গুর আর নমনীয় এই দুই গোষ্ঠীতে শ্রেণীবিভাগও অনেকাংশে আপেক্ষিক। প্রথমতঃ যে বস্তু নিম্ন তাপমাত্রায় ভঙ্গুর, সেই বস্তুই আবার কখনো কখনো উচ্চতাপমাত্রায় নমনীয় হয়ে উঠতে পারে। কাচকে কয়েকশো ডিগ্রী তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে নমনীয় বস্তু হিসেবে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়। সীসার মতো নরম ধাতুকে যদিও ঠাণ্ডা অবস্থাতেই পিটিয়ে পাতে পরিণত করা যায়, দৃঢ় ধাতুগুলির ক্ষেত্রে পিটিয়ে পাতে পরিণত করার আগে, প্রয়োজন হয় সেগুলিকে লোহিততপ্ত করার। তাপমাত্রা বাড়ালে নমনীয়তাকে খুব বেশী মাত্রায় বেড়ে যেতে দেখা যায়।

নির্মাণ কার্যের উপাদান হিসেবে ধাতুর অদ্বিতীয় ভূমিকার প্রধান কারণগুলির অন্যতম হল, ঘরের তাপমাত্রায় দৃঢ়তা এবং উচ্চতাপমাত্রায় নমনীয়তা : শ্বেততপ্ত ধাতুকে অতি সহজে প্রয়োজনীয় আকার দেওয়া যায়, কিন্তু ঘরের তাপমাত্রায় এই আকার বদলাতে পারে কেবলমাত্র অতি উচ্চ বলের প্রভাবে।

কোনো বস্তুর অভ্যন্তরীণ গঠন তার যান্ত্রিক ধর্মকে মৌলিকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। কোনো বস্তুর মধ্যে ফাটল বা ছিদ্র থাকলে, স্বভাবতঃই তা বস্তুটিকে বেশী ভঙ্গুর করে তোলে।

নমনীয়তার সাহায্য নিয়ে কোনো বস্তুকে বিকৃত করার পর তার মধ্যে লক্ষণীয় মাত্রায় দৃঢ়ীভূত হওয়ার ক্ষমতা দেখতে পাওয়া যায়। গলিত ধাতু থেকে প্রাপ্ত একক কেলাস তার জন্মলগ্নে খুব নরম থাকে। অনেকগুলি ধাতুর কেলাস এমনি নরম হয় যে, তাদের আঙ্গুল দিয়ে বেঁকানো যায় ; কিন্তু তারপর আর তাদের সোজা করা যায় না। কেননা ইতিমধ্যে দৃঢ়ীভবন ঘটে যায়। ঐ একই বস্তুকে এরপর নমনীয়তা ধর্মের সাহায্যে বিকৃত করতে হলে প্রয়োজন হয়

অনেক বেশী পরিমাণ বলপ্রয়োগের। দেখা গেছে যে, নমনীয়তা শুধুমাত্র বস্তুগত ধর্মই নয়, পদ্ধতিগত ধর্মও বটে।

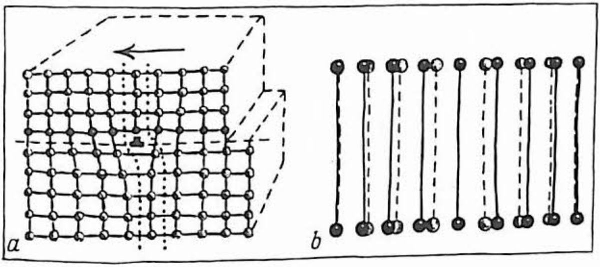
যন্ত্র তৈরী করার জন্য ধাতুকে কেন ঢালাই (cast) না করে পেটাই (forge) করা হয় ? কারণ স্বতঃসিদ্ধ—ধাতুকে পেটানো (forging) কিংবা পাকানো (rolling) কিংবা টানা (drawing) হলে, তা ঢালাই ধাতুর থেকে অনেক বেশী শক্ত হয়। কিন্তু কোনো ধাতুকে আমরা যত বেশী পেটাই করি না কেন তার দৃঢ়তাকে একটি নির্দিষ্ট সীমার উপরে তুলতে পারি না। এই সীমাকে বলে উৎপাদ পীড়ন (yield stress)। ইস্পাতের ক্ষেত্রে এর মান 30 থেকে 50 kgf/mm^2-এর মধ্যে। এই সংখ্যাগত তথ্যের অর্থ নিম্নরূপ। যদি 1 mm^2 প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট একটি ইস্পাতের তারে এক পুদ্ ওজন (উৎপাদ পীড়নের নীচে) ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তারটি একই সঙ্গে প্রসারিত আর দৃঢ়ীভূত হবে। এজন্য খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে তার প্রসারিত হওয়ার প্রক্রিয়া—ওজনটি শান্তভাবে তারে ঝুলতে থাকবে। কিন্তু যদি দুই পুদ বা তিন পুদ ওজন (উৎপাদ পীড়নের উপরে) একই ধরনের তারে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে অন্য ধরনের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। তারটি প্রসারিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত ছিঁড়ে যায়। আর একবার আপনাদের মনে করিয়ে দিই, বস্তুর যান্ত্রিক আচরণ নির্ধারণ করে প্রযুক্ত বল নয়, প্রযুক্ত পীড়ন। 100 μm^2 প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট একটি তার ছিঁড়ে পড়বে যে ওজনে তার মান (30-50) $\times 10^{-4}$ kgf, অর্থাৎ 3-5 gf।

স্থানচ্যুতি (Dislocations) :

নমনীয় বিকৃতিকরণ (plastic deformation) পদ্ধতির প্রযুক্তিগত বিপুল গুরুত্ব নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। হাতুড়ি পেটাই আর ছাঁচ পেটাই (smith and die forging), পাকানো ধাতব চাদর (rolling sheets) কিংবা টানা তার (drawing wires), এ সবই নমনীয় অবস্থায় ধাতু বিকৃতিকরণের ভিত্তিতে গড়ে তোলা প্রযুক্তিবিদ্যা।

যদি আমরা যে সব কেলাসদানা দিয়ে ধাতব দেহ গড়ে উঠেছে সেগুলিকে আদর্শ কেলাস ল্যাটিস বলে গণ্য করি, তাহলে নমনীয় বিকৃতিকরণ পদ্ধতির কিছুই বুঝতে পারবো না।

আদর্শ কেলাসের যান্ত্রিক ধর্মের তত্ত্ব অনেক বছর আগে, এই শতাব্দীর গোড়ায় দিকে, বিকশিত হয়েছিল। এই তত্ত্বের সঙ্গে পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের হাজার গুণ ফারাক। যদি সব কেলাসই আদর্শ কেলাস হতো, তাহলে তাদের প্রসার্য-শক্তির (tensile strength) মান দাঁড়াতো, বাস্তবে যা দেখা যায় তার বহুগুণ বেশী। সেক্ষেত্রে নমনীয় বিকৃতিকরণের জন্য দরকার হতো বিপুল পরিমাণ বলের।

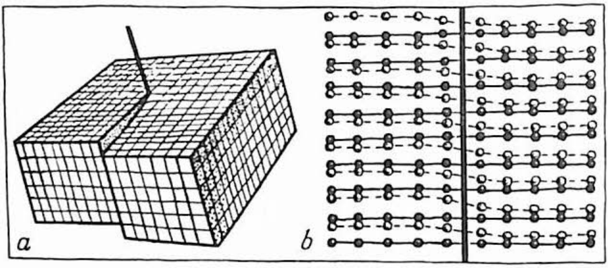


চিত্র 6·6

যথেষ্ট তথ্য দ্বারা সমর্থিত হওয়ার আগেই অনেক প্রকল্পের আবির্ভাব ঘটলো। গবেষকদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তত্ত্ব আর তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য একমাত্র গড়ে উঠতে পারে যদি ধরে নেওয়া যায় যে, কেলাসকণিকাগুলির মধ্যে ত্রুটি আছে। অবশ্য ত্রুটি যে ঠিক কেমন, সে বিষয়ে নানা ধরনের অনুমান করার অবকাশ ছিল। সঠিক ছবিটি পরিষ্কার হয়ে উঠলো ধীরে ধীরে, পদার্থবিদ্‌দের হাতে বস্তুর গঠন পরীক্ষার আধুনিক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি আসার পর থেকে। দেখা গেল, ল্যাটিসের আদর্শ খণ্ডগুলির (যাদের বলা হয় block) মাপ এক সেন্টি-মিটারের দশ লক্ষ ভাগের একভাগেরও কম। এই ব্লকগুলি পরস্পরের পরিপ্রেক্ষিতে এক সেকেণ্ডেরও কম কোণ উৎপন্ন করে অবিন্যস্ত অবস্থায় থাকে।

বিশের দশকের শেষে সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে প্রমাণিত হল যে, বাস্তব কেলাসের প্রধান ত্রুটি নিয়মিতভাবে সঠিক স্থান থেকে বিচ্যুত হওয়া, যার নাম দেওয়া হল স্থানচ্যুতি (dislocation)। চিত্র 6.6-এর মধ্যে একটি সরল বা সরলরৈখিক স্থানচ্যুতির দৃষ্টান্তকে উপস্থিত করা হয়েছে। এই ত্রুটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, কেলাসের মধ্যে এমন কতকগুলি স্থান থাকে যেখানে বাড়তি পরমাণুক তল রয়েছে বলে মনে হয় (যার জন্য এর নাম হয়েছে 'উদ্বৃত্ত তল')। চিত্র 6.6***a***-তে অঙ্কিত আনুভূমিক নির্দেশক সরলরেখা দুটি ব্লককে বিভক্ত করেছে। কেলাসটির উপরের অংশ সঙ্কোচনের (compression) এবং নীচের অংশ টানের (tension) মধ্যে রয়েছে। কেলাসটির মধ্যে যে স্থানচ্যুতির প্রভাব ক্রমশঃ মিলিয়ে যায়, তা চিত্র 6.6*b*-এর (যা বাঁদিকের ছবিটিরই উপর থেকে দেখা দৃশ্য) দিকে তাকালে পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

অন্য আর এক ধরনের স্থানচ্যুতি প্রায়ই কেলাসে দেখতে পাওয়া যায়, যাকে স্ক্রু-স্থানচ্যুতি বলে। চিত্র 6.7.-এ এই ধরনের স্থানচ্যুতির কাঠামো দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে ল্যাটিস এমন দুটি ব্লকে বিভক্ত, যার মধ্যে একটিকে মনে হয়

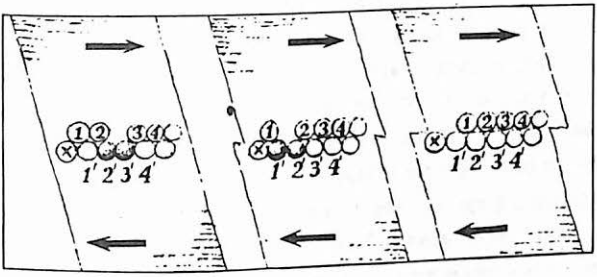


চিত্র 6.7

অন্য একটির মধ্যে এক ল্যাটিস ধ্রুবক পরিমাণ ঢুকে গেছে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, সর্বাধিক ত্রুটি ঘটেছে উল্লম্ব অক্ষের কাছাকাছি। উল্লম্ব অংশের সংলগ্ন এই অঞ্চলে স্ক্রু-স্থানচ্যুতি ঘটেছে বলে বলা হয়।

উপরোক্ত স্থানচ্যুতি সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা হবে চিত্রের অন্য অংশটির (চিত্র 6.7***b***) দিকে তাকালে, যার মধ্যে অক্ষ দিয়ে অতিক্রান্ত উল্লম্ব তলের (যার উপর চ্যুতি ঘটেছে) দুই দিকে সংলগ্ন দুটি পরমাণুক তলকে দেখানো হয়েছে। ত্রিমাত্রিক তলের পরিপ্রেক্ষিতে এটি ডান দিক থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে আমরা স্ক্রু-স্থানচ্যুতির অক্ষকে অন্য চিত্রটির মতই দেখতে পাচ্ছি। ডানদিকের ব্লকের অন্তর্ভুক্ত পরমাণুক তলকে সম্পূর্ণ রেখার সাহায্যে এবং বাঁদিকের ব্লকের অন্তর্ভুক্ত পরমাণুক তলকে ভগ্নরেখার সাহায্যে দেখানো হয়েছে। কালো বৃত্তগুলি হাল্কা বৃত্তগুলির তুলনায় পাঠকের বেশী কাছে আছে। ছবি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, স্ক্রু-স্থানচ্যুতি সরলরৈখিক স্থানচ্যুতির থেকে স্বতন্ত্র অন্য আর এক ধরনের স্থানচ্যুতি। এক্ষেত্রে পরমাণুর কোনো বাড়তি সারি দেখতে পাওয়া যায় না। স্থানচ্যুতির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, পরমাণুর সারি স্থানচ্যুতি-অক্ষের কাছে এসে তাদের নিকটতম প্রতিবেশী বদল করে। তারা নীচের দিকে বেঁকে এসে এক ধাপ নীচের সারির প্রতিবেশীর সঙ্গে মিলিত হয়ঃ

এই স্থানচ্যুতিকে কেন স্ক্রু-স্থানচ্যুতি বলা হয়? কল্পনা করুন আপনি পরমাণুর থেকেও ছোট আকার গ্রহণ করে পরমাণুদের মধ্যে বেড়াতে বেরিয়েছেন এবং ঠিক করেছেন স্থানচ্যুতি অক্ষের ভিতর দিয়ে ঘুরবেন। স্পষ্টতঃ আপনি যদি নিম্নতম তল থেকে যাত্রা শুরু করে থাকেন, তাহলে প্রত্যেক বার যাওয়ার সময় এক ধাপ উপরে উঠে আসবেন এবং শেষ পর্যন্ত বেরোবেন কেলাসের একেবারে উপরের তল থেকে, যেন স্ক্রু-এর মতন প্যাঁচানো এক সিঁড়ি বেয়ে আপনি কোনো মিনারের চূড়ায় এসে পেঁছেছেন। প্রদর্শিত চিত্রে ঘড়ির কাঁটার গতিপথের



চিত্র 6.8

উল্টোদিকে এগোলে উপরে ওঠা যাবে। যদি ব্লকগুলির চ্যুতি বিপরীত দিকে থাকতো, তাহলে উপরে ওঠার জন্য ঘড়ির কাঁটার গতিপথকে অনুসরণ করার প্রয়োজন হতো।

এবার আমরা কিভাবে নমনীয় বিকৃতিকরণ ঘটে, সেই প্রশ্নের জবাব দেবো। ধরুন আমরা কোনো কেলাসের উপরের অর্ধাংশকে নীচের অর্ধাংশের পরিপ্রেক্ষিতে এক পরমাণুক দূরত্বে সরাতে চাই। স্পষ্টতঃ কৃন্তন তল (shear plane) উপস্থিত সব কটি পরমাণুকেই নড়াতে হবে। কিন্তু কেলাসে স্থানচ্যুতি থাকলে কৃন্তন বল প্রয়োগের সময় সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র দেখতে পাওয়া যায়।

চিত্র 6.8-এ যে গোলকদের ঘনসন্নিবিষ্ট সমাবেশ (প্রত্যেক সারির কেবলমাত্র শেষের গোলকটিকে দেখা যাচ্ছে) প্রদর্শিত হয়েছে তাতে উপরের দুটি সারির মধ্যবর্তী স্থানে একটি শূন্যস্থান (অনেকটা ফাটলের আকারের) সমেত সরলরৈখিক স্থানচ্যুতি রয়েছে। এবার আমরা উপরের ব্লককে নীচের ব্লকের পরিপ্রেক্ষিতে ডানদিকে সরাবো। বোঝার সুবিধে হবে বলে আমরা গোলকগুলিকে গাণিতিক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করেছি ; যে সংখ্যাগুলির উপরে তীর্যক চিহ্ন সেগুলি সঙ্কুচিত (নীচের) স্তরের গোলকগুলিকে সূচিত করেছে। ধরুন প্রাথমিক অবস্থায় ফাটলটি 2 নং এবং 3 নং সারির মধ্যে রয়েছে। 2´ নং এবং 3´ নং গোলকদুটি আছে সঙ্কুচিত অবস্থায়। সরানোর জন্য বল প্রযুক্ত হলে 2 নং গোলক ফাটলে এসে ঢুকবে। এখন 3´ নং সারি 'মুক্তির নিঃশ্বাস' ফেলবে, কিন্তু 1´ নং সারি কম জায়গায় সঙ্কুচিত হবে। ফল কি দাঁড়াবে ? গোটা স্থানচ্যুতিটিই বাঁদিকে সরে আসবে এবং এই রকম সরণ চলতেই থাকবে যতক্ষণ না ঐ স্থানচ্যুতি কেলাস থেকে একেবারে বেরিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সমস্ত তলটির এক পরমাণুক সারি সরণ ঘটবে অর্থাৎ আদর্শ কেলাসে কৃন্তন বল প্রয়োগের ফলে ঠিক যা ঘটেছিল, তাই ঘটবে।

স্থানচ্যুতিজনিত সরণের ফলে যে কৃন্তন ঘটে তার জন্যে স্পষ্টতঃ তুলনামূলক-ভাবে অনেক কম বলের প্রয়োজন হয় এবং এ সম্পর্কে দীর্ঘ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। আদর্শ কেলাসের ক্ষেত্রে কৃন্তনের সময়ে পরমাণুগুলির পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া বলকে অতিক্রম করার জন্য সব কটি পরমাণুসারিকে একই সঙ্গে নড়ানোর প্রয়োজন। কিন্তু স্থানচ্যুতি কৃন্তনের সময়ে একটি বিশেষ মুহূর্তে নড়ানোর প্রয়োজন হয় কেবলমাত্র একটি সারিকে।

স্থানচ্যুতি নেই ধরে নিলে কৃন্তন বলের বিরুদ্ধে কেলাসে হিসেব অনুযায়ী যে দৃঢ়তা থাকা উচিত, বাস্তব পরীক্ষার সাহায্যে দেখা গেছে যে, কেলাসের দৃঢ়তা আসলে তার শতাংশেরও কম। এমনকি খুব সামান্য সংখ্যক স্থানচ্যুতির অস্তিত্বও একটি বস্তুর দৃঢ়তাকে অনেকখানি কমিয়ে দেয়।

পূর্বের আলোচনা থেকে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, যার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। চিত্র থেকে (চিত্র 6.8) প্রতীয়মান হয় যে, প্রযুক্ত বল স্থানচ্যুতিকে কেলাস থেকে 'বহিষ্কৃত' করে। এর অর্থ এই যে, আমরা যত বিকৃতির মাত্রা বাড়াবো, কেলাসটি তত বেশী মজবুত হয়ে উঠবে। শেষপর্যন্ত শেষ স্থানচ্যুতিটিও অপসারিত হলে, তত্ত্ব অনুযায়ী, কেলাসটির দৃঢ়তা অবিকৃত কেলাসের তুলনায় প্রায় শতগুণ বেড়ে যাবে। বাস্তবেও দেখা যায় যে, বিকৃতির ফলে কেলাসের দৃঢ়তা বাড়ে ; কিন্তু শতগুণ নয়, তার চেয়ে অনেক কম। স্ক্রু-স্থানচ্যুতি এই সংকট থেকে আমাদের রক্ষা করে। প্রমাণিত হয়েছে যে, (এক্ষেত্রে পাঠককে আমাদের কথা বিশ্বাস করে নিতে হবে, কেননা বিষয়টি ছবির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা দুঃসাধ্য) স্ক্রু-স্থানচ্যুতিকে সহজে কেলাস থেকে অপসারিত করা যায় না, কিন্তু কেলাসের কৃন্তন ঐ দুরকম স্থানচ্যুতির সাহায্যেই ঘটতে পারে। স্থানচ্যুতির তত্ত্ব কেলাসের তলে কৃন্তন প্রক্রিয়াকে সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছে। অতি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী, কেলাস বরাবর বিশৃঙ্খলতার গতির (motion of disorder) ফলেই কেলাসের নমনীয় বিকৃতি ঘটে।

কাঠিন্য (Hardness) ঃ

কাঠিন্য আর দৃঢ়তা সমার্থক শব্দ নয়। একগাছি দড়ি, এক টুকরো কাপড় কিংবা সিল্কের সুতোর মধ্যে যথেষ্ট দৃঢ়তা (strength) থাকতে পারে—তাদের ছেড়ার জন্য দরকার হতে পারে অনেকখানি পীড়নের। কিন্তু তাহলেও কেউ বলবেন না যে, দড়ি কিংবা কাপড়ের কাঠিন্য আছে। আবার কাচের দৃঢ়তা যদিও বেশী নয় তবু কাচের কাঠিন্য বেশী।

প্রযুক্তিবিজ্ঞানে কাঠিন্যের ধারণা এসেছে প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। কাঠিন্য বলতে বোঝায় ভেদ করার ক্ষেত্রে বাধা। যদি কোনো বস্তুতে আঁচড়

দেওয়া শক্ত হয়, যদি তার উপর ছাপ দেওয়া শক্ত হয়, তাহলে বলা হয় তার কাঠিন্য বেশী। এই ধরনের সংজ্ঞা পাঠকদের কাছে অস্পষ্ট মনে হতে পারে। আমরা ভৌত আচরণকে সংখ্যার সাহায্যে প্রকাশ করতেই বেশী অভ্যস্ত। কিন্তু কাঠিন্য সম্পর্কে কিভাবে তা করা সম্ভব?

একটি পুরানো হলেও প্রয়োজনীয় পদ্ধতিকে মণিকবিদরা (mineralogist) বহুদিন ব্যবহার করে আসছেন। দশটি নির্দিষ্ট খনিজ পদার্থকে একটি সারিতে সাজানো হয়। প্রথমটি হীরক, তারপর কোরাণ্ডাম, তারপর একে একে টোপাজ, কোয়ার্টজ, ফেল্ডস্পার, অ্যাপেটাইট, ফ্লুয়োস্পার, ক্যাল্‌সাইট, জিপ্‌সাম এবং ট্যাল্‌ক। এই সারিটি নিম্নলিখিতভাবে সৃষ্ট হয়েছে ঃ হীরক দিয়ে এই সারির অন্য সব বস্তুর উপর দাগ কাটা যায়, কিন্তু অন্য কোনো বস্তু দিয়ে হীরকের উপর আঁচড় দেওয়া যায় না। এর অর্থ হীরকের কাঠিন্য সবচেয়ে বেশী। হীরকের কাঠিন্যকে 10 সংখ্যা দ্বারা সূচিত করা হয়। হীরকের পরেই স্থান কোরাণ্ডামের। এটি এর পরবর্তী অন্য সব খনিজের উপর আঁচড় কাটতে পারে, তাই এর কাঠিন্য ওগুলির চেয়ে বেশী। কোরাণ্ডামের কাঠিন্যসূচক সংখ্যা 9। একই ভাবে টোপাজ, কোয়ার্টজ এবং ফেল্ডস্পারের কাঠিন্যকে যথাক্রমে 8, 7 এবং 6 দ্বারা সূচীত করা হয়েছে একই কারণে। এদের প্রত্যেকটির কাঠিন্য পরবর্তী খনিজের চেয়ে বেশী (অর্থাৎ তাদের উপর এটি আঁচড় কাটতে পারে), কিন্তু কাঠিন্যসূচক উচ্চতর সংখ্যা বিশিষ্ট পূর্ববর্তী খনিজগুলির চেয়ে কম (অর্থাৎ তাদের দ্বারা নিজের উপর আঁচড় পড়ে)। সবচেয়ে কম কাঠিন্য ট্যাল্‌কের, এর কাঠিন্যসূচক সংখ্যা 1।

উপরোক্ত মাপকাঠির সাহায্যে কাঠিন্য 'পরিমাপ' (এক্ষেত্রে অবশ্যই শব্দটিকে উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রাখতে হবে) করতে হলে ঐ দশটি প্রমাণ কাঠিন্যের বস্তুর মধ্যে বিবেচ্য খনিজের স্থান নির্ধারণ করতে হবে। যদি বিবেচ্য খনিজটিকে কোয়ার্টজ দ্বারা আঁচড় কাটা যায় কিন্তু সেটি নিজে ফেল্ডস্পারের গায়ে দাগ কাটতে পারে, তাহলে তার কাঠিন্য 6·5।

ধাতুবিদরা কাঠিন্য মাপার জন্য অন্য আরেক পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন। এক নির্দিষ্ট পরিমাণ চাপের (সাধারণতঃ 3000 kgf) সাহায্যে পরীক্ষাধীন বস্তুটির গায়ে একটি 1 cm ব্যাসবিশিষ্ট ইস্পাতের গুলির ছাপ তোলা হয়। উৎপন্ন ছোট গর্তটির ব্যাসার্ধকে কাঠিন্য নির্দেশক সংখ্যা হিসেবে গণ্য করা হয়।

আঁচড় কেটে মাপা কাঠিন্য আর চাপ দিয়ে মাপা কাঠিন্য সবসময়ে একরকম নাও হতে পারে। একটি বস্তুর কাঠিন্য আঁচড় কেটে পরীক্ষার সাহায্যে হয়তো অন্য এক বস্তুর চেয়ে বেশী হতে পারে, কিন্তু চাপ দিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে কম।

সেইজন্য, পরিমাপ পদ্ধতির উপর মোটেই নির্ভরশীল নয়, কাঠিন্য সম্পর্কে এমন কোনো সার্বজনীন ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। কাঠিন্য সম্পর্কিত প্রত্যয়, কোনো ভৌত প্রত্যয় নয়, সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত প্রত্যয়।

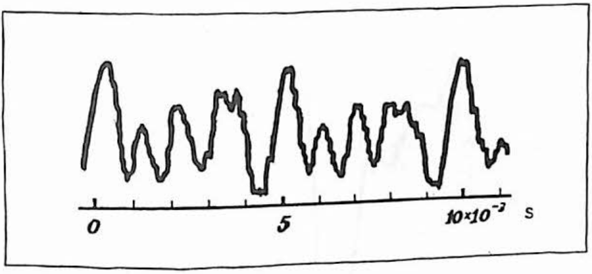
শব্দ কম্পন এবং তরঙ্গ (Sound Vibrations and Waves) ঃ

আমরা ইতিমধ্যেই পাঠকদের স্পন্দন (oscillation) সম্পর্কে অনেক তথ্য সরবরাহ করেছি। কিভাবে পেণ্ডুলাম এবং স্প্রিং-এ বাঁধা বল স্পন্দিত হয় কিংবা একটি তারের স্পন্দনের সময় যে সব নিয়ম দেখতে পাওয়া যায়, সে সবই আমরা প্রথম বইয়ের একটি অধ্যায়ের মধ্যে আলোচনা করেছি। কিন্তু বায়ু বা অপর কোনো মাধ্যমের মধ্যে একটি বস্তু স্পন্দিত হলে, সেই মাধ্যমের মধ্যে যে ঠিক কি ঘটবে, সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ করিনি। নিঃসন্দেহে মাধ্যমটি কম্পনের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। স্পন্দনশীল বস্তু বায়ুতে ধাক্কা দিয়ে তার কণিকাগুলিকে প্রাথমিক অবস্থান থেকে স্থানচ্যুত করে। তাছাড়া এই ধরনের আলোড়ন যে শুধু বস্তু সংলগ্ন বায়ুস্তরেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, সেকথাও বুঝতে অসুবিধে হয় না। বস্তুটি তার নিকটতম বায়ুস্তরে ধাক্কা দিলে, সেই স্তর আবার তার পরবর্তী স্তরের উপর চাপ সৃষ্টি করে, এইভাবে স্তরের পর স্তর, কণিকার পর কণিকা, পরিবেশের সমস্ত বায়ুতে আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ে। তখন আমরা বলি, বায়ু কম্পিত হতে শুরু করেছে, কিংবা বায়ুর মধ্যে 'শব্দ কম্পনের' উৎপত্তি হয়েছে।

আমরা মাধ্যমের কম্পনকে শব্দকম্পন বলি, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এই ধরনের সব কম্পনকেই আমরা শুনতে পাই। পদার্থবিদ্যায় 'শব্দকম্পন' কথাটিকে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করা হয়। এই সব শব্দকম্পনের মধ্যে কোন কোনটিকে আমরা শুনতে পাবো, সে বিষয়ে এবার আলোচনা করা হবে।

আমরা বায়ু নিয়ে আলোচনা করছি, কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শব্দ বায়ুর মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়। কিন্তু নিঃসন্দেহে বায়ুর এমন কোনো বিশেষ গুণ নেই যার জন্য তাকে শব্দকম্পন সৃষ্টির একচেটে অধিকারী হিসেবে স্বীকার করতে হবে। সংকুচিত হবার ক্ষমতা আছে এমন যে কোনো মাধ্যমই শব্দকম্পন সৃষ্টি করতে পারে। যেহেতু জগতে এমন কোনো বস্তু নেই যা সংকুচিত হয় না, তাই সব বস্তুকণিকারই শব্দকম্পন সৃষ্টির ক্ষমতা আছে। এই ধরনের কম্পন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে সাধারণতঃ অ্যাকাউস্টিক্স (accoustics) বলা হয়।

শব্দকম্পনের সময়ে বায়ুর প্রত্যেক কণিকা গড় হিসাবে একই জায়গায় থাকে—শুধু সে স্পন্দিত হয় একটি সাম্য অবস্থানের চারিদিকে। সরলতম ক্ষেত্রে বায়ুকণিকার স্পন্দনের চরিত্র 'পর্যাবৃত্ত স্পন্দন' (harmonic oscillation), যার



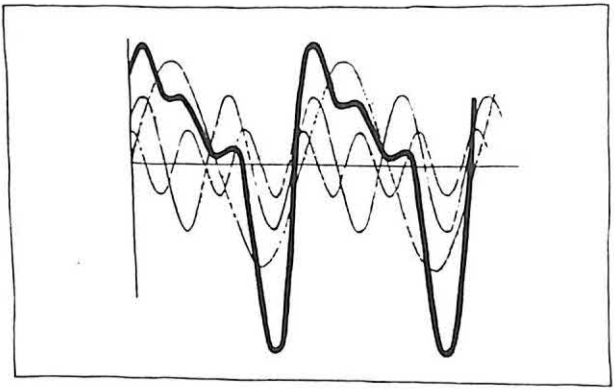
চিত্র 6.9

সাইনরেখ নিয়ম (sinusoidal law) সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধরনের স্পন্দনের বৈশিষ্ট্য, কণিকার সাম্য অবস্থান থেকে সর্বাধিক সরণ (বিস্তার বা amplitude) এবং স্পন্দনকাল বা দোলনকাল (period of oscillation), অর্থাৎ একটি সম্পূর্ণ দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়।

শব্দকম্পনের ধর্ম বর্ণনা করার সময়ে স্পন্দনকালের চেয়ে বেশী ব্যবহার করা হয় কম্পাঙ্ককে (frequency of vibration)। কম্পাঙ্ক $\nu = 1/T$, অর্থাৎ কম্পাঙ্ক দোলনকালের অন্যোন্যক। কম্পাঙ্কের একক, সেকেণ্ডের অন্যোন্যক $1/s$ বা s^{-1}। কম্পাঙ্ক $100s^{-1}$ বলার অর্থ, এক সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে বায়ুকণিকা 100টি সম্পূর্ণ স্পন্দন ঘটাচ্ছে। যেহেতু পদার্থবিদ্যায় আমাদের প্রায়ই এমন সব কম্পাঙ্ক নিয়ে আলোচনা করতে হয় যাদের পরিমাণ হার্টস (Hertz)-এর চেয়ে অনেক বেশী, তাই কিলোহার্টস এবং মেগা-হার্টস একককেও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়; $1\ kHz = 10^3\ Hz$, $1\ MHz = 10^6\ Hz$।

কম্পনশীল কণিকা যখন তার সাম্যঅবস্থান দিয়ে যায়, সেই মুহূর্তে তার দ্রুতি থাকে সর্বাধিক। অন্যদিকে, সর্বাধিক সরণের অবস্থানে স্বভাবতঃই তার দ্রুতি শূন্য। আমরা আগেই বলেছি যে, যদি কণিকার সরণ পর্যাবৃত্ত স্পন্দনের নিয়ম মেনে চলে, তাহলে তার কম্পনের দ্রুতিও সেই নিয়ম মেনে চলবে। সরণের সর্বোচ্চ মানকে (বিস্তার) s_0 এবং দ্রুতির সর্বোচ্চ মানকে v_0 ধরলে; $v_0 = 2\pi s_0/T$, অর্থাৎ $v_0 = 2\pi\nu s_0$। চেঁচিয়ে কথা বললে বায়ুকণিকার কম্পনের যে বিস্তার হয় তার পরিমাণ এক সেণ্টিমিটারের কয়েক নিযুত ভাগের একভাগ মাত্র। এক্ষেত্রে দ্রুতির সর্বোচ্চ মানের পরিমাণ প্রায় 0·02 cm/s।

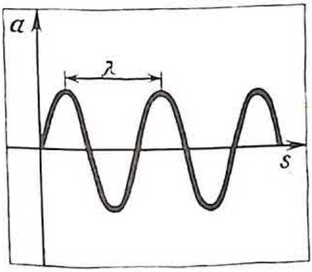
কণিকার সরণের মানের এবং দ্রুতির মানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য যে আরেকটি ভৌতমানের পরিবর্তন হয়, তা হল 'অতিরিক্ত চাপ' (excess



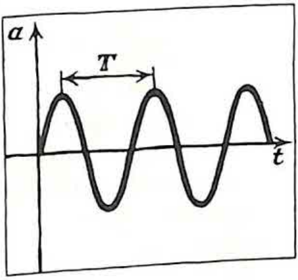
চিত্র 6.10

pressure) বা শব্দচাপ (sound pressure)। বায়ুতে শব্দকম্পনের ফলে মাধ্যমের প্রত্যেক বিন্দুতে লঘুভবন আর ঘনীভবনের পর্যাবৃত্ত পরিবর্তন ঘটে। বায়ুর যে কোনো বিন্দুতে শব্দ না থাকলে যে চাপ হতো, চাপের সেই মান শব্দের ফলে মুহূর্তে মুহূর্তে কমে বাড়ে। চাপের মানের এই বৃদ্ধিকে (বা হ্রাসকে) শব্দ-চাপ বলে। শব্দচাপ প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের এক নগণ্য অংশ মাত্র। চেঁচিয়ে কথা বলার সময়েও শব্দচাপের বিস্তার বায়ুমণ্ডলীয় চাপের নিযুতভাগের মাত্র একভাগের কাছাকাছি। শব্দচাপ কম্পিত কণিকার দ্রুতির সঙ্গে সমানুপাতিক, এবং এই দুই ভৌত রাশির অনুপাত শুধুমাত্র মাধ্যমের ধর্মের উপর নির্ভরশীল এক ধ্রুবক। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, 0·025 cm/s দ্রুতিতে কম্পন বায়ুতে 1 dyn/cm² শব্দচাপের সমতুল্য।

সাইনরেখ নিয়ম অনুযায়ী একটি তারের কম্পন বায়ুকণিকাগুলির মধ্যে পর্যাবৃত্ত স্পন্দন সৃষ্টি করে। কোলাহল এবং সুরযুক্ত শব্দ আরও জটিল চিত্রের জন্ম দেয়। শব্দকম্পন বিষয়ে একটি লেখচিত্র—সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শব্দচাপের পরিবর্তন—চিত্র 6.9-এ উপস্থিত করা হয়েছে। এই লেখচিত্রের সঙ্গে সাইন তরঙ্গের সাদৃশ্য খুবই কম। অবশ্য প্রমাণিত হয়েছে যে, যে কোনো জটিল কম্পনকে বিভিন্ন মাত্রার বিস্তার ও কম্পাঙ্কযুক্ত অনেকগুলি সাইন তরঙ্গের উপরিপাতের (super-position) সাহায্যে গড়ে তোলা যায়। অনুরূপ ক্ষেত্রে বলা হয় যে সরল কম্পন-গুলি একত্রিতভাবে জটিল কম্পনটির বর্ণালী গঠন করেছে। একটি সরল দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে এই ধরনের কম্পনের উপরিপাতকে চিত্র 6.10-এর মধ্যে দেখানো হয়েছে।



চিত্র 6.11



চিত্র 6.12

শব্দবিস্তার প্রক্রিয়া তাৎক্ষণিক হলে বায়ুর সব কণিকা একই সঙ্গে কম্পিত হতো। কিন্তু শব্দবিস্তার প্রক্রিয়া তাৎক্ষণিক নয় এবং তাই শব্দবিস্তারের রেখায় উপস্থিত বায়ুর অংশগুলি পালাক্রমে গতিশীল হয়, যেন কোনো উৎস থেকে ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে তাদের প্রভাবিত করেছে; ঠিক যেমনটি দেখতে পাওয়া যায় জলে ঢিল ফেললে, যখন বৃত্তাকারে একের পর এক তরঙ্গ এসে জলে ভাসা কুটোকে পর্যায়ক্রমে গতিশীল করে।

এবার একটিমাত্র কম্পনশীল কণিকার উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করা যাক এবং তার আচরণ তুলনা করা যাক শব্দবিস্তারের একই রেখায় অবস্থিত অন্যান্য কণিকাদের সঙ্গে। তার সবচেয়ে কাছের কণিকাটি কম্পিত হবে কিছু পরে, তার পরের কণিকাটি আরো কিছু পরে। কম্পনের এই বিলম্ব ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে এবং শেষপর্যন্ত আমরা এমন এক কণিকার কাছে গিয়ে পৌঁছবো যার বিলম্বের পরিমাণ একটি সম্পূর্ণ স্পন্দনকালের সমান আর তাই তার কম্পন হবে প্রারম্ভিক কণিকার সঙ্গে একসাথে। ঠিক যেন এক অসফল দৌড়বাজ দৌড়তে দৌড়তে প্রথম দৌড়বাজের চেয়ে পুরো এক পাক পিছিয়ে পড়ে একই সঙ্গে শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু ঠিক কতখানি দূরত্বে আমরা সেই কণিকাটিকে খুঁজে পাবো যেটি প্রথম কণিকার সঙ্গে একসাথে কম্পিত হচ্ছে? এই দূরত্ব λ যে শব্দ বিস্তারের গতি c এবং কম্পনকাল T-এর গুণফলের সমান, তা বুঝতে পারা মোটেই শক্ত নয়ঃ

$$\lambda = cT$$

আমরা λ দূরত্ব পরপর এমন সব বিন্দুর সাক্ষাৎ পাবো, যারা প্রথম বিন্দুটির সঙ্গে একসাথে কম্পিত হচ্ছে। λ/2 দূরত্বে অবস্থিত বিন্দুগুলি পরস্পরের পরিপ্রেক্ষিতে এমনভাবে গতিশীল থাকবে, যেমনটি আমরা দেখি আয়নার সামনে

উল্লম্বভাবে কম্পনশীল একটি বিন্দুকে তার প্রতিবিম্বের পরিপ্রেক্ষিতে গতিশীল থাকতে।

যদি আমরা পর্যাবৃত্ত শব্দের বিস্তারের রেখা বরাবর প্রত্যেকটি বিন্দুর সরণ (কিংবা দ্রুতি, কিংবা শব্দচাপ) চিহ্নিত করি তাহলে আমরা আর একবার সাইনতরঙ্গের সাক্ষাৎ পাবো।

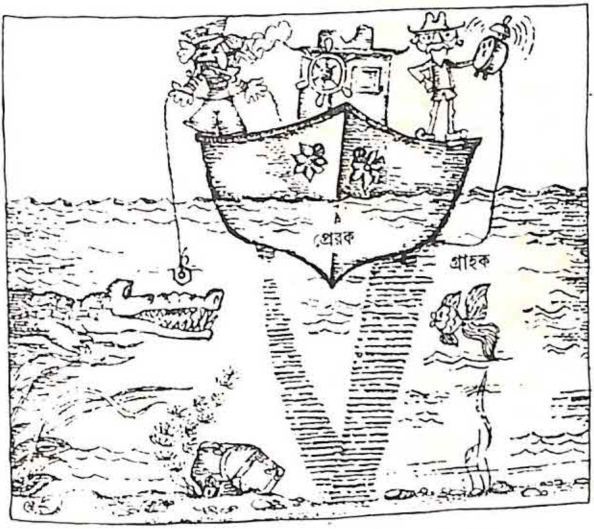
তরঙ্গগতি আর কম্পাঙ্কের লেখচিত্রকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। 6.11 এবং 6.12 চিত্রের মধ্যে খুবই সাদৃশ্য আছে, কিন্তু আনুভূমিক অক্ষ বরাবর প্রথম ক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছে দূরত্ব আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সময়। একটি চিত্র সূচিত করে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কম্পনের পরিবর্তনকে, আর অন্য চিত্র ফুটিয়ে তোলে তরঙ্গের তাৎক্ষণিক রূপকে। এই দুই লেখচিত্র তুলনা করলে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে স্থানভিত্তিক পর্যায়ও বলা চলে, কেননা স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে λ-এর ভূমিকা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে T-এর ভূমিকার সমতুল্য।

শব্দ তরঙ্গের লেখচিত্রে উল্লম্ব অক্ষ বরাবর কণিকার সরণ এবং আনুভূমিক অক্ষ বরাবর চিহ্নিত দূরত্বে তরঙ্গবিস্তারের অভিমুখ সূচিত করা হয়। উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এই ভুল ধারণার উদ্রেক হতে পারে যে, কণিকাগুলির সরণ ঘটে তরঙ্গবিস্তারের গতিপথের লম্ব অভিমুখে। কিন্তু বাস্তবে বায়ুকণিকা সর্বদাই শব্দ-বিস্তারের অভিমুখ বরাবর কম্পিত হয়। এই ধরনের তরঙ্গকে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ (longitudinal wave) বলে।

আলোর গতি শব্দের তুলনায় অত্যন্ত বেশী; আলোর সঞ্চালন প্রায় তাৎক্ষণিক। বজ্রপাত এবং তড়িৎক্ষরণ একই সঙ্গে ঘটে; আমরা তড়িৎক্ষরণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের চমক দেখতে পাই, কিন্তু বজ্রপাতের শব্দ আমাদের কাছে এসে পৌঁছয় প্রতি তিন সেকেণ্ডে এক কিলোমিটার বেগে (বায়ুতে শব্দের বেগ 330 m/s)। তাই বজ্রপাতের শব্দ কানে পৌঁছলে তারপর আর সেই বিশেষ বজ্রপাতের ফলে বিদ্যুতাহত হওয়ার বিপদ থাকে না।

শব্দ-বিস্তারের বেগ জানা থাকলে, আমরা হিসেব করে বলতে পারি, কতদূরে বজ্রঝঞ্ঝা হচ্ছে। যদি বিদ্যুৎচমক দেখার 12 সেকেণ্ড পরে বজ্রপাতের আওয়াজ কানে আসে তাহলে বলা যায় বজ্রঝঞ্ঝা 4 কিলোমিটার দূরে রয়েছে।

গ্যাসের মধ্যে শব্দের বেগ গ্যাস-অণুগুলির গড় বেগের প্রায় সমান। শব্দের এই বেগ গ্যাসের ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল নয়, কিন্তু তার পরম তাপাঙ্কের বর্গমূলের সঙ্গে সমানুপাতিক। গ্যাসের তুলনায় তরলের ভিতর দিয়ে শব্দ বিস্তারের বেগ বেশী। জলের ভিতর দিয়ে শব্দ বিস্তারের বেগ 1450 m/s, অর্থাৎ বায়ুর তুলনায় 4·5 গুণ বেশী। কঠিনের মধ্যে শব্দের বেগ আরো বেশী; যেমন লোহার মধ্যে এই বেগ 6000 m/s।



চিত্র 6.13

শব্দ একটি মাধ্যম থেকে অন্য একটি মাধ্যমে প্রবেশ করলে, বিস্তারের বেগ পরিবর্তিত হয়। কিন্তু একই সঙ্গে অন্য একটি লক্ষণীয় ঘটনা ঘটে—দুটি মাধ্যমের মধ্যবর্তী সীমানা থেকে শব্দ আংশিকভাবে প্রতিফলিত হয়। শব্দের কত অংশ প্রতিফলিত হবে, তা নির্ভর করে প্রধানতঃ ঘনত্বের অনুপাতের উপর। যখন শব্দ বায়ুর ভিতর দিয়ে যেতে যেতে কোনো তরল বা কঠিন তলের উপর আপতিত হয় কিংবা বিপরীতভাবে ঘন মাধ্যম থেকে বায়ুতে এসে পড়ে, তখন তা প্রায় সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়। যখন শব্দ বায়ু থেকে জলে কিংবা বিপরীত-ক্রমে জল থেকে বায়ুতে আপতিত হয়, তখন সেই শব্দের মাত্র হাজার ভাগের একভাগ অপর মাধ্যমে প্রবেশ করতে পারে। যদি দুটি মাধ্যমই ঘন হয়, তাহলে প্রতিফলিত এবং সঞ্চালিত অংশের অনুপাত কম হতে পারে। যেমন ইস্পাত থেকে জলে কিংবা জল থেকে ইস্পাতের মধ্যে আপতিত হলে শব্দের 13% সঞ্চালিত হয় এবং 87% প্রতিফলিত হয়।

নৌচালনের ক্ষেত্রে শব্দের প্রতিফলন ক্ষমতাকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। এরই ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে গভীরতা মাপার এক যন্ত্র—sonic depth finder। জাহাজের একপ্রান্তে জলের নীচে একটি শব্দ উৎপন্ন করার উৎস স্থাপন করা হয় (চিত্র 6·13)। ধারাবাহিকতাহীন শব্দ যে শব্দরশ্মি

উৎপন্ন করে, তা জলের গভীরতা অতিক্রম করে নদী বা সাগরের তলদেশে পৌঁছয় এবং প্রতিফলিত হয়ে আংশিকভাবে জাহাজে ফিরে আসে, যেখানে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাকে ধরা হয়। শব্দের যাত্রাপথ অতিক্রম করার সময় নির্ণয় করা হয় সঠিক ঘড়ির সাহায্যে এবং জলের মধ্যে শব্দের বেগ জানা থাকায়, সহজেই হিসেব করে গভীরতা সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

শব্দকে নীচের বদলে পাশের বা সামনের দিকে চালনা করলে, তার সাহায্যে কাছাকাছি ভাসমান হিমশৈল বা বিপজ্জনক ডুবোপাহাড় আছে কি না তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

একটি কম্পনশীল বস্তুর পরিমণ্ডলে যে বায়ু আছে, তার সব কণিকাই কম্পনশীল অবস্থায় থাকে। আমরা ইতিমধ্যেই প্রথম বইতে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছি যে, সাইন-নিয়ম (sinusoidal law) অনুযায়ী কম্পনশীল কোনো ভরবিন্দুর মোট শক্তির পরিমাণ সব সময়ে নির্দিষ্ট।

যখন কম্পনশীল বিন্দুটি তার সাম্য অবস্থানের ভিতর দিয়ে যায়, সেই মুহূর্তে তার দ্রুতি সর্বাধিক। যেহেতু সেই বিশেষ মুহূর্তে তার সরণের পরিমাণ শূন্য, তাই সেই মুহূর্তে তার সব শক্তিটুকুই গতিশক্তি ঃ

$$E = \frac{mv^2_{max}}{2}$$

সুতরাং মোট শক্তি কম্পনদ্রুতির বিস্তারের বর্গের সমানুপাতিক। শব্দতরঙ্গে কম্পনশীল বায়ুকণিকার ক্ষেত্রেও উপরোক্ত সম্পর্ক সিদ্ধ। কিন্তু একটি বায়ুকণিকার ক্ষেত্র খুব সুনির্দিষ্ট নয়। তাই একক আয়তনের শব্দশক্তি নির্ণয় করা হয়। এই মানকে শব্দশক্তির ঘনত্বও বলা চলে।

যেহেতু একক আয়তনের ভরকে ঘনত্ব ρ বলা হয়, তাই শব্দশক্তির ঘনত্ব

$$w = \frac{\rho v^2_{max}}{2}$$

পূর্বে আমরা এমন আরেকটি ভৌতরাশির বিষয়ে উল্লেখ করেছি, যা সাইন-নিয়ম অনুযায়ী দ্রুতির সমান কম্পাঙ্কে কম্পিত হয় ; সে ভৌতরাশির নাম শব্দ-চাপ বা অতিরিক্ত চাপ। যেহেতু এই ভৌতরাশি দুটির মান পরস্পর সম্পর্কিত, তাই আমরা বলতে পারি শব্দশক্তির ঘনত্ব শব্দচাপের বিস্তারের বর্গের সমানুপাতিক।

চেঁচিয়ে কথা বলার সময়ে শব্দকম্পনের দ্রুতির সর্বোচ্চ মান দাঁড়ায় প্রায় 0·02 cm/s। এক ঘন সেণ্টিমিটার বায়ুর ওজন প্রায় 0·001 g। সুতরাং শব্দশক্তির ঘনত্বের পরিমাণ ঃ

$$\frac{1}{2} \times 10^{-3} \times 0{\cdot}02^2 \text{ erg/cm}^3 = 2 \times 10^{-7} \text{erg/cm}^3$$

মনে করুন, একটি উৎস শব্দ সৃষ্টি করছে। চারপাশের বায়ুতে সঞ্চালিত হচ্ছে শব্দশক্তি। যেন কম্পনশীল বস্তু থেকে শক্তি চারদিকে 'গড়িয়ে' যাচ্ছে। প্রতি সেকেণ্ডে শব্দ বিস্তারের অভিমুখের সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থিত কোনো তল দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি। এই পরিমাণকে ঐ তল দিয়ে অতিক্রান্ত 'শক্তি বলরেখা' (energy flux) বলে। তাছাড়া যদি আমরা 1 cm^2 মাপের তলের কথা বিবেচনা করি, তাহলে সেই তলের ভিতর দিয়ে অতিক্রান্ত শক্তিকে বলে 'শব্দতরঙ্গের প্রাবল্য' (intensity of sound wave)।

সহজেই বোঝা যায় যে, শব্দের প্রাবল্য শক্তি ঘনত্ব w এবং শব্দবেগ c-এর গুণফলের সমান। একটি চোঙাকৃতি বস্তুর কথা চিন্তা করুন যার উচ্চতা 1-cm এবং ভূমির ক্ষেত্রফল 1-cm^2 এবং যার অক্ষ শব্দবিস্তারের অভিমুখের সমান্তরাল। এই চোঙার ভিতরকার শক্তি 1 c সময়ের মধ্যে চোঙা থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে যাবে। সুতরাং একক সময়ে একক তল দিয়ে অতিক্রান্ত শক্তির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে $w/(1\ c)$ অর্থাৎ wc। এ যেন শক্তি শব্দের সমান বেগে অগ্রসর হচ্ছে।

উচ্চৈস্বরে কথোপকথনের সময়ে, বক্তাদের কাছাকাছি জায়গায় শব্দের প্রাবল্য প্রায় (আমরা পূর্বের হিসেবগুলি ব্যবহার করছি):

$$2\times10^{-7}\times3\times10^{4}=0{\cdot}006\ \text{erg/cm}^2\text{.s}$$

শ্রবণসাধ্য এবং শ্রবণোত্তর তীক্ষ্ণতা (Audible and Inaudible Pitches):

কোন ধরনের শব্দ মানুষের কান ধরতে পারে? দেখা গেছে যে, কম্পাঙ্ক একমাত্র 20 থেকে 20000 Hz-এর মধ্যে থাকলে মানুষের কান তা ধরতে পারে। কম্পাঙ্ক বেশী হলে শব্দকে উচ্চতীক্ষ্ণতাযুক্ত এবং কম হলে নিম্নতীক্ষ্ণতাযুক্ত শব্দ বলা হয়।

শ্রবণসাধ্য সীমানার কম্পাঙ্কের সংশ্লিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত? যেহেতু শব্দের বেগ প্রায় 300 m/s, সুতরাং $\lambda=CT=C/\nu$ সমীকরণের সাহায্যে আমরা যথাক্রমে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তীক্ষ্ণতার সংশ্লিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য হিসেব করে বের করতে পারি এবং দেখি যে তাদের মান যথাক্রমে 15 m এবং 3 cm।

কিভাবে আমরা এই কম্পন শুনি?

ঠিক কিভাবে যে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় কাজ করে, তা এখনো সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয় নি। মোটের উপর আমাদের অন্তঃকর্ণে (কক্লিয়া নামে পরিচিত কয়েক সেন্টিমিটার দীর্ঘ তরলপূর্ণ নল) কয়েক হাজার সংবেদক স্নায়ু আছে, যারা কর্ণপটহের (tymparic membrane) মাধ্যমে বায়ু থেকে কক্লিয়ায় আসা শব্দকম্পনকে গ্রহণ করতে পারে। শব্দের কম্পাঙ্কের উপর নির্ভর করে কক্লিয়ার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন মাত্রায় কম্পিত হয়। যদিও কক্লিয়ার মধ্যে সংবেদক

স্নায়ুগুলি এত ঘনসন্নিবিষ্ট যে অনেকগুলি স্নায়ুকোষ একসঙ্গে উত্তেজিত হয়, তবু মানুষ (এবং পশুরাও) বিশেষতঃ শিশুকালে কম্পাঙ্কের অতিসামান্য পরিবর্তনও (হাজার ভাগের এক ভাগও) বুঝতে পারে। অবশ্য কি করে যে পারে তা এখনো পুরোপুরি পরিষ্কার হয়নি। একমাত্র স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত এই যে, এক্ষেত্রে বিভিন্ন স্নায়ুকোষের মাধ্যমে যে সব সংকেত মস্তিষ্কে আসে সেগুলির যথাযথ বিশ্লেষণই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনুরূপ যান্ত্রিক প্রতিরূপ, যা একই উৎকর্ষতার সঙ্গে শব্দকম্পাঙ্ক বিশ্লেষণ করতে পারে, এখনও তৈরী করা সম্ভব হয়নি।

মাধ্যমের যে যান্ত্রিক কম্পন মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয় অনুভব করতে পারে, তার ঊর্ধ্বসীমা 20000 Hz কম্পাঙ্ক। আরো উচ্চতর কম্পাঙ্ক বিভিন্ন উপায়ে সৃষ্টি করা যায়, কিন্তু মানুষ তা শুনতে পায় না। যন্ত্রের সাহায্যে সেগুলি ধরা যায়। প্রসঙ্গতঃ বলা উচিত, শুধুমাত্র যন্ত্রই যে সেগুলি ধরতে পারে তা নয়, অনেক প্রাণী—বাদুড়, মৌমাছি, তিমি কিংবা ডলফিন (বোঝাই যাচ্ছে যে এক্ষেত্রে প্রাণীর আয়তনের কোনো ভূমিকা নেই)—100000 Hz কম্পাঙ্ক পর্যন্ত যান্ত্রিক কম্পন অনুভব করতে পারে।

বর্তমানে আমরা শতকোটি হার্টস কম্পাঙ্ক পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারি। এই ধরনের কম্পন কানে শোনা না গেলেও এদের শব্দোত্তর (ultrasonic) বা শব্দাতিগ (supersonic) নামে অভিহিত করে সাধারণ শব্দের সঙ্গে এদের নিকট সম্পর্ককে প্রকাশ করা হয়। সর্বোচ্চ কম্পাঙ্কের শ্রবণোত্তর শব্দ পাওয়া যায় কোয়ার্টজ প্লেটের সাহায্যে। কোয়ার্টজ কেলাস কেটে এই ধরনের প্লেট তৈরী করা হয়।

৭. অণুর পরিবর্তন

রাসায়নিক বিক্রিয়া (Chemical reactions) :

পদার্থবিদ্যা প্রকৃতিবিজ্ঞানের অন্য সব শাখার ভিত্তি। এজন্য পদার্থবিদ্যাকে রসায়নবিদ্যা, ভূবিদ্যা, নভোজ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা ইত্যাদি প্রকৃতিবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা থেকে আলাদা করা অসম্ভব। প্রকৃতির মৌলিক নিয়মগুলি পদার্থবিদ্যার আওতায় পড়ে। ভূতাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা, রাসায়নিক পদার্থবিদ্যা, গঠনসংক্রান্ত পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের উপর যে বহুসংখ্যক বই লেখা হয়েছে, তা শুধুমাত্র দৈবযোগের ব্যাপার নয়। তাই এই বইয়ের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংক্রান্ত একটি অধ্যায় সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে, যার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে প্রকৃতির অনেকগুলি মৌলিক নিয়মকে।

সঠিক অর্থে, রসায়নবিদ্যার গণ্ডী তখনি শুরু হয় যখন কোনো অণু তার উপাদানে ভেঙ্গে যায় কিংবা যখন দুটি অণু মিলে একটিমাত্র অণু গঠন করে কিংবা যখন দুটি অণুর মধ্যে সংঘাতের ফলে সৃষ্ট হয় নতুন দুই অণু। যদি দেখা যায় যে, কোনো প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ হওয়ার মধ্যে সংশ্লিষ্ট বস্তুগুলির রাসায়নিক সংযুতিতে কোনো পরিবর্তন ঘটেছে, তাহলে আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটেছে।

রাসায়নিক বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে, অর্থাৎ পরীক্ষাধীন তাপমাত্রায় আণবিক গতির ফলে, ঘটতে পারে। তাই অনেক সময় আমরা বলি যে, বস্তুটি বিয়োজিত হচ্ছে। এর অর্থ, অণুর সংগঠক পরমাণুগুলির কম্পন পরমাণুগুলির পারস্পরিক বন্ধনকে ছিন্ন করেছে এবং তার ফলে অণুটি 'ভেঙ্গে গেছে'।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অণুতে অণুতে সংঘর্ষের ফলে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। ধাতুতে মরচে পড়ে। এটি রাসায়নিক বিক্রিয়া : ধাতুর একটি পরমাণুর সঙ্গে একটি জলের অণুর সংঘর্ষের ফলে ধাতব অক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে। এক গেলাস জলে এক চামচ সোডা আর একটিপ সাইট্রিক অ্যাসিড মেশানো হল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বেগে বেরোতে লাগলো গ্যাস বুদ্বুদ্। এই দুই ধরনের অণুর সংঘর্ষের ফলে নতুন ধরনের কতকগুলি পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে, যাদের মধ্যে রয়েছে কার্বনডাই-অক্সাইড। এই কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাসই বুদ্বুদের আকারে উপরে ওঠে আর ফেটে যায়।

সুতরাং অণুর স্বতঃস্ফূর্ত বিয়োজন এবং বিভিন্ন অণুর মধ্যে সংঘাত, রাসায়নিক বিক্রিয়ার দুটি কারণ।

কিন্তু অন্যান্য কারণেও রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটতে পারে। ছুটির সময়ে দক্ষিণাঞ্চলে বেড়াতে এসে, জামা কাপড়ের দিকে তাকিয়ে আপনার রাগ হতে পারে। জামা কাপড়ের আগেকার রং ফ্যাকাসে হয়ে বদলে গেছে। তীব্র সূর্যালোকের প্রভাবে রঞ্জক পদার্থগুলির মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটেছে।

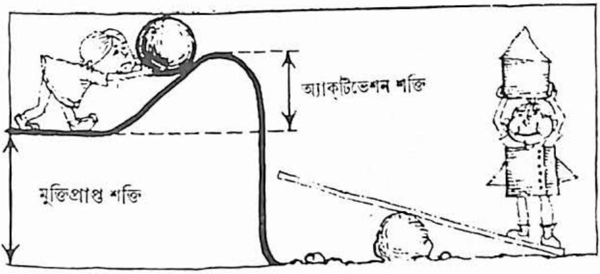
আলোকের প্রভাবে যে সব রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় তাদের সালোক-রাসায়নিক বিক্রিয়া (photochemical reaction) বলে। এই বিশেষ বিক্রিয়া সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার সময়ে, প্রত্যক্ষভাবে আলোকে আবিষ্ট বিক্রিয়াগুলিকে, আলোকের প্রভাবে (যা আণবিক গতিশক্তি বাড়িয়ে দিয়ে অণুগুলির পারস্পরিক সংঘাতকে দ্রুততর এবং বেশী জোরালো করে তোলে) উদ্ভূত উত্তাপের ফলে আবিষ্ট বিক্রিয়া থেকে আলাদা করার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। প্রথম ক্ষেত্রে আলোক কণিকা বা ফোটন রাসায়নিক বন্ধন চূর্ণ করে।

আলোকের ক্রিয়ার ফলেই সবুজ উদ্ভিদদেহে 'সালোকসংশ্লেষ' (photosynthesis) নামে পরিচিত ধারাবাহিক বিক্রিয়া ঘটে। জীবন্ত উদ্ভিদ যে সালোক-রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায় তার ফলেই স্থায়িত্ব লাভ করে কার্বনচক্র, যা না থাকলে পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্বই অসম্ভব হতো।

রাসায়নিক বন্ধনকে ভাঙ্গার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অন্যান্য শক্তিবাহী কণিকা, যেমন প্রোটন, ইলেকট্রন ইত্যাদিও ব্যবহৃত হয়।

রাসায়নিক বিক্রিয়াকালে উত্তাপ শোষিত হয় কিংবা নির্গত হয়। অণুর দৃষ্টিকোণে তার তাৎপর্য কি? যদি দুটি ধীরগামী অণুর মধ্যে সংঘাতের ফলে দুটি দ্রুতগামী অণু উৎপন্ন হয়, তাহলে বুঝতে হবে তাপ নির্গত হয়েছে, কেননা আমরা জানি যে, তাপমাত্রা বৃদ্ধি মানেই অণুগুলির গতিবৃদ্ধি। এই ধরনের বিক্রিয়ার মধ্যে পড়ে দহন এবং বিস্ফোরণ, যেগুলি সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অংশে আলোচনা করবো।

এবার আমরা অণুর দৃষ্টিকোণ থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগ বিবেচনা করার চেষ্টা করবো। সকলেই জানেন যে, কতকগুলি বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় চোখের পলক পড়তে না পড়তে (যেমন বিস্ফোরণ), আবার কতকগুলির জন্য কয়েক বছর সময় লেগে যায়। আর একবার কল্পনা করার চেষ্টা করুন যে, দুটি অণু পরস্পরের সঙ্গে সংঘাত ঘটিয়ে অন্য দুটি নতুন অণু উৎপন্ন করেছে। সেক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অনুমান করা চলতে পারে। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হল, সংঘাতের এমন এক শক্তি যা অণুগুলিকে ভেঙ্গে পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই বিবেচনা যে, সংঘাতশীল অণুগুলি যে কোনো



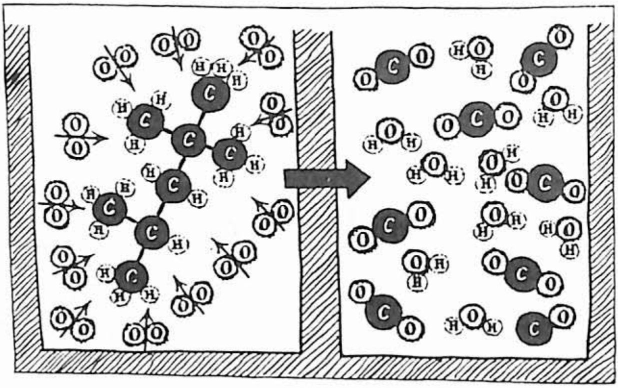
চিত্র 7·1

কোণে মিলিত হলেই রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটবে, না বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য তাদের এক বিশেষ কোণের মধ্যে সংঘাত ঘটানো অপরিহার্য।

একটি বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন শক্তিকে বলা হয় 'সক্রিয়কারী শক্তি' (activation energy)। বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এরই থাকে মুখ্য ভূমিকা, কিন্তু দ্বিতীয় আর একটি শর্তেরও ভূমিকা আছে—নির্দিষ্ট শক্তিবাহী কণিকাগুলির সংঘাতের মধ্যে 'ভাগ্যবান' সংঘাতগুলির শতকরা হার।

চিত্র 7.1-এর মধ্যে তাপমোচী বিক্রিয়ার এক প্রতিরূপকে উপস্থিত করা হয়েছে। বলটি গড়িয়ে গড়িয়ে উপরে উঠে বাধা ডিঙিয়ে নীচে এসে পড়ছে। যেহেতু প্রারম্ভিক শক্তির স্তর চূড়ান্ত শক্তির স্তরের চেয়ে উচ্চতর, তাই ব্যয়িত শক্তির পরিমাণের থেকে বেশী শক্তি উৎপন্ন হবে।

এই যান্ত্রিক প্রতিরূপ থেকে চাক্ষুষভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বিক্রিয়ার গতি তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। তাপমাত্রা কম হলে বলটির দ্রুতি বাধা ডিঙোবার পক্ষে পর্যাপ্ত হবে না। তাপমাত্রা যত বাড়বে, বাধার উপর দিয়ে লাফিয়ে পড়ছে যে সব বল, তাদের সংখ্যা ততই বাড়তে থাকবে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগ তাপমাত্রার উপর অত্যন্ত বেশী পরিমাণে নির্ভরশীল। সাধারণতঃ 10 ডিগ্রী তাপমাত্রা বাড়ালে বিক্রিয়ার গতি দ্বিগুণ থেকে চতুর্গুণ হয়ে ওঠে। যদি 10 ডিগ্রী তাপমাত্রা বাড়ানোর ফলে বিক্রিয়ার গতিবেগ, ধরুন তিনগুণ, বেড়ে গিয়ে থাকে ; তাহলে 100 ডিগ্রী তাপমাত্রা বাড়ালে সেই গতিবেগ বেড়ে হবে $3^{10} \sim 60000$ গুণ ; 200 ডিগ্রী বাড়ালে $3^{20} \sim 4 \times 10^{9}$ এবং 500 ডিগ্রী বাড়লে 3^{50} অর্থাৎ প্রায় 10^{24} গুণ। তাই 500°C তাপমাত্রায় যে বিক্রিয়া সাধারণ গতিতে চলে, সেই বিক্রিয়া ঘরের উষ্ণতায় একদম না হলেও আশ্চর্যের কিছু নেই।



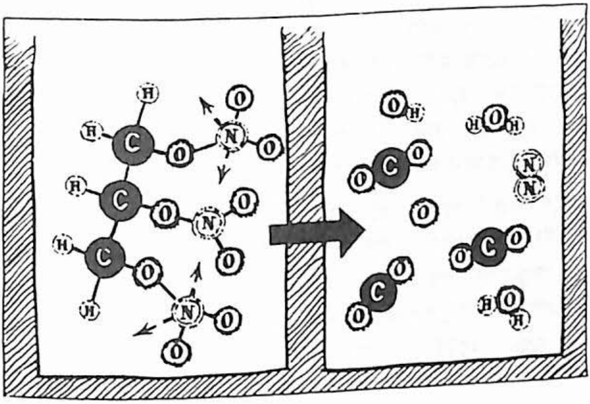
চিত্র 7.2

দহন এবং বিস্ফোরণ (Combustion and Explosion) :

সকলেই জানেন যে, দহন শুরু করার জন্য দরকার হয় দাহ্য পদার্থের কাছে জ্বলন্ত দিয়াশলাই কাঠি আনার। কিন্তু দিয়াশলাই কাঠিও নিজে নিজে জ্বলে ওঠে না, তাকে দিয়াশলাই বাক্সের গায়ে ঠুকে জ্বালাতে হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া আরম্ভ করার জন্য উত্তাপ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। জ্বালিয়ে দিলে, তা থেকে বিক্রিয়া শুরু হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক তাপমাত্রার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে বিক্রিয়ার ফলে নির্গত তাপ উচ্চ তাপমাত্রা অব্যাহত রাখে।

প্রয়োজনীয় প্রাথমিক তাপনের মাত্রা এমন হওয়া উচিত যে, বিক্রিয়ার ফলে নির্গত তাপের পরিমাণ ঃ শীতলতর পরিবেশে সঞ্চালিত হয়ে যে পরিমাণ তাপ বেরিয়ে যাচ্ছে, তার থেকে বেশী হয়। সেইজন্য বলা হয় যে, প্রত্যেক বিক্রিয়ারই নিজস্ব জ্বলনাঙ্ক (ignition temperature) থাকে। কেবলমাত্র প্রাথমিক তাপমাত্রা জ্বলনাঙ্কের চেয়ে বেশী হলেই, দহন শুরু হতে পারে। যেমন কাঠের জ্বলনাঙ্ক 610°C, বেন্‌জাইনের প্রায় 200°C, সাদা ফস্‌ফরাসের 50°C।

কাঠ, কয়লা, বা তেলের দহন আসলে রাসায়নিক বিক্রিয়া, যায় ফলে পদার্থটি বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়। তাই এই ধরনের বিক্রিয়া চলে শুধু বহির্তলে ; যতক্ষণ না বাইরের স্তর পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ নীচের স্তর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। এই ধরনের বিক্রিয়ার ধীরগতির কারণ এটাই। আমরা যা বললাম, বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলালে প্রত্যেকেই তা মেনে



চিত্র 7.3

নেবেন। জ্বালানিকে ছোট ছোট টুকরো করলে দহনের গতি অনেকখানি বেড়ে যায়। এজন্যই চুল্লীতে দেওয়ার আগে কয়লাকে ভেঙ্গে খণ্ড খণ্ড করা হয়।

অভ্যন্তরীণ-দহন-ইঞ্জিনের (internal combustion engine) সিলিণ্ডারে একইভাবে ব্যবহৃত জ্বালানিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে বায়ুর সঙ্গে মেশানো হয়। অবশ্য এই ধরনের ইঞ্জিনের জ্বালানি হিসেবে কয়লার থেকেও বেশী জটিল পদার্থ, যেমন গ্যাসোলিন, ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের পদার্থের একটি অণুকে 7.2 চিত্রের বাঁদিকে দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে 8টি কার্বন পরমাণু এবং 18টি হাইড্রোজেন পরমাণু প্রদর্শিত উপায়ে সংযুক্ত। দহনের সময়ে এই অণুটির সঙ্গে অক্সিজেন অণুর সংঘাত ঘটে। সংঘাতের ফলে গ্যাসোলিন অণু ভেঙ্গে যায়। অণুর মধ্যে এক বা একাধিক কার্বন পরমাণু যে বলের সাহায্যে হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে এবং যে বলের সাহায্যে দুটি অক্সিজেন পরমাণু পরস্পর সংযুক্ত হয়ে অক্সিজেন অণু গঠন করে, সেই সব বল, রসায়নবিদদের ভাষায়, অক্সিজেন পরমাণুর কার্বন বা হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার প্রবণতাকে (affinity) বাধা দিতে পারে না। ফলে অণুতে উপস্থিত পরমাণুগুলির পারস্পরিক বন্ধন ভেঙ্গে যায় এবং সেগুলি পুনর্বিন্যস্ত হয়ে নতুন অণু গঠন করে। চিত্র 7.2-এর ডানদিকে দেখানো হয়েছে, দহনের ফলে উৎপন্ন কার্বনডাইঅক্সাইড এবং জলের অণুর রূপ। অবশ্য জল উৎপন্ন হয় বাষ্পের আকারে।

কিন্তু যে ক্ষেত্রে বায়ুমণ্ডলকে প্রয়োজন হয় না, যে ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু বস্তুটির ভিতরেই উপস্থিত থাকে, সে ক্ষেত্রে পরিস্থিতি হয়

সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই ধরনের একটি বস্তুর উদাহরণ হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের মিশ্রণ (একে detonating gas বলা হয়)। বিক্রিয়া আর তখন শুধু বহির্তলেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বস্তুটির সর্বাংশে একসঙ্গে চলতে থাকে। তাই দহনের ক্ষেত্রে যেমন ঘটে তেমন না হয়ে, বিক্রিয়াজাত সবটুকু শক্তি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত হয় এবং তার ফলে চাপ সাংঘাতিকভাবে বেড়ে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। ডিটোনেটিং গ্যাসে দহন হয় না—বিস্ফোরণ ঘটে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বিস্ফোরক বস্তুর মধ্যে বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরমাণু বা অণুগুলির উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত। বিস্ফোরক গ্যাস মিশ্রণ যে প্রস্তুত করা সম্ভব, তা সহজবোধ্য। কিন্তু বিস্ফোরক কঠিন বস্তুও হতে পারে। এগুলি যে বিস্ফোরক হিসেবে কাজ করতে পারে তার প্রধান কারণ, এগুলির গঠনের মধ্যেই তাপদায়ী আলোকদায়ী রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব পরমাণু উপস্থিত থাকে।

বিস্ফোরণের সময়ে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়, চারিত্রিক দিক থেকে তা বিয়োজন বিক্রিয়া, যার ফলে অণুগুলি পরিণত হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে। বিস্ফোরণ বিক্রিয়ার একটি উদাহরণ নাইট্রোগ্লিসারিনের বিয়োজনকে চিত্র 7.3-এর মধ্যে দেখানো হয়েছে।

চিত্রটির ডানদিকের অংশ দেখলে বোঝা যায় যে, মূল পদার্থ থেকে কার্বন-ডাইঅক্সাইড, জল এবং নাইট্রোজেন অণু উৎপন্ন হয়েছে। বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলির মধ্যে সাধারণ দহনে উৎপন্ন পদার্থগুলিকেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু বিস্ফোরণ-বিক্রিয়া ঘটেছে বায়ুমণ্ডলীয় অক্সিজেনের সাহায্য ছাড়া, বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব পরমাণুই নাইট্রোগ্লিসারিন অণুর মধ্যে উপস্থিত ছিল।

ডিটোনেটিং গ্যাসের মতো বিস্ফোরক গ্যাসের মধ্যে বিস্ফোরণ বিক্রিয়া কিভাবে বিস্তারলাভ করে? বিস্ফোরকে অগ্নিসংযোগ করলে স্থানীয়ভাবে তাপন ঘটে। তপ্ত স্থানে শুরু হয় বিক্রিয়া। কিন্তু বিক্রিয়ার ফলে উত্তাপ নির্গত হয় এবং তা ছড়িয়ে পরে কাছাকাছি অন্যান্য স্তরে। সঞ্চালিত উত্তাপ কাছাকাছি স্তর গুলিতেও বিক্রিয়া শুরু করে। নির্গত হয় নতুন উত্তাপ এবং তা ছড়িয়ে পড়ে নতুন স্তরে। তাই তাপসঞ্চালনের হার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুটির সর্বাঙ্গ জুড়ে বিক্রিয়া শুরু হয়। এই ধরনের তাপসঞ্চালনের বেগ 20—30 m/s। অবশ্যই খুব দ্রুত। এক মিটার লম্বা গ্যাসভরা নল বিস্ফোরিত হবে 1/20 সেকেণ্ডের মধ্যে, অর্থাৎ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, যেখানে যাদের দহন সর্বাঙ্গ জুড়ে না হয়ে কেবলমাত্র বহির্তলে হয়, সেই কাঠ কিংবা কয়লার দহনের হার প্রতি মিনিটে মাত্র কয়েক সেণ্টিমিটার, অর্থাৎ কয়েক হাজার গুণ কম।

কিন্তু উপরোক্ত বিস্ফোরণকেও তুলনামূলকভাবে ধীরগতি বলা চলে এমন শতগুণ দ্রুত বিস্ফোরণও সম্ভব।

অভিঘাত তরঙ্গ (shock wave) দ্রুত বিস্ফোরণের জন্ম দেয়। যদি একটি বস্তুর কোনো এক বিশেষ তলে চাপ হঠাৎ বেড়ে যায়, তাহলে সেই জায়গা থেকে অভিঘাত তরঙ্গ উৎপন্ন হয়ে বিস্তার লাভ করে। অভিঘাত তরঙ্গের ফলে তাপমাত্রা হঠাৎ লাফ দিয়ে বেড়ে যায় এবং স্তর থেকে স্তরে সঞ্চালিত হতে থাকে। তাপমাত্রার বৃদ্ধি বিস্ফোরণ বিক্রিয়াকে উৎসাহিত করে এবং বিস্ফোরণের ফলে চাপ বেড়ে অভিঘাত তরঙ্গকে অব্যাহত রাখে, যার প্রাবল্য তা না হলে বিস্তারলাভের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত কমে যেতো। সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, অভিঘাত তরঙ্গ বিস্ফোরণের জন্ম দেয় এবং বিস্ফোরণ অভিঘাত তরঙ্গকে অব্যাহত রাখে। যে ধরনের বিস্ফোরণের বিষয়ে এইমাত্র বর্ণনা করা হল, তাকে বলে ডিটোনেশন (detonation)। যেহেতু ডিটোনেশন অভিঘাত-তরঙ্গের গতিবেগে (1 km/s মানের) বিস্তারলাভ করে, তাই এর গতি 'ধীর গতি' বিস্ফোরণের থেকে কয়েকশো গুণ বেশী।

কিন্তু কোন বস্তু দ্রুত বিস্ফোরিত হয় এবং কোন বস্তু ধীরে ? প্রশ্নটিকে এইভাবে উত্থাপন করা উচিত নয়, কেননা একই বস্তু কখনো কখনো ধীরগতিতে বিস্ফোরিত হতে, আবার কখনো কখনো ডিটোনেট করতে পারে ; তাছাড়া এমনও হয় যে, একটি ধীর গতি বিস্ফোরণ শুরু হয়ে শেষপর্যন্ত তা ডিটোনেশনে পরিণত হচ্ছে।

নাইট্রোজেন আয়োডাইডের মতো কয়েকটি পদার্থ খড় জাতীয় বস্তুর সংস্পর্শে এলে, বিস্ফোরিত হয়। অল্প উত্তপ্ত হলে, কিংবা আলোকশিখার প্রভাবে এলে, বিস্ফোরিত হয়। ট্রটিলের (trotyl) মতো বিস্ফোরক পদার্থ হাত থেকে পড়ে গেলে, এমনকি বন্দুকের গুলিতে ভরে ছুঁড়লেও বিস্ফোরিত হয় না। একে বিস্ফোরিত করার জন্য দরকার হয় অত্যন্ত শক্তিশালী অভিঘাত তরঙ্গের।

এমন অনেক পদার্থ আছে যারা বাইরের প্রভাবে আরও কম প্রভাবান্বিত হয়। অ্যামোনিয়ম নাইট্রেট আর অ্যামোনিয়ম সালফেটের মিশ্র সারকে আগে কখনো বিস্ফোরক বলে গণ্য করা হতো না, যতদিন না জার্মানীর ওপাউ শহরের এক রাসায়নিক কারখানায় 1921 খৃষ্টাব্দে সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। সেখানে জমে যাওয়া মিশ্রণকে গুঁড়ো করার জন্য বিস্ফোরণ পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করা হতো। দুর্ঘটনার ফলে একটি গুদাম এবং সমগ্র কারখানাবাড়ীটি ধ্বংস হয়ে যায়। কারখানার ইঞ্জিনিয়ারদের দোষ দেওয়া উচিত নয় ঃ প্রায় কুড়ি হাজার বিস্ফোরণ তাঁরা নিরাপদেই ঘটিয়েছিলেন। কেবলমাত্র একটি ক্ষেত্রেই ডিটোনেশন শুরু হওয়ার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল।

যে সব পদার্থ শুধুমাত্র অভিঘাত তরঙ্গের প্রভাবে বিস্ফোরিত হয়, কিন্তু সাধারণ অবস্থায় সুস্থিত এবং আগুনের সংস্পর্শেও নিরাপদ, সেগুলি বিস্ফোরণ প্রযুক্তিবিদ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের পদার্থগুলিকে বৃহৎ পরিমাণে উৎপাদন করার এবং গুদামজাত করার অনেক সুবিধে। অবশ্য এই ধরনের নিষ্ক্রিয় বিস্ফোরকদের দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে হলে সূচনাকারী বা ইনিসিয়েটরের (initiator) উপস্থিতি প্রয়োজন। অভিঘাত তরঙ্গসৃষ্টির উৎস হিসেবে এই সব বিস্ফোরণ-সূচনাকারী অপরিহার্য।

মার্কারি ফালমিনেট (Mercury fulminate) এই ধরনের বিস্ফোরণ-সূচনাকারীদের অন্যতম। যদি ঐ যৌগের একটিমাত্র ছোট দানা টিনের পাতের উপর রেখে জ্বালানো হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটে জায়গাটিতে একটি গর্ত হয়ে যাবে। এই ধরনের পদার্থগুলির বিস্ফোরণ সবসময়েই ডিটোনেশন।

যদি কিছু সেকেণ্ডারি বিস্ফোরকের উপর যৎসামান্য মার্কারি ফালমিনেট রেখে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে বিস্ফোরণ-সূচনাকারীর বিস্ফোরণের ফলে যে অভিঘাত তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তা সেকেণ্ডারি বিস্ফোরকটির বিস্ফোরণ ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট। বাস্তবে বিস্ফোরণ ঘটাবার জন্য ব্যবহার করা হয় ডিটোনেটিং ক্যাপসুল (1—2 g বিস্ফোরণ-সূচনাকারী)। বিভিন্ন উপায়ে দূর থেকে ডিটোনেটিং ক্যাপসুলটিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়, যেমন লম্বা পলতের সাহায্যে (বিকফোর্ড ফিউজ); ক্যাপসুল থেকে অভিঘাত তরঙ্গ বেরিয়ে সেকেণ্ডারি বিস্ফোরককে বিস্ফোরণ ঘটায়।

প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে অনেক সময়েই আমরা ডিটোনেশন অপছন্দ করি। সাধারণ অবস্থায় মোটর গাড়ীর ইঞ্জিনের মধ্যে গ্যাসোলিন আর বায়ুর মিশ্রণের 'ধীর-বিস্ফোরণ' ঘটে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে ডিটোনেশনও হয়। ইঞ্জিনের মধ্যে ক্রমাগত অভিঘাত তরঙ্গের উৎপত্তি অত্যন্ত আপত্তিজনক, কেননা তার ফলে সিলিণ্ডারের দেওয়াল খারাপ হয়ে যায়।

ইঞ্জিনের ভিতরকার ডিটোনেশনের মোকাবিলা করার জন্য উচ্চ অকটেন সংখ্যার বিশেষ ধরনের গ্যাসোলিন ব্যবহার করা হয়, কিংবা গ্যাসোলিনের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয় অভিঘাত তরঙ্গের উৎপত্তি প্রতিরোধক অ্যান্টিনক (antiknock) যৌগ। বহুল প্রচলিত অ্যান্টিনক যৌগগুলির অন্যতম টেট্রাইথাইল লেড (TEL)। এই পদার্থটি খুব বিষাক্ত, তাই এই ধরনের যৌগমিশ্রিত গ্যাসোলিন ব্যবহার করার সময়ে ড্রাইভারদের সাবধান হওয়ার জন্যে হুঁসিয়ার করে দেওয়া হয়।

কামান এমনভাবে তৈরী করা হয় যাতে ডিটোনেশন না হতে পারে। বন্দুকের গুলী চালানোর সময় বন্দুকের নলে অভিঘাত তরঙ্গ উৎপন্ন হওয়া উচিত নয়। উৎপন্ন হলে বন্দুক খারাপ হয়ে যায়।

আণবিক পরিবর্তনের সাহায্যে ইঞ্জিন চালনা (Engines operated by Transformation of Molecules) ঃ

বিংশ শতকের মানুষ তাদের কাজকর্মে বহুপ্রকার ইঞ্জিন এবং মোটর ব্যবহার করে তাদের কার্যক্ষমতাকে প্রায় দশগুণ বাড়িয়ে তুলেছে।

সরলতম ক্ষেত্র হিসেবে এক ধরনের যান্ত্রিক শক্তিকে অন্য এক ধরনের যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করা বেশী সুবিধাজনক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা বায়ুস্রোত বা জলস্রোতকে ব্যবহার করে উইন্ডমিল বা কারখানার ওয়াটারহুইল চালিয়ে থাকি।

মধ্যম প্রকৃতির উদাহরণ হল জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে জলস্রোতের শক্তিকে টারবাইন রানারের ঘূর্ণনগতিতে পরিণত করা। টারবাইন জেনারেটর নামে একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রকে চালনা করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। শক্তির এই ধরনের রূপান্তর সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

বাষ্প-ইঞ্জিন এখন অতীতকালের ঘটনা। বাষ্প-ইঞ্জিন চালিত রেলগাড়ী এতো দ্রুত বিরল হয়ে উঠছে যে, অদূর ভবিষ্যতেই মিউজিয়ামে স্থান পাবে। এর কারণ এই ধরনের তাপ-ইঞ্জিনের কার্যকারিতা খুবই নীচু মানের।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, বাষ্পচালিত টারবাইন বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও সম্প্রসারণশীল বাষ্পের শক্তিকে রোটারের গতিতে পরিবর্তিত করা হয় এক মধ্যবর্তী পর্যায় হিসেবে। শেষ পর্যায় বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন।

এরোপ্লেনে বা মোটর পরিবহণে বয়লার বা বাষ্প-টারবাইন ব্যবহারের স্পষ্টতঃ কোনো সুযোগ নেই। কিলোগ্রাম প্রতি প্রাপ্ত অশ্বক্ষমতার হিসেবে তাপব্যবস্থা-সমেত ইঞ্জিনের মোট ওজন অতিরিক্ত বেশী।

অবশ্য আমরা স্বতন্ত্র তাপব্যবস্থা বর্জন করতে পারি। গ্যাস-টারবাইনে কার্যকর ফ্লুইড হচ্ছে উচ্চশক্তি জ্বালানীর দহনজাত অতিতপ্ত গ্যাস। এই ধরনের ইঞ্জিনে আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়া, অর্থাৎ অণুর পরিবর্তন ব্যবহার করে, যন্ত্রশক্তি উৎপন্ন করি। এ থেকেই অনুভব করা যায় একই সঙ্গে বাষ্প-টারবাইনের তুলনায় গ্যাস-টারবাইনের সুবিধে এবং তার প্রস্তুতির পথে অতিক্রমনীয় বিপুল বাধা আর প্রযুক্তিগত জটিলতা।

সুবিধে তো স্পষ্ট ঃ যেখানে জ্বালানী দহন করা হয় সেই দহনকক্ষ মাপে খুব ছোট এবং টারবাইনের আবরণীর মধ্যেই রাখা চলে। দহনজাত পদার্থ-গুলির তাপমাত্রা, যেমন কণাকৃত কেরোসিন আর অক্সিজেন মিশ্রণের দহনের ফলে উৎপন্ন তাপমাত্রা, এতো বেশী যা বাষ্পের পক্ষে কখনো অর্জন করা সম্ভব নয়। গ্যাস-টারবাইনের দহনকক্ষে তাপপ্রবাহ খুব প্রবল এবং তার ফলে এর কার্য-কারিতার মান বেশ উঁচু।

কিন্তু এই সব সুবিধে থেকেই জন্ম নিয়েছে কতকগুলি অসুবিধে। টারবাইনের ইস্পাতে তৈরী পাখাকে গ্যাস-স্রোতের মধ্যে 1200°C তাপমাত্রায় ঘুরতে হয় বলে, ছাইয়ের অতিসূক্ষ্ম কণিকা তাদের সম্পৃক্ত করে রাখে। সহজেই বোঝা যায়, গ্যাস-টারবাইনের যন্ত্রাংশ তৈরীর উপযুক্ত উপাদানের চাহিদা কি বিপুল।

মোটর পরিবহণের উপযুক্ত একটি 200 অশ্বক্ষমতাবিশিষ্ট টারবাইন নির্মাণের প্রচেষ্টার সময়ে এক বিচিত্র বাধার সম্মুখীন হতে হল : টারবাইনটি মাপে এতো ছোট যে, প্রচলিত প্রযুক্তিগত সমাধান এবং গঠনের উপাদান ব্যবহার করাই সম্ভব হল না। অবশ্য তারপর এই সব অসুবিধে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। গ্যাস-টারবাইন চালিত মোটরের নক্শা প্রস্তুত এবং গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের যানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিৎ করে কিছু বলা মুস্কিল।

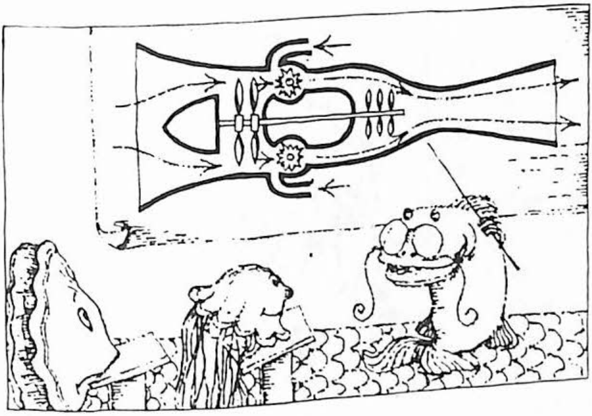
দেখা গেছে যে, গ্যাস-টারবাইনকে রেল পরিবহণ ব্যবস্থায় ব্যবহার করা তুলনামূলকভাবে বেশী সহজ। গ্যাস-টারবাইন চালিত রেলগাড়ী (gas-turbine locomotives) ইতিমধ্যেই সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছে।

কিন্তু গ্যাসটারবাইনের ব্যাপক ব্যবহারের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এক ইঞ্জিন, যার মধ্যে গ্যাস-টারবাইনের ভূমিকা প্রয়োজনীয় হলেও গৌণ। আমরা টার্বোজেট্ ইঞ্জিনের কথা বলছি—যে ধরনের মৌলিক ইঞ্জিন আধুনিক জেট্ প্লেনের ভিত্তি।

জেট্ ইঞ্জিনের নীতিগত ভিত্তি সরল। দৃঢ় দহনকক্ষের মধ্যে একটি গ্যাসমিশ্রণ জ্বালানো হয় ; দহনজাত পদার্থগুলি অস্বাভাবিক দ্রুতবেগে (অক্সিজেন পরিবেশে হাইড্রোজেনের দহন হলে 3000 m/s বেগে, অন্য ধরনের জ্বালানীর ক্ষেত্রে কিছু কম বেগে) একটি মসৃণভাবে ক্রমবিস্তৃত মুখনলের (nozzle) ভিতর দিয়ে এরোপ্লেনের গতির বিপরীত দিকে নির্গত হতে থাকে। এক্ষেত্রে এমনকি তুলনামূলকভাবে কম পরিমাণ দহনজাত পদার্থও ইঞ্জিন থেকে বেরোবার সময়ে অনেকখানি ভরবেগ নিয়ে বেরোয়।

জেট্ ইঞ্জিন উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতি গ্রহান্তরে পাড়ি দেওয়ার বাস্তব সুযোগ লাভ করেছে।

রকেট ইঞ্জিন চালানোর জন্য তরল জ্বালানীর ব্যবহার বহুপ্রচলিত। নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্বালানী (যেমন ইথাইল অ্যালকোহল) এবং জারকদ্রব্য (সাধারণতঃ তরল অক্সিজেন), ইঞ্জিনের দহনকক্ষে চালনা করা হয়। মিশ্রণটির দহনের ফলে চালকশক্তি (traction) আবির্ভূত হয়। V-2-এর মতো অত্যুচ্চতাগামী রকেটের ক্ষেত্রে এই চালক শক্তির মান প্রায় 15 tonf। সংশ্লিষ্ট সংখ্যাগুলি দেখুন : 8·5 টন জ্বালানী আর জারকদ্রব্যের মিশ্রণকে রকেটে ঢালা হয়, যা পুরো জ্বলতে সময় নেয় 1·5 মিনিট। তরল জ্বালানী চালিত রকেট শুধুমাত্র



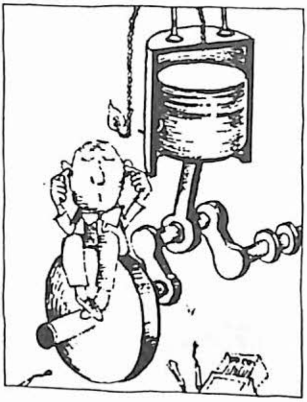
চিত্র 7.4

অত্যুচ্চ স্তরে কিংবা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে ওঠার ক্ষেত্রেই সুবিধাজনক। নিম্নতর উচ্চতায় (20 km-এর নীচে) যেখানে প্রচুর অক্সিজেন আছে, সেখানে ওড়ার জন্য প্রচুর পরিমাণ বিশেষ ধরনের জারকদ্রব্য ব্যবহারের কোনো যুক্তি নেই। অবশ্য সেক্ষেত্রে দহনকক্ষে তীব্র দহনের উপযুক্ত প্রচুর পরিমাণ বায়ু চালনা একটি বিরাট সমস্যা। স্বাভাবিকভাবেই এই সমস্যার সমাধান করা হয়েছে ঃ দহনকক্ষে উৎপন্ন গ্যাসস্রোতের শক্তির একাংশকে ব্যবহার করা হয়েছে বায়ু অনুপ্রবিষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত শক্তিশালী কম্প্রেসারের রোটার ঘোরাবার কাজে।

অতিতপ্ত গ্যাসের স্রোতকে শক্তি উৎপাদনের কাজে লাগানোর জন্য কোন ধরনের ইঞ্জিন উপযোগী, তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি ঃ অবশ্যই এই ইঞ্জিনের নাম গ্যাস-টারবাইন। গ্যাস-টারবাইন সমেত গোটা যান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এক কথায় বলে টার্বোজেট্ ইঞ্জিন (চিত্র 7.4)। 800 থেকে 1200 km/h বেগে ওড়ার ক্ষেত্রে টার্বোজেট্ ইঞ্জিনের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

600—800 km/h বেগে দূরপাল্লার পাড়ির জন্য, টার্বোজেট্ ইঞ্জিনের চালকদণ্ডের (shaft) সঙ্গে সাধারণ এরোপ্লেনের প্রোপেলার জুড়ে দেওয়া হয়। একে বলে টার্বোপ্রোপ ইঞ্জিন।

2000 km/h কিংবা আরো বেশী উড্ডয়নবেগের ক্ষেত্রে, এরোপ্লেন দ্বারা উৎপন্ন বায়ুচাপ এতো বেশী হয় যে, কম্প্রেসার ব্যবহার করার দরকার হয় না। স্বাভাবিকভাবেই তখন গ্যাস-টারবাইনের প্রয়োজন ফুরোয়। ইঞ্জিনকে সেক্ষেত্রে



চিত্র 7.5

বিভিন্ন প্রস্থচ্ছেদবিশিষ্ট এক নলে পরিণত করা হয়, যার মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গায় দহন করা হয় জ্বালানীকে। এর নাম র‍্যাম্‌জেট ইঞ্জিন। স্পষ্টতঃ, র‍্যাম্‌জেট ইঞ্জিন এরোপ্লেনকে উপরে তোলার কাজে ব্যবহারের অনুপযোগী, এটি কাজ করতে পারে কেবলমাত্র অতি উচ্চ উড্ডয়নবেগ থাকলে।

জেট্‌ ইঞ্জিনকে স্বল্প উড্ডয়নবেগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় না, কেননা এর জ্বালানী খরচের পরিমাণ অত্যধিক।

ডাঙার উপর, জলে কিংবা 500 km/h-এর কম গতিতে বায়ুর মধ্যে চলাচলের ক্ষেত্রে গ্যাসোলিন কিংবা ডিজেল চালিত অভ্যন্তরীণ-দহন পিস্টন ইঞ্জিন বিশবস্তভাবে ব্যবহৃত হয়। নাম শুনেই বোঝা যায় যে, এই ধরনের ইঞ্জিনের প্রধান অংশ একটি চোঙা বা সিলিণ্ডার, যার মধ্যে পিস্টন নড়াচড়া করে। পিস্টনের সামনে-পিছনে গতিকে সংযোগকারী দণ্ড এবং ক্র্যাংকের (crank) সাহায্যে শ্যাফ্‌টের ঘূর্ণনগতিতে পরিণত করা হয় (চিত্র 7.5)।

পিস্টনের গতি সংযোগকারী দণ্ডের সাহায্যে ক্র্যাংকে সঞ্চালিত হয়, যা ক্র্যাংকশ্যাফ্‌টের একটি অংশ। ক্র্যাংকের ঘূর্ণনের ফলে শ্যাফ্‌ট ঘুরতে থাকে। বিপরীতক্রমে ক্র্যাংকশ্যাফ্‌টকে ঘোরানো হলে সংযোগকারী দণ্ড গতিশীল হয় এবং সিলিণ্ডারের মধ্যে পিস্টনের নড়াচড়া শুরু হয়।

গ্যাসোলিন ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারে দুটি ভাল্‌ভ লাগানো থাকে, একটির সাহায্যে জ্বালানী মিশ্রণ ভিতরে ঢোকে এবং অন্যটির সাহায্যে নিঃশেষিত (exhaust) গ্যাস বাইরে বেরিয়ে যায়। ইঞ্জিন চালু করতে হলে, শুরুতে, বাইরে থেকে শক্তি প্রয়োগ করে তাকে ঘোরাতে হয়। মনে করুন একটি বিশেষ মুহূর্তে পিস্টনটি

নীচে নামছে আর প্রবেশ-ভাল্‌ভ খোলা রয়েছে। বায়ু আর কণাকৃত গ্যাসোলিনের এক মিশ্রণকে সিলিণ্ডার ভিতরে টেনে নেবে। প্রবেশ-ভাল্‌ভটি শ্যাফ্‌টের সঙ্গে এমনভাবে সংযুক্ত যে, পিস্টনটি তার নিম্নতম অবস্থানে নেমে এলে প্রবেশ-ভাল্‌ভ বন্ধ হয়ে যায়। শ্যাফ্‌ট আরো ঘুরলে, পিস্টন উপরে উঠতে শুরু করে। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা এমন রাখা হয় যে, এই পর্যায়ে ভাল্‌ভগুলি বন্ধ থাকে আর সেইজন্য জ্বালানি মিশ্রণ সংকুচিত হয়। পিস্টন তার উচ্চতম অবস্থানে পৌঁছলে, স্পার্কপ্লাগের ভিতরকার তড়িৎদ্বারের বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়ে সংকুচিত মিশ্রণটিকে জ্বালিয়ে দেয়। মিশ্রণ বিস্ফোরিত হয় এবং সম্প্রসারণ-শীল বিস্ফোরণ-উপজাত-পদার্থ পিস্টনকে ঠেলে নীচে নামিয়ে দেয়। ইঞ্জিন শ্যাফ্‌ট জোরালো ধাক্কা খায় এবং তার ফ্লাইহুইল অনেকখানি গতিশক্তিকে সঞ্চিত করে। এই সঞ্চিত শক্তিই এরপর পিস্টনের উপর্যুপরি তিনটি পাকের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। প্রথম পাকে হয় নিঃশেষণ—নিঃশেষণ ভাল্‌ভ খুলে যায় এবং ঊর্ধ্বগামী পিস্টন সিলিণ্ডার থেকে নিঃশেষিত গ্যাস ঠেলে বের করে দেয়। দ্বিতীয় আর তৃতীয় পাকে ঘটে, পূর্বোল্লিখিত উপায়ে যথাক্রমে চোষণ (sucktion) আর সংকোচন (compression) এবং পরিশেষে প্রজ্বলন (ignition)। ইঞ্জিন চলতে শুরু করে।

গ্যাসোলিন ইঞ্জিনের ক্ষমতা অশ্বক্ষমতার ভগ্নাংশ থেকে শুরু করে 4000 অশ্বক্ষমতা পর্যন্ত, দক্ষতা 40% পর্যন্ত এবং ওজন একক অশ্বশক্তি পিছু 300 gf পর্যন্ত হতে পারে। এই সব সুবিধাগত কারণেই মোটর পরিবহণে আর এরোপ্লেনে গ্যাসোলিন ইঞ্জিন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

কি করে গ্যাসোলিন ইঞ্জিনের দক্ষতা বাড়ানো হয়? দক্ষতা বাড়ানোর প্রধান উপায় সংকোচনের মাত্রা বাড়ানো।

জালানী মিশ্রণকে প্রজ্বলনের আগে খুব বেশী সঙ্কুচিত করলে উচ্চতর তাপমাত্রা পাওয়া যায়। কিন্তু তাপমাত্রা উচ্চতর হলে লাভ কি? আসল কথা হল, এটা প্রমাণ করা যায় যে সর্বোচ্চ দক্ষতার পরিমাণ $1-T/T_0$, যেখানে T হলো কার্যকরী বস্তুর তাপমাত্রা এবং T_0 পরিবেশের তাপমাত্রা; কিন্তু এই প্রমাণ এতো বিরক্তিকর যে, এখানে তা বর্জন করা হল। এমন বহু বক্তব্যের ক্ষেত্রেই আমরা পাঠকদের বলেছি যে, তাঁরা যেন আমাদের বক্তব্য মেনে নেন। যেহেতু পরিবেশের তাপমাত্রা এমন একটি জিনিস, যে বিষয়ে আমরা বিশেষ কিছু করতে পারি না, তাই আমরা সবসময়ে চেষ্টা করি ক্রিয়াশীল বস্তুর তাপমাত্রাকে যতদূর সম্ভব উঁচু মাত্রায় রাখতে। কিন্তু,—দুর্ভাগ্যবশতঃ এখানে এক "কিন্তু" আছে—খুব বেশী সংকুচিত জ্বালানী ডিটোনেট করে। সেক্ষেত্রে ইঞ্জিনের কার্যকরী পাকের সময়ে দারুণ বিস্ফোরণ ঘটে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দিতে পারে।

গ্যাসোলিনকে ডিটোনেশন-ধর্ম মুক্ত করতে হলে বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় এবং তার ফলে জ্বালানীর খরচ—যা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বেশী—আরো বেড়ে যায়।

কার্যকরী পাকের সময় তাপমাত্রা বাড়ানো, ডিটোনেশনের অবলুপ্তি এবং জ্বালানীর খরচ কমানোর সমস্যা, ডিজেল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে সফলভাবে সমাধান করা হয়েছে।

ডিজেল ইঞ্জিনের গঠন অনেকাংশে গ্যাসোলিন ইঞ্জিনের মতো, কিন্তু এর নকশা করা হয়েছে এমন তেলের ভিত্তিতে যা গ্যাসোলিনের চেয়ে কার্যকারিতায় নিকৃষ্ট এবং সস্তা।

এক্ষেত্রে পৌনপৌনিকতার পর্যায় শুরু হয় সিলিণ্ডারে বায়ু প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে। এরপর বায়ু পিস্টনের সাহায্যে প্রায় 20 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে সংকুচিত হয়। শুধু হাত দিয়ে ইঞ্জিন ঘুরিয়ে এতোখানি সংকোচন ঘটানো বেশ শক্ত। তাই ডিজেল ইঞ্জিন চালু করা হয় বিশেষ ধরনের, সাধারণতঃ গ্যাসোলিন চালিত, মোটরের সাহায্যে, কিংবা সংকুচিত বায়ু ব্যবহার করে।

খুব বেশী সংকুচিত হলে সিলিণ্ডারের ভিতরের বায়ুর তাপমাত্রা এতো বেশী বেড়ে যায় যে, তা জ্বালানী মিশ্রণের প্রজ্জ্বলনের পক্ষে পর্যাপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু কি করে এই জ্বালানী মিশ্রণকে সিলিন্ডারের ভিতরে ঢোকানো যাবে, যেখানে ইতিমধ্যেই খুব বেশী চাপ রয়েছে? এক্ষেত্রে প্রবেশ-ভাল্ভের মতো ব্যবস্থা কার্যকরী হয় না। তার বদলে ব্যবহৃত হয় একটি স্প্রেয়ার, যা জ্বালানীকে অতি সূক্ষ্ম রন্ধ্রপথে সিলিণ্ডারের মধ্যে চালনা করে। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই জ্বালানী প্রজ্জ্বলিত হয়, ফলে গ্যাসোলিন-ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে প্রায়ই যে ধরনের ডিটোনেশন দেখা যায়, সে ধরনের ডিটোনেশনের সম্ভাবনা নিবারিত হয়।

ডিটোনেশনের সম্ভাবনা নিবারিত হয় বলে আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে বহু সহস্র অশ্বক্ষমতার ডিজেল ইঞ্জিন প্রস্তুত করা। স্বভাবতঃই এদের আয়তন বেশ বড় হয়, কিন্তু তবু তা বাষ্পীয় বয়লার—টারবাইন সমবায়ের তুলনায় কম।

যে জাহাজে ডিজেল ইঞ্জিন আর ব্রেডের মধ্যে সমপ্রবাহ জেনারেটর (direct current generator) এবং মোটর স্থাপিত থাকে, তাকে ডিজেল-ইলেকট্রিক মোটর জাহাজ বলে।

ডিজেল রেলইঞ্জিন, যা এখন রেল পরিবহণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, একই নীতির ভিত্তিতে কাজ করে। তাই এদিক থেকে তাদের ডিজেল-ইলেকট্রিক রেল-ইঞ্জিনও বলা চলে।

আমরা সর্বশেষে যে বিষয়ে আলোচনা করেছি, সেই অভ্যন্তরীণ-দহন পিস্টনইঞ্জিন গঠন করা হয়েছে বাষ্প-ইঞ্জিনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ নকল করে—যেমন

সিলিন্ডার, পিস্টন, সংযোগকারী দণ্ড, ঘূর্ণনগতি লাভের জন্য ক্র্যাংক কৌশল ইত্যাদি। বিলুপ্তপ্রায় বাষ্প-ইঞ্জিনকে "বহিঃস্থ-দহন পিস্টন ইঞ্জিনও" বলা চলে। অসুবিধাজনক বাষ্প-বয়লারের সঙ্গে প্রায় সমান অসুবিধাজনক, চলনগতিকে ঘূর্ণন গতিতে পরিণত করার ব্যবস্থা, একসঙ্গে যুক্ত করে গড়ে তোলা হয়েছে বলেই, বাষ্প-ইঞ্জিন আরো আধুনিক ইঞ্জিনগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারছে না।

আধুনিক বাষ্প-ইঞ্জিনের দক্ষতা প্রায় 10%। পুরনো যে সব বাষ্পচালিত রেলইঞ্জিনকে তুলে নেওয়া হয়েছে, তারা ব্যবহৃত জ্বালানীর 95% পর্যন্ত কাজে লাগাতে না পেরে ধোঁয়ার সঙ্গে নষ্ট করতো।

এই রেকর্ড সৃষ্টিকারী নিম্ন দক্ষতার কারণ স্থানু বয়লারের নক্শার বদলে রেলইঞ্জিন-বয়লারের নক্শা করতে গেলেই অনিবার্যভাবে বয়লার-দক্ষতার মান অনেক কমে যায়।

কিন্তু তাহলে পরিবহণের কাজে এতো দীর্ঘদিন ধরে বাষ্প-ইঞ্জিন ব্যবহার করা হল কেন? প্রচলিত পদ্ধতির দিকে স্বাভাবিক আসক্তি ছাড়াও বাষ্প-ইঞ্জিনের এক বড় গুণ তার নির্ভরযোগ্যতার ভূমিকাও এ বিষয়ে কম নয়ঃ ভার যত বেশী বলপ্রয়োগ করে পিস্টনের গতিকে বাধা দেয়, পিস্টনের উপরে বাষ্পচাপও তত বেড়ে যায়, অর্থাৎ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বাষ্প-ইঞ্জিন সৃষ্ট টর্কের (torque) পরিমাণ বাড়তে পারে, যা পরিবহণের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু চালকদণ্ডের কাছে বিভিন্ন ধরনের প্রবাহের জটিল ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন হয় না বলে বাষ্প-ইঞ্জিনের যে সুবিধে, তা তার মৌলিক ত্রুটি, অর্থাৎ নিম্নমানের দক্ষতা, কিছুতেই পরিপূরণ করতে পারে না। এ থেকেই বোঝা যায় কেন বাষ্প-ইঞ্জিন অন্যান্য ধরনের ইঞ্জিন দিয়ে প্রতিস্থাপিত হচ্ছে।

৮• তাপগতিবিদ্যার বা থার্মোডিনামিক্সের নীতিসমূহ

আণবিক স্তরে শক্তির সংরক্ষণ (Conservation of Energy at the Molecular Level) ঃ

তাপগতিবিদ্যা বা থার্মোডিনামিক্সের নীতিগুলি প্রকৃতির মৌলিক নীতি-গুলির অন্যতম। এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ নীতির সংখ্যা বেশী নয়, আপনি তাদের আঙ্গুলে গুনে বলতে পারবেন।

পদার্থবিদ্যা সমেত সমগ্র বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য সেইসব সাদৃশ্য, নিয়ম, সাধারণ নীতি এবং মৌলনীতি খুঁজে বের করা, যেগুলি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। অনুসন্ধান শুরু করা হয় পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের সাহায্যে। এজন্যই বলা হয় যে, আমাদের সব জ্ঞানই অভিজ্ঞতালব্ধ বা পরীক্ষালব্ধ চরিত্রের। অনুসন্ধান আর পর্যবেক্ষণের পরে শুরু হয় সাধারণীকরণের প্রচেষ্টা। একাগ্র মনে মস্তিষ্ক-চালনা, ধ্যান, হিসাব আর প্রেরণার সাহায্যে আমরা প্রাকৃতিক নীতিগুলি খুঁজে বের করতে সফল হই। এরপর আসে তৃতীয় পর্যায় ঃ সাধারণ নীতিগুলির সাহায্যে আমরা যুক্তিবিজ্ঞানসম্মতভাবে গড়ে তুলি এমন বিশেষ ধরনের নিয়মাবলী, যেগুলি পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। এগুলির সাহায্যেই ব্যাখ্যা করা হয় বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা ; যুক্ত করা হয় বিশেষ নিয়মগুলিকে সাধারণ নিয়মাবলীর সঙ্গে।

অবশ্য বিজ্ঞানের এক সযত্ন লালিত প্রয়াস, বিভিন্ন নিয়মের সংখ্যাকে কমিয়ে অল্পসংখ্যক সূত্রের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা। পদার্থবিদ্‌রা এজন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। তাঁরা চেষ্টা করছেন প্রকৃতি সম্পর্কে মোট জ্ঞানের সারাংশকে কয়েকটি সুদৃঢ় উন্নত মানের সম্পর্কের আকারে প্রকাশ করতে। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন প্রায় তিরিশ বছর ধরে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এবং তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রকে একত্রিত করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। ভবিষ্যৎই বলতে পারে এই প্রচেষ্টা সার্থক বলে প্রমাণিত হবে কি না।

তাহলে থার্মোডিনামিক্সের নীতিগুলি কি ? খুব সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা স্বাভাবিক-ভাবেই কিছুটা বেঠিক হতে পারে। সম্ভবতঃ আসল তাৎপর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি হবে যদি আমরা বলি যে, বিভিন্ন বস্তু যে সব নিয়ম অনুসারে শক্তি বিনিময় করে, সেগুলির চর্চাকেই থার্মোডিনামিক্স বলে। থার্মোডিনামিক্সের নীতিগুলি

আমাদের বিভিন্ন বস্তুর যান্ত্রিক ও তাপীয় ধর্মের মধ্যে গাণিতিক উপায়ে সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে এবং বস্তুর অবস্থান্তর সম্পর্কে বহুসংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম গড়ে তুলতে সাহায্য করে। আমাদের আলোচ্য বিজ্ঞানের শাখার সবচেয়ে সঠিক সংজ্ঞা সম্ভবতঃ নিম্নোক্ত মামুলী বক্তব্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে ঃ "থার্মোডিনামিক্সের প্রথম এবং দ্বিতীয় সূত্র অনুসরণ করে যে সামগ্রিক জ্ঞান পাওয়া যায়, তার নামই থার্মোডিনামিক্স।"

সংক্ষিপ্ত এবং সুদৃঢ়ভাবে থার্মোডিনামিক্সের প্রথম সূত্র গড়ে তোলা হয়েছিল এমন এক যুগে, যখন পদার্থবিদ্‌রা অণুর নাম উল্লেখ করতে চাইতেন না। এই ধরনের বক্তব্যকে (যার জন্য আমাদের বস্তুর ভিতরে ঢোকার দরকার হয় না) বলে 'প্রপঞ্চবাদী' বক্তব্য, অর্থাৎ যাতে শুধুমাত্র প্রপঞ্চ (phenomena) সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়। থার্মোডিনামিক্সের প্রথম সূত্র শক্তির সংরক্ষণ সূত্রকে কিছু পরিমাণে মার্জিত আর বিকশিত করে তোলার উপকরণ জুগিয়েছে।

আমরা আগেই দেখিয়েছি যে, বস্তুর গতিশক্তি আর স্থিতিশক্তি আছে এবং আবদ্ধ সমবায়ের মধ্যে এই দুই শক্তির যোগফল, অর্থাৎ মোট শক্তি, ধ্বংস করাও যায় না, সৃষ্টি করাও যায় না। শক্তি সংরক্ষিত থাকে।

মহাকাশচারী বস্তুপিণ্ডের গতির কথা বাদ দিলে, আমরা একটু বিকৃতি না ঘটিয়ে ঘোষণা করতে পারি যে, এমন কোনো ঘটনা ঘটতে পারে না যাতে যান্ত্রিক গতির সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের বস্তু গরম বা ঠাণ্ডা হয়ে উঠছে না। কোনো বস্তুকে ঘর্ষণের সাহায্যে থামিয়ে দিলে, প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, গতিশক্তি বিলুপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু এই প্রাথমিক ধারণা আমাদের বিপথগামী করে। বাস্তবিকই সম্পূর্ণ নিশ্চিৎভাবে প্রমাণ করা যায় যে, বস্তুটির যান্ত্রিক শক্তি চারপাশের মাধ্যমকে গরম করার কাজে ব্যয়িত হয়েছে। আণবিক স্তরে এর তাৎপর্য কি ? তাৎপর্য অত্যন্ত সরল ঃ বস্তুটির গতিশক্তি অণুর গতিশক্তিতে পরিণত হয়েছে।

ও ব্যাপার না হয় বোঝা গেল, কিন্তু হামানদিস্তে দিয়ে বরফ ভাঙ্গার সময় কি হয় ? আমরা গুঁড়ো করে গেলেও থার্মোমিটার সারাক্ষণ 0°C তাপমাত্রাই নির্দেশ করে। মনে হয় যেন আমরা যে যান্ত্রিক শক্তি ব্যয় করেছি, তা অদৃশ্য হয়ে গেছে। যদি না হয়ে থাকে, তাহলে তার কি হল ? আবার আমরা স্পষ্ট উত্তর পাই ঃ বরফ জলে রূপান্তরিত হয়েছে। এর অর্থ, অণুগুলির পারস্পরিক বন্ধন চূর্ণ করার জন্য যান্ত্রিক শক্তি ব্যয়িত হয়েছে এবং তার ফলে তাদের অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিমাণ বদলে গেছে। যতবার আমাদের মনে হয়, এই বুঝি যান্ত্রিক শক্তি অদৃশ্য হল, ততবারই আমরা পরে আবিষ্কার করি যে, আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হলেও আসলে তা হয় নি, যান্ত্রিক শক্তি পরীক্ষাধীন বিভিন্ন বস্তুর অভ্যন্তরীণ শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

আবদ্ধ সমবায়ের (closed system) মধ্যে কয়েকটি বস্তুর অভ্যন্তরীণ শক্তি বাড়ে এবং অন্যগুলির কমে। কিন্তু সমবায়টির মধ্যে সবগুলি বস্তুর অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং গতিশক্তির যোগফলের মোট পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে।

এবার যান্ত্রিক শক্তি ছেড়ে অন্য বিষয়ে মন দেওয়া যাক। সময়ের বিভিন্ন দুটি মুহূর্তের কথা বিবেচনা করা যাক। প্রথম মুহূর্তে বস্তুগুলি স্থির অবস্থায় ছিল, তারপর কতকগুলি ঘটনা ঘটলো এবং দ্বিতীয় মুহূর্তেও দেখা গেল বস্তুগুলি আবার স্থির অবস্থায় রয়েছে। আমরা নিশ্চিত যে সমবায়টির মধ্যে সব বস্তুগুলির অভ্যন্তরীণ শক্তির যোগফল অপরিবর্তিত আছে। কিন্তু কতকগুলি বস্তু শক্তি হারিয়েছে এবং অন্যগুলি অর্জন করেছে। দুভাবে তা সম্ভব হতে পারে। হয় একটি বস্তু অন্যটির উপর যান্ত্রিক ক্রিয়া করেছে (যেমন তাকে সংকুচিত বা সম্প্রসারিত করেছে) আর তা না হলে এক বস্তু অন্যকে তাপ সরবরাহ করেছে।

থার্মোডিনামিক্সের প্রথম সূত্র অনুযায়ী একটি বস্তুর অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন, তার উপর যে কার্য করা হয়েছে সেই কার্যের এবং তার মধ্যে যে তাপ সঞ্চালিত হয়েছে সেই তাপের যোগফলের সমান।

তাপ আর কার্য এই দুইটি রূপে শক্তি এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে সঞ্চালিত হতে পারে। তাপবিনিময় ঘটে অণুগুলির বিশৃঙ্খল সংঘাতের ফলে। যান্ত্রিক শক্তি সঞ্চালনের সময়ে এক বস্তুর অণুগুলি সুশৃঙ্খল 'সারি ও বিন্যাস' বজায় রেখে অন্য বস্তুতে শক্তি সঞ্চালিত করে।

কিভাবে তাপ কার্যে পরিণত হয় (How Heat is Converted into Work) :

শিরোনামায় 'তাপ' শব্দটিকে কিছুটা স্থূলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। একটু আগেই দেখানো হয়েছিল যে, তাপ আসলে শক্তি সঞ্চালনের একটি রূপ। তাই প্রশ্নটিকে সঠিকভাবে উত্থাপন করতে হলে জিজ্ঞেস করা উচিত : কিভাবে তাপীয় শক্তি অর্থাৎ আণবিক গতির ফলে সৃষ্ট গতিশক্তি, কার্যে পরিণত হয়। কিন্তু 'তাপ' বা 'উত্তাপ' শব্দটি প্রচলিত, সহজ এবং অর্থবহ। আমরা যদি শব্দটির যে সঠিক অর্থ উপরে দেওয়া হল সেই অর্থে তাকে ব্যবহার করি, তাহলে আশা করি পাঠকেরা বিভ্রান্ত হবেন না।

আমাদের চারপাশে যে প্রচুর পরিমাণ তাপ আছে তা অনস্বীকার্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সব আণবিক গতিজনিত শক্তিই মূল্যহীন, যদি না তাদের কার্যে রূপান্তরিত করা যায়। তখন সেই শক্তিকে কোনোমতেই আমাদের শক্তি-ভাণ্ডারের উপাদান হিসেবে গণ্য করা চলে না। এবার বিষয়টিতে আসা যাক।

সাম্যাবস্থা থেকে সরিয়ে দিলে পেণ্ডুলাম দুলতে শুরু করে কোনো না কোনো সময়ে থেমে যাবে। উল্টো করে রাখা সাইকেলের চাকা হাত দিয়ে ঘুরিয়ে দিলে বহুক্ষণ ঘুরবে, কিন্তু শেষপর্যন্ত সেটিও থেমে যাবে। নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ নীতির কখনো ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায় না ঃ আমাদের চারপাশের স্বতঃস্ফূর্তভাবে গতিশীল সব বস্তুই শেষ পর্যন্ত স্থির অবস্থায় আসবে।*

যদি দুটি বস্তুর একটি উত্তপ্ত এবং অন্যটি শীতল হয়, তাহলে তাপ উত্তপ্ত বস্তু থেকে অন্যটির মধ্যে সঞ্চালিত হতে থাকবে, যতক্ষণ না দুটির তাপমাত্রা এক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দুটির তাপমাত্রাই অভিন্ন হয়ে গেলে, তাপ সঞ্চালন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে এবং বস্তু দুটির অবস্থার আর কোনো পরিবর্তন হবে না। প্রতিষ্ঠিত হবে তাপীয় সাম্যাবস্থা।

কোনো বস্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাম্যাবস্থা ত্যাগ করছে, এমন কোনো ঘটনা ঘটতেই পারে না। ধুরার (axle) উপর স্থির চাকা আপনা-আপনি ঘুরতে শুরু করতে পারে না। কিংবা কখনো দেখা যায় না যে, টেবিলে রাখা দোয়াতের কালি আপনা-আপনি গরম হয়ে উঠছে।

সাম্যাবস্থার দিকে ঝোঁকের তাৎপর্য এই যে, ঘটনা স্বাভাবিক পরিণতির দিকে এগোয় ঃ তাপ উত্তপ্ত বস্তু থেকে শীতল বস্তুতে যায়, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে শীতল বস্তু থেকে উত্তপ্ত বস্তুতে আসতে পারে না।

বায়ুর বাধা এবং ঝুলানোর জায়গায় ঘর্ষণের জন্য দোলনশীল পেণ্ডুলামের যান্ত্রিক শক্তি তাপে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই পেণ্ডুলাম চারপাশের উত্তাপ শোষণ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দুলতে শুরু করতে পারে না। বস্তুরা সাম্যাবস্থায় আসে কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাম্যাবস্থা ত্যাগ করে চলে যেতে পারে না।

উপরোক্ত নীতি স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়, আমাদের চারপাশের শক্তির কোন অংশ সম্পূর্ণ ব্যবহারিক মূল্যহীন। এই মূল্যহীন অংশ হচ্ছে সাম্যাবস্থায় যে সব বস্তু রয়েছে তাদের ভিতরকার অণুগুলির তাপীয় গতির শক্তি। এই সব বস্তু নিজেদের শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে না।

শক্তির এই অংশের পরিমাণ বিপুল। রূপান্তরযোগ্য নয় এমন শক্তির পরিমাণ হিসেব করা যাক। এক ডিগ্রি তাপমাত্রা কমালে এক কিলোগ্রাম মাটি, যার তাপগ্রাহিতা 0·2 kcal/kg, 0·2 kcal তাপ হারাবে। অবশ্যই এই পরিমাণ খুব সামান্য। কিন্তু এবার হিসেব করা যাক। এক ডিগ্রী তাপমাত্রা কমাতে পারলে পৃথিবীর ভরের সমান (6×10^{24} kg) ভরবিশিষ্ট কোনো

---

* এখানে অবশ্য সামগ্রিকভাবে বস্তু সমবায়ের সমচলনবেগ বা সম আবর্তবেগের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে না।

বস্তু থেকে আমরা কতখানি শক্তি সংগ্রহ করতে পারতাম। হিসেব করে আমরা যে পরিমাণ পাই তা বিপুল: $0{\cdot}2\times6\times10^{24}=1{\cdot}2\times10^{24}$ kcal। এই পরিমাণের বিপুলত্ব সম্পর্কে যাতে আপনারা একটি ধারণা গড়ে তুলতে পারেন সেজন্য আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, পৃথিবীর সব বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তির বার্ষিক মোট পরিমাণ 10^{15}—10^{16} kcal, অর্থাৎ শতকোটি গুণ কম।

এই ধরনের তথ্যে যে অর্ধশিক্ষিত গবেষকেরা সম্মোহিত হয়ে ওঠেন তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। আমরা আগে একবার 'চিরচঞ্চল যন্ত্র' (Perpetual motion machine) গড়ে তোলার প্রচেষ্টা সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলাম, যে যন্ত্র কোনো উৎস ছাড়াই শূন্য থেকে কার্য উৎপন্ন করতে সক্ষম। শক্তির সংরক্ষণ সূত্র থেকে গড়ে ওঠা পদার্থবিদ্যার প্রধান নিয়মগুলির সাহায্য নিয়ে সেই সূত্রেরই বিরুদ্ধে 'চিরচঞ্চল যন্ত্র' (আমরা এরপর এই যন্ত্রকে প্রথম প্রকার চিরচঞ্চল যন্ত্র বলে উল্লেখ করবো) প্রস্তুত করা সম্ভব নয়।

কয়েকজন একটু বেশী চালাক গবেষকদেরও একই ধরনের ভুল করতে দেখা যায়, যখন তাঁরা শুধুমাত্র মাধ্যমের শীতলীকরণ ভিত্তি করে অন্য কোনো কিছুর ব্যয় ছাড়াই চিরচঞ্চল যন্ত্রের প্রতিরূপ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এই ধরনের অসম্ভব যন্ত্রের নাম দেওয়া হয়েছে 'দ্বিতীয় প্রকারের চিরচঞ্চল যন্ত্র'। এক্ষেত্রেও যুক্তিশাস্ত্রগত ভুল দেখতে পাওয়া যায়, কেননা গবেষক যে সব পদার্থবিজ্ঞানের নীতি অবলম্বন করে এগোন, সেগুলি "সব বস্তু সাম্যাবস্থার দিকে যেতে চায়"—এই মৌলিক নীতিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং গবেষক চাইছেন তাঁর অবলম্বিত নীতিগুলির সাহায্যে সেই নীতিগুলির ভিত্তিকেই নস্যাৎ করে দিতে।

সুতরাং শুধুমাত্র মাধ্যম থেকে তাপগ্রহণের সাহায্যে কার্য সৃষ্টি করা যায় না। অন্যভাবে বলা যায়, সাম্যাবস্থায় স্থিত বস্তুসমূহের সমবায় শক্তি নিষ্কাশনের দৃষ্টিকোণ অনুর্বর।

তাই কার্য পেতে হলে প্রথমে দরকার এমন সব বস্তু খুঁজে বার করা যেগুলি প্রতিবেশীদের সঙ্গে সাম্যাবস্থায় নেই। কেবলমাত্র সেই সব ক্ষেত্রেই এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে তাপ সঞ্চালন করা কিংবা তাপকে যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করা সম্ভবপর।

শক্তি বলরেখা সৃষ্টি করা কার্য পাওয়ার এক প্রয়োজনীয় শর্ত। এই ধরনের বলরেখার 'পথেই' বস্তুগুলির ভিতরকার শক্তির একাংশকে কার্যে পরিণত করা যায়। এই জন্য যে সব বস্তু তাদের চারপাশের মাধ্যমের সঙ্গে সাম্যাবস্থায় নেই, কেবলমাত্র তাদের শক্তিকেই মানুষের ব্যবহারোপযোগী শক্তির উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়।

আমরা এতক্ষণ দ্বিতীয় প্রকারের চিরচঞ্চল যন্ত্র তৈরী করার অবাস্তবতা সম্পর্কিত যে নীতির ব্যাখ্যা করলাম, তাকেই থার্মোডিনামিক্সের দ্বিতীয় নীতি বলা হয়। এখনো পর্যন্ত আমরা নীতিটিকে প্রপঞ্চগত রূপে প্রকাশ করে এসেছি। কিন্তু যেহেতু আমরা জানি যে, সব বস্তুই অণু দিয়ে তৈরী এবং বস্তুর অভ্যন্তরীণ শক্তি অণুগুলির স্থিতিশক্তি আর গতিশক্তির যোগফল ছাড়া আর কিছুই নয়, তাই বাড়তি আর একটি নীতি থাকা কিছু বিস্ময়কর মনে হতে পারে। কেন অণু সম্পর্কিত শক্তির সংরক্ষণ সূত্র প্রকৃতির সব প্রপঞ্চ ব্যাখ্যা করার বিষয়ে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হল না?

আবার এ থেকেই জন্মেছে নিম্নলিখিত প্রশ্নঃ কেন অণুগুলির আচরণ এমন যে, নিজের মতো করে থাকতে দিলে তারা সাম্যাবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়?

এনট্রপি (Entropy):

প্রশ্নটি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক আর গুরুত্বপূর্ণ। এর উত্তর দিতে হলে আমাদের অনেক দূর থেকে আরম্ভ করতে হবে।

যে সব ঘটনা প্রায়ই ঘটে তাদের সাধারণতঃ বলা হয় খুব সম্ভাবনাপূর্ণ (probable) ঘটনা, আর যেগুলি বিরল সেগুলিকে সম্ভাবনাহীন (improbable)।

সম্ভাবনাহীন ঘটনা ঘটার জন্য বাস্তবিকই কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রয়োজন হয় না। এর মধ্যে অসম্ভব কিছু থাকে না, থাকে না এমন কিছু, যা প্রকৃতির নিয়মগুলির পরিপন্থী। যদিও অনেক ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, যা সম্ভাবনাহীন তা অসম্ভবের সঙ্গে অভিন্ন।

লটারী পুরস্কার বিজেতাদের তালিকার কথাই ধরুন। 4, 5 কিংবা 6 দিয়ে শেষ হয়েছে যে সব বিজয়ী টিকিট তাদের সংখ্যা গুনুন। যদি দেখেন যে একেকটি বিশেষ অঙ্ক দিয়ে শেষ হয়েছে যে সব বিজয়ী টিকিট তাদের সংখ্যা মোট বিজয়ী টিকিটের সংখ্যার প্রায় এক-দশমাংশ, তাহলে নিশ্চয় আপনি অবাক হবেন না। কিন্তু, যদি দেখা যায় যে, 5 দিয়ে শেষ হয়েছে যে সব বিজয়ী টিকিট তাদের সংখ্যা মোট বিজয়ী টিকিটের সংখ্যার এক-দশমাংশ না হয়ে, ধরুন এক-পঞ্চমাংশ হয়েছে? আপনি জবাব দেবেন, সম্ভাবনা কম। আচ্ছা, যদি দেখা যায় যে, বিজয়ী টিকিটগুলির অর্ধেকই অমুক সংখ্যা দিয়ে শেষ হয়েছে, তাহলে? না এতোটা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই…আর তাই অসম্ভব।

একটি বিশেষ ঘটনাকে সম্ভাবনাপূর্ণ বলতে হলে কি কি শর্ত থাকা প্রয়োজন, এ বিষয়ে ভাবতে বসলে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছই: একটি ঘটনার সম্ভাব্যতা (probability) নির্ভর করে যতসংখ্যক উপায়ে ঘটনাটি ঘটতে

পারে সেই সংখ্যার উপর। সংখ্যাটি যত বড় হয় ততই বেশী বেশী আমরা ঘটনাটিকে ঘটতে দেখি।

আরও সঠিকভাবে বললে, একটি বিশেষ ঘটনা ঘটার সংখ্যা এবং সব ধরনের ঘটনা ঘটার মোট সংখ্যার অনুপাতকে বলে সম্ভাব্যতা।

দশটি কার্ডবোর্ডের চাক্‌তির উপর 0 থেকে 9 পর্যন্ত দশটি রাশি লিখে একটি থলির মধ্যে রাখুন। এরপর একটি একটি করে চাক্‌তি বের করে এনে উপরের লেখা রাশিটি পড়ে আবার ঢুকিয়ে রাখুন। অনেকটা লটারীর টিকিট টানার মতো ব্যাপার। জোর করে বলা যায় যে, আপনি যদি সারা সন্ধ্যা বসে চেষ্টা চালিয়ে যান, তাহলেও পরপর, ধরুন সাত বার, একই রাশি টেনে তুলতে পারবেন না। কেন? সাতটি একই রাশি টানতে পারা এমন একটি ঘটনা যা মাত্র দশ রকম উপায়ে করা চলে (সাতটি 1, সাতটি 2, ইত্যাদি); কিন্তু সাতটি চাক্‌তিকে টানা যায় 10^7 সংখ্যক সম্ভাব্য উপায়ে। তাই একই রাশি চিহ্নিত চাক্‌তিকে পরপর সাতবার টানার সম্ভাব্যতা $10/10^7 = 10^{-6}$, অর্থাৎ মাত্র দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ।

একটি বাক্সের মধ্যে সাদা দানা আর কালো দানা নিয়ে ভালো করে বেল্‌চা দিয়ে মেশাতে থাকুন। একটু পরেই দানাগুলি পুরোপুরি মিশে গিয়ে বাক্সের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। বিভিন্ন জায়গা থেকে এক এক মুঠো দানা তুলে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, প্রতিক্ষেত্রেই সাদা দানা আর কালো দানার সংখ্যা প্রায় এক হচ্ছে। আমরা যেভাবেই দানাগুলি মিশিয়ে থাকি না কেন, প্রতিক্ষেত্রেই একই ফল হবে—দেখা যাবে দানাগুলি সমভাবে মিশে রয়েছে। কিন্তু কেন দানাগুলি আলাদা হয়ে যায় নি? কেন অনেকক্ষণ মেশাতে মেশাতে আমরা কালোদানা-গুলিকে উপরে এবং সাদা দানাগুলিকে নীচে নিয়ে আসতে পারি নি? এক্ষেত্রেও বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে সম্ভাব্যতার উপর নির্ভরশীল। দানাগুলির বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে থাকা, অর্থাৎ সমভাবে মিশে থাকা অবস্থা অসংখ্য উপায়ে সৃষ্টি করা যায় আর তাই এর সম্ভাব্যতা সবচেয়ে বেশী। উল্টোদিকে যে সমবায়ে সব কালো দানাগুলি উপরে আর সব সাদা দানাগুলি নীচে থাকে তা অদ্বিতীয়। সুতরাং এর সম্ভাব্যতা এতো কম যে, ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

আমরা থলির মধ্যে রাখা দানার সঙ্গে বস্তুর মধ্যে উপস্থিত অণুগুলিকে তুলনা করতে পারি। একটি অণুর আচরণ দৈবযোগের (chance) উপর নির্ভর করে। বিশেষ করে গ্যাসের ক্ষেত্রে তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। আমরা জানি যে, গ্যাস অণু বিশৃঙ্খলভাবে, একবার এক পরক্ষণেই অন্য গতিতে, সম্ভাব্য সব অভিমুখে ছোটাছুটি করে। চিরন্তন তাপীয় গতি অনবরত অণুগুলির বিন্যাস ওলোট পালট করে দেয়, তাদের মিশিয়ে দেয়, যেভাবে বাক্সের দানাগুলিকে বেল্‌চা মিশিয়ে দিয়েছিল, ঠিক সেইভাবে।

আপনি যে ঘরে বসে আছেন তা বায়ুতে পরিপূর্ণ। একটি বিশেষ মুহূর্তে ঘরের নীচের অর্ধাংশে যে সব অণু আছে সেগুলি উপরের অর্ধাংশে চলে গেল, এমন কি কখনো ঘটতে পারে না? এমন ঘটনা ঘটা অসম্ভব (impossible) নয়, কিন্তু খুবই সম্ভাবনাহীন (improbable)। কিন্তু খুব সম্ভাবনাহীন বলতে ঠিক কি বোঝায়? যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাব্যতা, অণুগুলির বিশৃঙ্খল বিন্যাসের তুলনায় শতকোটি গুণ কমও হয়, তাহলেও কারো না কারোর চোখে তা ধরা পড়তো। আমরা কি বাস্তবিকই তা দেখতে পাই।

হিসেব করে দেখা গেছে যে, প্রতি 1-cm^3 আয়তন পাত্রের মধ্যে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে $10^{3\times10^{19}}$ বারের মধ্যে মাত্র একবার। এক্ষেত্রে 'খুব সম্ভাবনাহীন' আর 'অসম্ভবের' মধ্যে তফাত করতে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। কেননা উপরে উদ্ধৃত রাশিটির মান অকল্পনীয় বেশী; যদি রাশিটিকে শুধু পৃথিবীতে নয় গোটা সৌরজগতে উপস্থিত সমস্ত পরমাণুর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায়, তাহলেও তার মান বিপুল হবে।

কিন্তু গ্যাস অণুগুলির অবস্থাকে কি রূপে দেখতে পাওয়া যাবে? সবচেয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ রূপে। এই সবচেয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ রূপ হচ্ছে সেই রূপ যা সর্বাধিক সংখ্যক উপায়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে (সব অণুগুলিই বিশৃঙ্খলভাবে চতুর্দিকে ছড়ানো থাকবে), যার মধ্যে প্রায় সমসংখ্যক অণু ডানদিকে এবং বাঁদিকে যাচ্ছে কিংবা উপরের দিকে উঠছে এবং নীচের দিকে নামছে, যার মধ্যে সমআয়তনে সমসংখ্যক অণু বর্তমান এবং যার উপরের অর্ধাংশ আর নীচের অর্ধাংশের মধ্যে দ্রুতগতি অণু আর মন্থরগতি অণুর অনুপাত অভিন্ন। এই ধরনের বিশৃঙ্খলতা থেকে, অর্থাৎ অবস্থান আর গতির দিক থেকে সম্পূর্ণ অবিন্যস্ত রূপ থেকে যে কোনো বিচ্যুতি সম্ভাব্যতার পরিমাণ কমিয়ে দেয় অর্থাৎ সম্ভাবনাহীন ঘটনা হয়ে ওঠে।

বিপরীতক্রমে, যে সব প্রপঞ্চে মিশ্রণের মাত্রা আরো বাড়ে, বিন্যাসের ভিতর থেকে অবিন্যাস সৃষ্টি হয়, সেগুলিতে অবস্থার সম্ভাব্যতা (probablity of state) আরো বেশী। তাই এই সব প্রপঞ্চই ঘটনার স্বাভাবিক গতি নির্ধারণ করে; ব্যাখ্যা করে দ্বিতীয় প্রকারের চিরচঞ্চল যন্ত্রের অসম্ভাব্যতাকে এবং সাম্যাবস্থার দিকে সব বস্তুর যাওয়ার প্রবণতাকে। কেন যান্ত্রিক শক্তি তাপীয় শক্তিতে পরিণত হয়? শুধুমাত্র এইজন্য যে যান্ত্রিক গতির শৃঙ্খলা আছে কিন্তু তাপীয় গতির তা নেই। শৃঙ্খলা থেকে বিশৃঙ্খলায় উত্তোরণ অবস্থার সম্ভাব্যতা বাড়িয়ে তোলে।

শৃঙ্খলার মাত্রার বৈশিষ্ট্যসূচক একটি পরিমাণকে, যা সরল সমীকরণের সাহায্যে অবস্থা সৃষ্টির উপায়ের সংখ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত, পদার্থবিদ্‌রা নাম

দিয়েছেন 'এন্‌ট্রপি'। আমরা এখানে সমীকরণটিকে উপস্থিত করবো না, শুধু এইটুকু বলবো যে, সম্ভাব্যতা যত বেশী এনট্রপিও তত বেশী।

আমরা প্রকৃতির যে নীতি সম্পর্কে আলোচনা করছি, সেই নীতি অনুযায়ী সব প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াই এমনভাবে ঘটে যাতে সমবায়ের সম্ভাব্যতা বৃদ্ধি পায়। অন্য-ভাষায় একই নীতিকে ক্রমবর্ধমান এন্‌ট্রপির নীতিও বলা চলে।

ক্রমবর্ধমান এন্‌ট্রপির নীতি প্রকৃতিবিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলির অন্যতম। এ থেকে বিশেষভাবে বোঝা যায় কেন দ্বিতীয় প্রকারের চিরচঞ্চল যন্ত্র তৈরী করা অসম্ভব, কিংবা অন্যভাষায়, বস্তুদের আপনার পথে চলতে দিলে তারা সাম্যাবস্থার দিকে এগোয়। ক্রমবর্ধমান এন্‌ট্রপির নীতি থার্মোডিনামিক্সের দ্বিতীয় নীতির সঙ্গে অভিন্ন। ভাষার তফাত থাকলেও দুয়ের মর্মবস্তুর মধ্যে কোনো তফাত নেই। আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ এই যে, আমরা আণবিক স্তরেও থার্মোডিনামিক্সের দ্বিতীয় নীতির ব্যাখ্যা দিয়েছি।

এই দুইটি নীতিকে 'একই পতাকার তলে একত্রিত করা' অনেকাংশে সৌভাগ্য-জনক। কেননা শক্তির সংরক্ষণ সূত্র এক বিমূর্ত সূত্র। কিন্তু ক্রমবর্ধমান এন্‌ট্রপির সূত্র, আমাদের ব্যাখ্যা অনুসারে বোঝা যায় যে, যথেষ্ট সংখ্যক কণিকার সমাবেশ সম্পর্কেই প্রযোজ্য এবং একক অণুর ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করা অসম্ভব।

থার্মোডিনামিক্সের দ্বিতীয় নীতির সংখ্যাতত্ত্বগত (অর্থাৎ বিপুলসংখ্যক কণিকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ার) চরিত্র অবশ্য কোনোমতেই তার তাৎপর্য ক্ষুণ্ণ করেনি। ক্রমবর্ধমান এন্‌ট্রপির সূত্র প্রক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি পূর্বনির্ধারিত করে। এই অর্থে এন্‌ট্রপিকে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিচালক বলা চলে যেখানে শক্তির কাজ হিসাবরক্ষকের।

অস্থিরতা (Fluctuations) :

আমরা দেখেছি যে, স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া সমবায়কে তার সবচেয়ে বেশী সম্ভাব্য অবস্থার দিকে, অর্থাৎ বর্ধিত এন্‌ট্রপির দিকে নিয়ে যায়। সমবায়ের এন্‌ট্রপি সর্বোচ্চ মাত্রায় আসার পর প্রতিষ্ঠিত হয় সাম্যাবস্থা।

কিন্তু সাম্যাবস্থা প্রতিষ্ঠার মানে এই নয় যে, অভ্যন্তরীণ গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। সমবায়ের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন তাপীয় গতি অব্যাহত থাকে। তাই খুঁটিয়ে দেখলে, প্রতি মুহূর্তে ভৌতবস্তুটি "একই সত্ত্বায় থাকতে অস্বীকার করে" : পরের মুহূর্তে বস্তুর মধ্যে অণুর বিন্যাস আগের মুহূর্তে যা ছিল, তা থাকে না। সুতরাং ভৌত রাশিগুলি সংরক্ষিত হয় কেবলমাত্র 'গড়ের হিসেবে' ; সেগুলি তাদের সবচেয়ে বেশী সম্ভাব্য মানের কাছাকাছি থাকে, কাঁটায় কাঁটায় সমান থাকে না। সাম্যাবস্থায় সবচেয়ে বেশী সম্ভাব্য মানের থেকে এই ভিন্নতাকে বলে 'অস্থিরতা'।

এই ধরনের বিভিন্ন অস্থিরতার মান খুবই নগণ্য। অস্থিরতার মান যত বেশী, সেটির সম্ভাব্যতা ততই কম।

একটি আপেক্ষিক অস্থিরতার গড় মান, অর্থাৎ বিশৃঙ্খল তাপীয় গতির ফলে বিবেচ্য ভৌতরাশির মানে যেটুকু অংশ পরিবর্তিত হয় সেই ভগ্নাংশ, প্রকাশ করা হয় $1/\sqrt{N}$-এর সাহায্যে, যেখানে N বস্তুটির মধ্যে কিংবা আমাদের বিবেচ্য অংশটির মধ্যে অণুর সংখ্যা সূচিত করে। সেইজন্য কমসংখ্যক অণু দিয়ে গড়া সমবায়ের মধ্যেই অস্থিরতা বেশী মাত্রায় চোখে পড়ে, কিন্তু কোটি কোটি অণু দিয়ে তৈরী বড় বস্তুর মধ্যে ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

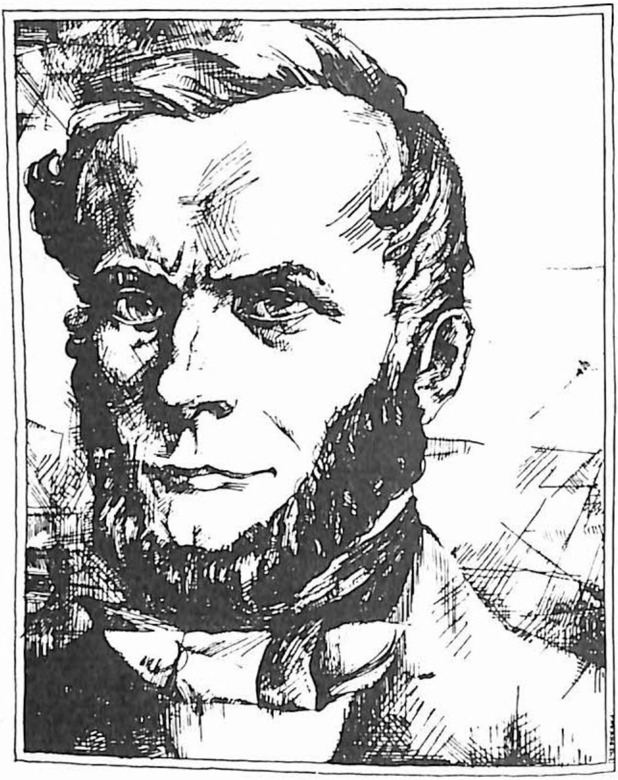
$1/\sqrt{N}$ সংকেতের সাহায্যে বোঝা যায় যে, এক ঘন সেন্টিমিটার গ্যাসের মধ্যে ঘনত্ব, চাপ, তাপমাত্রা কিংবা অন্য কোনো ধর্ম $1/\sqrt{3\times 10^{১৯}}$ অংশ বদলাতে পারে, অর্থাৎ যা শতকরা $10^{-৪}$%-এর বেশী নয়। এই মাত্রার অস্থিরতার মান এতো কম যে পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করা চলে না। কিন্তু আয়তন এক ঘন মাইক্রোমিটার হলে অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে $N=3\times 10^{7}$ এবং অস্থিরতার মান পরিমাপযোগ্য, শতকরা একভাগের এক শতাংশের কাছাকাছি।

অস্থিরতাকে 'অস্বাভাবিক' বলা চলে এই অর্থে যে, অস্থিরতার ফলে বেশী সম্ভাব্য অবস্থান থেকে কম সম্ভাব্য অবস্থানে রূপান্তর হচ্ছে। অস্থিরতা ঘটার সময় তাপ উচ্চ তাপমাত্রা থেকে নিম্নতাপমাত্রায় প্রবাহিত হয়, অণুর সমবণ্টনের নিয়ম লঙ্ঘিত হয় এবং তাদের গতিতে শৃঙ্খলা আসে।

এই ধরনের অস্থিরতার সাহায্যে কি কেউ ভবিষ্যতে দ্বিতীয় প্রকারের চিরচঞ্চল যন্ত্র নির্মাণ করতে সক্ষম হবেন?

কল্পনা করুন নিম্নচাপবিশিষ্ট গ্যাসের মধ্যে এক অতিক্ষুদ্র টারবাইন বসানো হয়েছে। আমরা কি এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি না যার সাহায্যে ক্ষুদ্র টারবাইনটি একটি নির্দিষ্ট অভিমুখে যাবতীয় অস্থিরতাকে গ্রহণ করতে পারবে? যেমন, যদি দক্ষিণগামী অণুগুলির সংখ্যা বামগামী অণুগুলির সংখ্যা থেকে বেশী হয়ে যায়, তাহলে সেটি ঘুরবে এবং এই সব ছোটখাটো কম্পনকে জমিয়ে তারপর হয়তো কার্যে পরিণত করা সম্ভব হবে। সেক্ষেত্রে যে নীতি চিরচঞ্চল যন্ত্র নির্মাণ করা অসম্ভব বলে ঘোষণা করেছে, সেই নীতি বাতিল হয়ে যাবে।

হায়! দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ধরনের কৌশল নীতিগত কারণে অসম্ভব। টারবাইনেরও নিজস্ব অস্থিরতা থাকে (যত ছোট টারবাইন তত বেশী অস্থিরতা) বিবেচনার মধ্যে ধরে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, অস্থিরতা কখনো কোনো কাজ সম্পাদন করতে পারে না। যদিও সাম্যাবস্থার দিকে প্রবণতার বিরোধী ঘটনা অহরহ আমাদের চারপাশে ঘটছে, তবু তারা কোনো-



রুডল্‌ফ ক্লাওসিয়াস (1822-1888) পদার্থবিদ্যায় তাত্ত্বিক জার্মান বিজ্ঞানী। ক্লাওসিয়াসই সর্বপ্রথম সঠিকভাবে থার্মোডিনামিক্সের দ্বিতীয় নীতি উপস্থিত করতে পেরেছিলেন : প্রথমে 1850 খৃষ্টাব্দে, তাপ স্বতঃস্ফূর্তভাবে শীতলতর বস্তু থেকে উষ্ণতর বস্তুতে সঞ্চালিত হতে পারে না দেখিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে ; এবং তারপর 1865 খৃষ্টাব্দে তাঁরই প্রবর্তিত এনট্রপির ধারণার সাহায্যে। বহুপরমাণুক গ্যাসের তাপগ্রাহিতা এবং গ্যাসের তাপপরিবাহিতা সম্পর্কে প্রশ্নগুলি যাঁরা সর্বপ্রথম বিবেচনা করতে শুরু করেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। গ্যাসের গতিতত্ত্ব সম্পর্কীয় তাঁর গবেষণা পরবর্তীকালে ভৌত প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে পরিসংখ্যানগত ধারণা বিকাশের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। তড়িৎবিদ্যা এবং চৌম্বকবিদ্যার ক্ষেত্রেও তাঁর ধারাবাহিক কৌতূহলোদ্দীপক গবেষণার বিবরণ আছে।

ভাবেই ভৌত প্রক্রিয়াগুলির এনট্রপি (অর্থাৎ অবস্থার সম্ভাব্যতা) বাড়ানোর দিকে অমোঘ গতিকে বদলাতে পারে না।

থার্মোডিনামিক্সের নীতি কে আবিষ্কার করেছিলেন (Who Discovered the Laws of Thermodynamics) ঃ

এক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে কোনো একটি বিশেষ নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। থার্মোডিনামিক্সের দ্বিতীয় নীতির নিজস্ব ইতিহাস আছে। এক্ষেত্রেও প্রথম নীতির ইতিহাসের মতই সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয় ফরাসী বৈজ্ঞানিক সডি কারনটের নাম। 1824 খৃষ্টাব্দে তিনি 'অগ্নির চালকশক্তি সম্পর্কে চিন্তার ফসল' (Reflections on the Motive Power of Fire) নামে একটি নিবন্ধ লিখে নিজের খরচে প্রকাশিত করেন। এই নিবন্ধেই সর্বপ্রথম দেখানো হয়েছিল যে, তাপ শীতল বস্তু থেকে উষ্ণ বস্তুতে কার্য ব্যয়িত না হলে প্রবাহিত হতে পারে না। কারনট আরও দেখিয়েছিলেন যে, তাপ-ইঞ্জিনের সর্বোচ্চ দক্ষতা নির্ধারিত হয়, কেবলমাত্র উষ্ণতর এবং শীতলতর মাধ্যমের তাপমাত্রার অন্তরের দ্বারা।

1832 খৃষ্টাব্দে কারনটের মৃত্যুর পর তাঁর নিবন্ধের দিকে অন্যান্য পদার্থবিদদের নজর পড়ে। কিন্তু তাঁর গবেষণার ফল বিজ্ঞানের বিকাশের পথে খুব একটা সাহায্য করতে পারেনি, কেননা কারনটের সব লেখাতেই ধ্বংস করা যায় না বা সৃষ্টি করা যায় না এমন এক অলীক পদার্থ 'ক্যালোরিক' (Caloric)-কে ভিত্তি হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল।

কেবলমাত্র যখন মায়ার, হেলমোলৎস আর জুলের গবেষণার ফলে তাপ এবং কার্যের তুল্যতা (equivalence) প্রতিষ্ঠিত হল, তখনই বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী রুডলফ ক্লাওসিয়াসের (1822-1888) পক্ষে সম্ভব হল থার্মোডিনামিক্সের দ্বিতীয় নীতি ঘোষণা এবং তাকে গাণিতিকভাবে উপস্থাপন করা। ক্লাওসিয়াস এনট্রপির ধারণা নিয়ে এলেন এবং দেখালেন যে, থার্মোডিনামিক্সের দ্বিতীয় নীতির মর্মবস্তুকে সংক্ষিপ্তভাবে, প্রত্যেক বাস্তব প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এনট্রপি বৃদ্ধির অনিবার্যতা হিসেবে, দেখানো চলে।

থার্মোডিনামিক্সের দ্বিতীয় নীতির ফলে এমন কতকগুলি সাধারণ নিয়ম গড়ে তোলা সম্ভব হল, যেগুলিকে সব বস্তু, যে কোনো গঠনই তাদের থাকুক না কেন, মেনে চলতে বাধ্য হয়। কিন্তু তখনও থেকে গেল বস্তুর গঠন এবং তার ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রশ্ন। পরিসংখ্যানগত পদার্থবিদ্যা নামে পরিচিত পদার্থবিদ্যার শাখায় এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়।

স্পষ্টতঃ, কোটি কোটি কণিকা দ্বারা গঠিত সমবায়ে সংশ্লিষ্ট ভৌত রাশিগুলিকে নির্ধারণ করতে হলে নতুন কোনো পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। বস্তুতঃ সব কণিকার গতি অনুধাবন করা এবং এই সব গতিকে সনাতন বলবিদ্যার সাহায্যে বর্ণনা করা, অসম্ভব যদি নাও হয় অন্ততঃ মূঢ়তা। আবার প্রধানতঃ কণিকার এই বিপুল সংখ্যায় উপস্থিতির জন্যই আমাদের পক্ষে

13 — 01072

বস্তুবিচারের জন্য নতুন পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করা সম্ভব হয়। এই পদ্ধতিগুলি ব্যাপকভাবে ঘটনার সম্ভাব্যতার ধারণাকে ব্যবহার করে থাকে। পরিসংখ্যানগত পদার্থবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন খ্যাতনামা অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ্যাবিদ লুডভিগ বোলৎসমান (1844-1906)। ধারাবাহিক অনেকগুলি প্রবন্ধে তিনি দেখান, কিভাবে গ্যাসের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানগত পরীক্ষা চালানো সম্ভব।

1877 খৃষ্টাব্দে বোলৎসমান থার্মোডিনামিক্সের দ্বিতীয় নীতির যে পরিসংখ্যানভিত্তিক ব্যাখ্যা দেন, তা তাঁর পূর্বোক্ত প্রয়াসগুলিরই যুক্তিযুক্ত পরিণতি। এনট্রপি এবং অবস্থার সম্ভাব্যতার মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধসূচক সমীকরণটি বোলৎসমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই গড়ে তোলা হয়েছিল।

বিজ্ঞানী হিসেবে বোলৎসমানের স্থান এতো উচ্চে যে তাঁর সম্পর্কে অতিশয়োক্তি করা অসম্ভব। তিনি তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিলেন। তাঁর জীবনকালে তাঁর গবেষণাকে রক্ষণশীল জার্মান অধ্যাপকদের বিদ্রূপের সম্মুখীন হতে হয়েছিল; সে সময় অনেকেই অণু এবং পরমাণু সম্পর্কে ধারণাকে বোকামি মনে করতেন। বোলৎসমানকে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল, যার জন্য উপরোক্ত পরিস্থিতির গুরুত্ব কোনোমতেই কম ছিল না।

পরিসংখ্যানভিত্তিক পদার্থবিদ্যা বিখ্যাত আমেরিকান বিজ্ঞানী জোসিয়া উইলার্ড গিবসের (1839-1903) প্রচেষ্টার ফলে অনেকখানি পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। গিবস বোলৎসমানের পরিসংখ্যানভিত্তিক পদ্ধতিকে সাধারণীকৃত করেন এবং দেখান কিভাবে তাকে সব বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যায়।

গিবসের শেষ নিবন্ধ বিংশ শতকের প্রারম্ভে প্রকাশিত হয়েছিল। অখ্যাতনামা গবেষক গিবসের প্রথম নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল একটি ছোট আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকায়। অন্যান্য পদার্থবিদ্ তাঁর এই মূল্যবান গবেষণার বিষয়ে জানতে পারেন বেশ কয়েক বছর পরে।

পরিসংখ্যানভিত্তিক পদার্থবিদ্যা দেখিয়েছে কিভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যক অণু দ্বারা গঠিত বস্তুর ধর্ম হিসেব করে পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য এ কথা মনে করা উচিত নয় যে, এই ধরনের গণনামূলক পদ্ধতি সর্বশক্তিমান। যদি বস্তুর মধ্যে পরমাণুর গতির চরিত্র খুব বেশী জটিল হয়, তাহলে বাস্তবে সত্যিকার গণনার কাজ চালানো যায় না।

৯. অতিকায় অণু

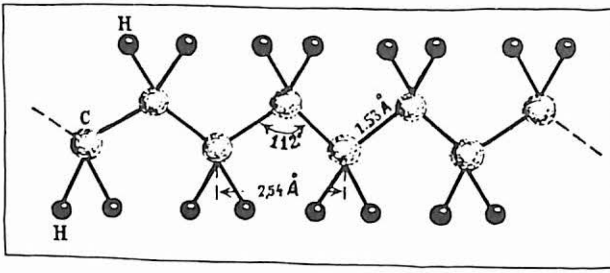
পরমাণু শৃঙ্খল (Chains of Atoms) ঃ

বহুদিন থেকেই রসায়নবিদ এবং প্রযুক্তিবিদ্‌রা এমন সব পদার্থ ব্যবহার করে আসছেন যেগুলি লম্বা লম্বা অণু দিয়ে তৈরী এবং এই সব অণুর ভিতরকার পরমাণু শৃঙ্খল সংযোগকারী পর্যায়ের মতো একত্রিত হয়ে আছে। উদাহরণ হাতের কাছেই আছে ঃ রবার, সেলুলোজ কিংবা প্রোটিনের মতো অনেক পদার্থ যাদের শৃঙ্খলাকার অণু হাজার হাজার পরমাণু দিয়ে গড়ে উঠেছে। এই ধরনের অণুর গঠন সম্পর্কীয় ধারণার উদ্ভব আর বিকাশ আরম্ভ হয় বিশের দশকে, রসায়নবিদ্‌রা লেবরেটরিতে এই ধরনের পদার্থ প্রস্তুত করতে পারে।

দীর্ঘশৃঙ্খল অণু দ্বারা গঠিত পদার্থ প্রস্তুতির প্রথম প্রচেষ্টাগুলির অন্যতম সংশ্লেষিত 'কাউচুক' (Caoutchouc) প্রস্তুতি। এই উচ্চাঙ্গের গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ করেছিলেন সোভিয়েট রসায়নবিদ সার্জি ভ্যাসিলিয়েভিচ লেবেডেভ (1874-1934) 1926 খৃষ্টাব্দে। সংশ্লেষিত কাউচুকের (কাঁচা রবারকে এই নামে উল্লেখ করা হয়) বৃহদাকার উৎপাদন সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, কেননা মোটরযানের টায়ার তৈরীর জন্য (টায়ারের রবার পাওয়া যায় এই কাঁচা রবার বা কাউচুক থেকে) কাউচুকের চাহিদা বিপুল অথচ রবার গাছ গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল ছাড়া জন্মায় না।

হিভিয়া (hevea) বা রবার গাছ জন্মায় ব্রাজিলের জঙ্গলে। এই গাছের দুধের মতো সাদা রসে (যাকে latex বলা হয়) প্রলম্বিত অবস্থায় কাঁচা (crude) রবার থাকে। ব্রাজিলের রেডইণ্ডিয়ানরা কাঁচা রবার দিয়ে বল আর জুতো তৈরী করতো। 1839 খৃষ্টাব্দে চার্লস গুড্‌ইয়ার (1800-1860) কাঁচা রবারকে 'ভাল্‌কানাইজ' (vulcanise) করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। কাঁচা রবারকে উপরোক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী গন্ধক মিশিয়ে গরম করলে, আঠালো নমনীয় কাঁচা-রবার স্থিতিস্থাপক-রবারে পরিণত হয়।

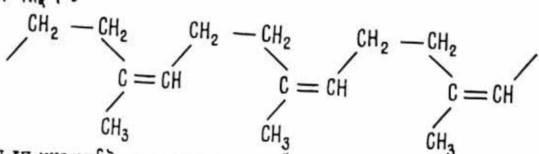
প্রথম যুগে রবারের চাহিদা বেশী ছিল না, কিন্তু আধুনিক কালে মানবজাতির বার্ষিক নিযুত নিযুত টন রবার প্রয়োজন হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রবার গাছ শুধুমাত্র গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে জন্মায় আর তাই শীতপ্রধান বা নাতি-



চিত্র 9.1

শীতোষ্ণ অঞ্চলের দেশগুলির পক্ষে আমদানী-নির্ভরতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বৃহদাকারে সংশ্লেষিত রবার প্রস্তুতির চেষ্টা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

সংশ্লেষিত কাঁচা রবার প্রস্তুত করার আগে অবশ্যই জানা উচিত আসলে কাঁচা রবার জিনিসটি কি। লেবেডেভ যখন তাঁর গবেষণা শুরু করেন তার আগেই কাঁচা রবারের রাসায়নিক সংকেত জানা হয়ে গিয়েছিল। এর রাসায়নিক সংকেত নিম্নরূপ ঃ



এখানে যে শৃঙ্খলটিকে দেখানো হল তার আরম্ভ বা শেষ নেই। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, অণুগুলির মধ্যে কতকগুলি অভিন্ন সংযোগকারী পর্যায় আছে। সুতরাং আমরা কাঁচা রবারের সংকেতকে আরো সংক্ষিপ্তাকারে এইভাবে লিখতে পারি ঃ

$$\left[-CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{C}}=CH-CH_2- \right]_n$$

n-এর মান কয়েক হাজার হতে পারে। দীর্ঘশৃঙ্খল অণু কোনো পরমাণু-পুঞ্জের পৌনঃপুনিক সংযুক্তির ফলে গড়ে উঠে থাকলে তাকে পলিমার বলে।

প্রযুক্তিবিজ্ঞানে এবং বয়নশিল্পে বিপুল সংখ্যক সংশ্লেষিত পলিমার ব্যবহৃত হয়। তাদের মধ্যে রয়েছে নাইলন, পলিইথিলিন, ক্যাপ্রন, পলিপ্রোপিলিন, পলিভিনাইল ক্লোরাইড এবং আরও আরও অনেকে।

সরলতম গঠন পলিইথিলিনের। এই পদার্থে তৈরী প্যাকেট পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বাড়ী-ফ্ল্যাটের খাবার টেবিলে দেখতে পাবেন। একটি পলিইথিলিন অণুকে

যতদূর সম্ভব টেনে লম্বা করলে, তার চেহারা চিত্র 9.1-এর অনুরূপ হবে। দেখতেই পাচ্ছেন যে, পদার্থবিদ্‌রা পরমাণুগুলির মধ্যেকার দূরত্ব এবং তাদের যোজ্যতাবন্ধনগুলির ভিতরকার কোণের পরিমাণ নির্ধারণ করে ফেলেছেন।

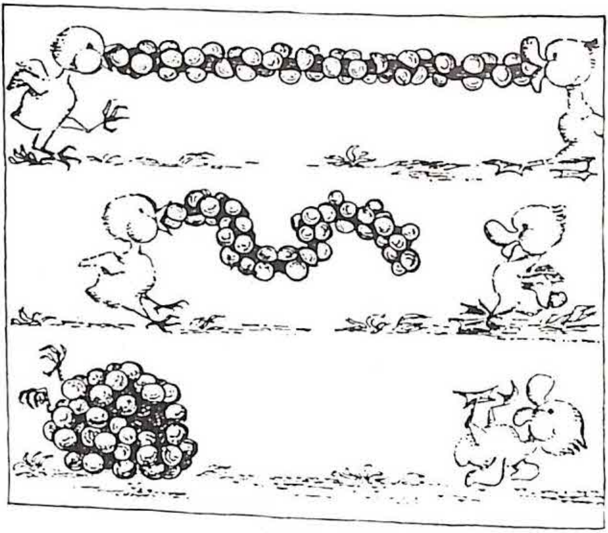
দীর্ঘশৃঙ্খল অণু মাত্রেই পলিমার নয় অর্থাৎ তাদের মধ্যে পৌনঃপুনিকভাবে একই পরমাণুপুঞ্জ নাও উপস্থিত থাকতে পারে। দুই বা ততোধিক পরমাণুপুঞ্জ দিয়ে অণু 'সাজানোর' বিদ্যা রসায়নবিদ্‌রা আয়ত্ত করেছেন। যদি পরমাণুপুঞ্জ-গুলি একটি নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা বজায় রেখে উপস্থিত থাকে, যেমন ABABABABAB, তাহলে তখনও অণুটিকে পলিমার বলা চলে। কিন্তু অনেক সময় এমন অণু নিয়ে কাজ করতে হয় যার মধ্যে এই ধরনের কোনো সুশৃঙ্খল বিন্যাস নেই। ABBBABABAAABBBBABABAABBA ধরনের বিন্যাস থাকলে কি কোনো অণুকে পলিমার বলা চলে? অবশ্য এটা ব্যক্তিগত পছন্দের উপর নির্ভর করে এবং নামকরণ সম্পর্কে ব্যক্তিগত পছন্দ সকলের একরম নাও হতে পারে।

প্রকৃতিজাত প্রোটিন অণুকে কদাচিৎ পলিমার বলা হয়। প্রায় কুড়ি রকম আলাদা আলাদা খণ্ডাংশ প্রোটিন অণুতে দেখা যায়। এই খণ্ডাংশগুলিকে বা গঠনের একককে অ্যামিনো অ্যাসিড মূলক বলা হয়।

প্রোটিন অণু আর বিশৃঙ্খলভাবে অনেকগুলি খণ্ডাংশ জুড়ে তৈরী করা সংশ্লেষিত অণুর মধ্যে একটি মূলগত প্রভেদ আছে। সংশ্লেষিত পলিমারের একটি নমুনার মধ্যে কোনো দুটি অণু অভিন্ন নয়। একটি অণুর শৃঙ্খলের মধ্যে বিভিন্ন খণ্ডাংশগুলি সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত থাকলে অপর অণুর মধ্যেও বিভিন্ন খণ্ডাংশগুলি বিশৃঙ্খলভাবেই বিন্যস্ত থাকবে কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রের বিশৃঙ্খলতা এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রের বিশৃঙ্খলতা অবিকল একরকম হবে না। এর ফলে পলিমারের ভৌতধর্মে সাধারণতঃ অপ্রীতিকর পরিবর্তন আসে। অণুগুলির নিজেদের মধ্যে সাদৃশ্য না থাকলে তাদের ভালোভাবে ঘনসন্নিবিষ্ট করা যায় না। নীতিগতভাবে এই ধরনের অণুগুলি কেলাস গঠন করতে পারে না, এরা অনিয়তাকার কাচে পরিণত হয়।

বিগত দশকে রসায়নবিদ্‌রা নিয়মানুগ (regular) পলিমার প্রস্তুত করতে শিখেছেন এবং তার ফলে শিল্পের জন্য বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে।

একটি নির্দিষ্ট প্রকৃতিজাত প্রোটিনের (যেমন ধরুন ষাঁড়ের হিমোগ্লোবিন) ক্ষেত্রে সব অণুগুলিই অভিন্ন, যদিও তাদের প্রত্যেকেই একই রকম বিশৃঙ্খলভাবে গড়া। কোনো নির্দিষ্ট প্রোটিনকে একটি বইয়ের পৃষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করা যায়, যার মধ্যে অক্ষরগুলি এলোমেলোভাবে ছড়ানো থাকলেও একটি বিশেষ নিয়ম



চিত্র 9.2

রক্ষা করে চলে। প্রোটিনটির সব অণুগুলিই বইয়ের একই পৃষ্ঠার অভিন্ন প্রতিলিপি ।

অণুর নমনীয়তা (Flexibility of Molecules) ঃ

দীর্ঘশৃঙ্খল অণুকে রেললাইনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। 0·1 mm দীর্ঘ একটি রেখার মধ্যে দশলক্ষ পরমাণু থাকতে পারে। পলিইথিলিন অণুর প্রস্থচ্ছেদ 3Å থেকে 4Å। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে একটি অণুর দৈর্ঘ্য তার প্রস্থের তুলনায় কয়েক লক্ষগুণ বড় হতে পারে। যেহেতু রেলগাড়ী চলার জন্য ব্যবহৃত রেললাইন সাধারণতঃ 10 cm চওড়া হয়, তাই উপরোক্ত অণুর সমান দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত বজায় রাখতে গেলে রেললাইনটির 10 km দীর্ঘ হওয়া প্রয়োজন।

অবশ্য তার মানে এই নয় যে, পলিমার অণু লম্বায় আরো ছোট হতে পারে না। বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে পলিমারের মধ্যে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের অণু দেখতে পাওয়া যায়, যাদের মধ্যে কয়েকটি পরমাণুপুঞ্জ দিয়ে গড়া অণু থেকে কয়েক হাজার পরমাণুপুঞ্জ দিয়ে গড়া অণু পর্যন্ত থাকে।

আমরা দীর্ঘ-শৃঙ্খল-অণুকে রেললাইনের সঙ্গে তুলনা করেছি। কিন্তু অন্য একদিক থেকে দেখলে তুলনাটি সঠিক নয়। রেললাইন বাঁকানো শক্ত কিন্তু অণুকে

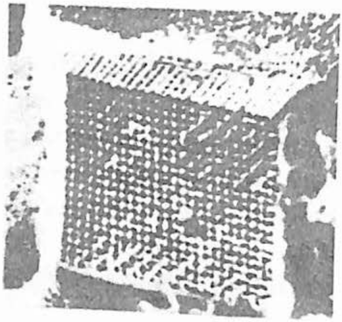
সহজেই বাঁকানো যায়। অতিকায় অণুর নমনীয়তা উইলোশাখার নমনীয়তার মতো নয়। অতিকায় অণুর নমনীয়তার কারণ অন্য সব ধরনের অণুতেও আছে ঃ অণুর একটি অংশ অপর অংশের সঙ্গে একযোজী বন্ধনে (single bond বা monovalent bond) আবদ্ধ থাকলে সেটি অপর অংশের চতুর্দিকে স্বচ্ছন্দে ঘুরতে পারে। সহজেই বোঝা যায় যে, উপরোক্ত ধর্মের জন্য অতিকায় অণুগুলি বিভিন্ন বিচিত্র আকার ধারণ করতে পারে। 9.2 চিত্রে একটি নমনীয় অণুর তিনটি বিভিন্ন আকারের প্রতিলিপি দেওয়া হল। কোনো অণুকে দ্রবণে প্রলম্বিত অবস্থায় রাখলে সেটি সাধারণতঃ বলের আকারে পাকিয়ে যায়।

একটি রবারের ফিতে প্রসারিত হতে পারে তার অণুগুলির কুণ্ডলী খুলে যায় বলে। সেই জন্য পলিমারের নমনীয়তা ধাতুর নমনীয়তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের। প্রসারিত অবস্থা থেকে ছেড়ে দিলে রবারের ফিতে আবার পূর্বের দৈর্ঘ্য ফিরে পায়। সুতরাং অণুগুলি তাদের সরলরৈখিক আকার ছেড়ে কুণ্ডলীবদ্ধ আকারে ফিরে যেতে যায়। কেন এমন হয়? প্রশ্নটির দুটি সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে। প্রথমতঃ শক্তিগত দিক থেকে বিবেচনা করে আমরা বলতে পারি যে, কুণ্ডলীবদ্ধ আকার সবচেয়ে সুবিধাজনক আকার। দ্বিতীয়তঃ আমরা অনুমান করতে পারি যে, কুণ্ডলীর আকার গৃহিত হলে এনট্রপি বেড়ে যায়। সুতরাং থার্মোডিনামিক্সের কোন নীতি উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যকে নির্ধারিত করছে ঃ প্রথম নীতি না দ্বিতীয়? নিঃসন্দেহে দুটোই। তবে কুণ্ডলীবদ্ধ আকার এনট্রপির পরিপ্রেক্ষিতে বেশী সুবিধাজনক। স্পষ্টতঃ অণুটি কুণ্ডলীবদ্ধ অবস্থায় থাকলে পরমাণু বিন্যাসে বিশৃঙ্খলার মাত্রা অণুটি সরলরেখার আকারে থাকলে যে বিশৃঙ্খলা দেখা যেতো তার চেয়ে বেশী। আর আমরা তো জানি যে এনট্রপি আর বিশৃঙ্খলা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত।

বটিকাকার কেলাস (Globular Crystals) ঃ

অনেক অণু গুটিয়ে গিয়ে কুণ্ডলীর আকার বা বটিকার আকার গ্রহণ করতে পারে। প্রোটিন অণু অভিন্ন আকারের পরিচ্ছন্ন বটিকা উৎপন্ন করে। এর একটি যুক্তিযুক্ত কারণ আছে। বাস্তবে প্রোটিন অণুর মধ্যে একটি অংশ জলকে 'ভালবাসে' কিন্তু অন্য অংশের ক্ষেত্রে জলের প্রতি বিতৃষ্ণা দেখা যায়। যে অংশ জল ভালবাসে না তাকে 'হাইড্রোফোবিক' (hydrophobic) অংশ বলে। প্রোটিন অণুর কুণ্ডলী পাকিয়ে যাওয়ার কারণ একটিই ঃ সব হাইড্রোফোবিক অংশই বটিকার মধ্যে লুকিয়ে থাকতে চায়। এজন্যই দ্রবণের মধ্যে প্রোটিন অণুগুলির চেহারা যমজ ভাইদের মতো অবিকল এক।

প্রোটিন বটিকাগুলি কমবেশী গোলকাকার। এক একটি বটিকার মাপ 100 Å থেকে 300 Å, যে জন্য এদের ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের (electron



চিত্র 9.3

microscope) সাহায্যে দেখতে পাওয়া যায়। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে প্রথম বটিকাকার কেলাসের ছবি তোলা হয়েছিল কয়েক দশক আগে, যখন ইলেকট্রন-মাইক্রোস্কোপের প্রযুক্তিবিদ্যা আজকের তুলনায় অনেক নীচুস্তরে ছিল। টোব্যাকো মজেইক ভাইরাসের (tobacco mosaic virus) ঐ রকম এক ছবি চিত্র 9.3-এর মধ্যে দেখানো হল। ভাইরাস প্রোটিনের চেয়ে অনেক বেশী জটিল, কিন্তু এই উদাহরণ আমাদের বক্তব্য প্রমাণ করার পক্ষে, অর্থাৎ জৈবিক বটিকাগুলি উচ্চমাত্রায় সুবিন্যস্ত থাকার প্রবণতা প্রদর্শন করার পক্ষে, সম্পূর্ণ উপযোগী।

কিন্তু লেখকেরা প্রোটিনের অনুচিত্র দেখালেন না কেন? উত্তর সহজ। প্রোটিন কেলাস খুবই অসাধারণ। তাদের মধ্যে জলের পরিমাণ অত্যধিক (অনেক সময় 90% পর্যন্ত)। এজন্য ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে তাদের অনুচিত্র তোলা অসম্ভব। প্রোটিন কেলাসকে কেবলমাত্র দ্রবণের মধ্যে রেখে পরীক্ষা করা চলে। একটি অতিক্ষুদ্র ফ্লাস্কের মধ্যে প্রোটিনের একটি একক-কেলাস দ্রবণের মধ্যে রাখা হয়। তারপর নমুনাটিকে এক্স-রশ্মি গঠন বিশ্লেষণ পরীক্ষা সমেত অন্যান্য ভৌত পদ্ধতির সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়।

অত্যধিক মাত্রায় জল—কলের জলের মতই সাধারণ জল—উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও বটিকাকার প্রোটিন অণুগুলি নিয়মানুগভাবে সুবিন্যস্ত থাকে। কেলাসের অক্ষ সাপেক্ষে তাদের বিন্যাস সব অণুগুলির ক্ষেত্রেই একই রকম। আমরা আগেই উল্লেখ করেছিলাম যে, সব অণুগুলিও অভিন্ন। এই উচ্চমাত্রার শৃঙ্খলাবদ্ধ বিন্যাস আছে বলেই প্রোটিন অণুর গঠন নির্ধারণ করা যায়। এ কাজ মোটেই সহজ নয়, তাই এই পরীক্ষার সাহায্যে হিমোগ্লোবিন আর মায়োগ্লোবিনের গঠন নির্ধারণ করার জন্য ম্যাক্স ফার্ডিনান্ড পেরুৎস (জন্ম 1914) আর জন কাউড্রে কেনড্রুকে (জন্ম 1917) নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

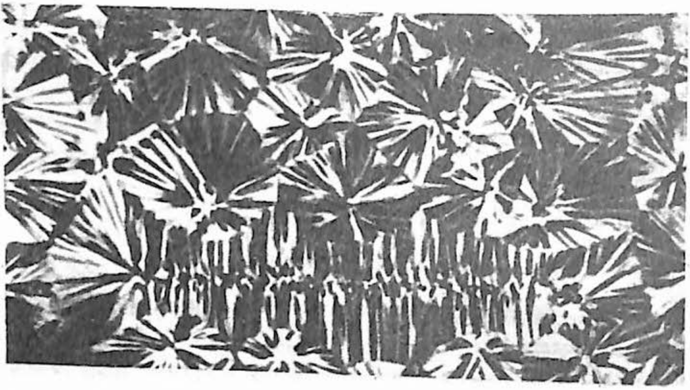
বর্তমানে প্রায় একশোটি প্রোটিন অণুর গঠন আমাদের জানা হয়ে গেছে। আরো গবেষণা চলছে। একটি জীবন্ত দেহে কমপক্ষে দশহাজার বিভিন্ন প্রোটিন আছে। জীবদেহের সক্রিয়তা নির্ভর করে প্রোটিনগুলি যেভাবে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে তার উপর এবং বিন্যাসের যে ক্রমে বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড মূলক অণুতে উপস্থিত থাকে তারও উপর। নিঃসন্দেহে গবেষণার কাজ আরও চালিয়ে যেতে হবে, যতদিন না জীবনের লক্ষণ নির্ধারণ করে যে দশহাজার বিভিন্ন অণু, তাদের গঠন সম্পর্কে সূক্ষ্মতম সমস্ত তথ্য আহরিত হয়।

অণুর জোট (Bundles of Molecules) ঃ

সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রসারিত করার পরেও অণুগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট থাকে এবং তারা একত্রিতভাবে যে পলিমার দেহ গঠন করেছে, তার মধ্যে বিভিন্ন জটিল কাঠামো উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই সব জটিল কাঠামোয় সবসময়ে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। সবরকম পলিমার দেহের মধ্যেই কম বা বেশী সংখ্যক এমন অঞ্চল খুঁজে পাওয়া যায়, যার মধ্যে অণুগুলি শক্তমুঠিতে ধরা এক বাণ্ডিল পেন্সিলের মতো জোটবদ্ধ অবস্থায় উপস্থিত থাকে।

পলিমার দেহে এই ধরনের জোটবদ্ধ অঞ্চলের শতকরা হার এবং প্রত্যেক জোটের মধ্যে উপস্থিত অণুগুলির বিন্যাসের শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করে পলিমারের মধ্যে কিছু পরিমাণ 'কেলাস বৈশিষ্ট্য' দেখা দেয়। অধিকাংশ পলিমারকেই সোজাসুজি নিয়তাকার (crystalline) কিংবা অনিয়তাকার (amorphous) হিসেবে গণ্য করা চলে না। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কেননা আমরা বিবেচনা করছি অতিকায় অণুর কথা এবং যারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্যের হয়ে থাকে। পলিমারের সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত (কেলাসবৈশিণ্ট্যসূচক) অংশের আকারকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ আঁটির আকার, উপগোলকের আকার এবং ভাঁজযোগ্য অণুর কেলাসের আকার (bundles, spherulites and crystals of folding molecules)।

চিত্র 9.4-এর মধ্যে একটি পলিমারের গঠন প্রদর্শিত হল। পলিপ্রোপিলিনের একটি ঝিল্লীর ছবি 400 গুণ পরিবর্ধিত করে ছবিতে দেখানো হয়েছে। তারকা-চিহ্নের মতো জায়গাগুলি কেলাসবৈশিষ্ট্যসূচক অংশ। পলিমারটিকে ঠাণ্ডা করার সঙ্গে সঙ্গে তারকাগুলির কেন্দ্র থেকে চতুর্দিকে উপগোলকগুলি গড়ে উঠতে থাকে। তারপর উপগোলকগুলি মিলিত হয়ে পরস্পরের বিকাশকে বাধা দেয়। সেইজন্য তারা পূর্ণাঙ্গ গোলকের আকার অর্জন করতে পারে না (আপনি যদি উপগোলকের বিকাশ সম্পূর্ণ করা দেখতে পেতেন তাহলে শেষ পর্যন্ত নজরে পড়তো একটি গোলক)। উপগোলকগুলির মধ্যে লম্বা লম্বা অণুগুলি

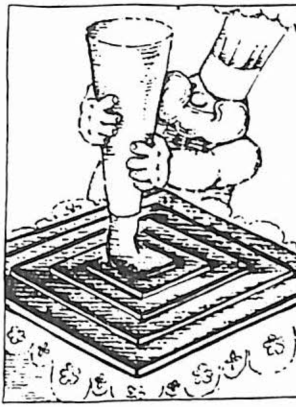


চিত্র 9.4

পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো থাকে। সম্ভবতঃ উপগোলকের সবচেয়ে কাছাকাছি চেহারা একটি কুণ্ডলীকৃত দড়ির। দড়িটি আঁটি বাঁধা অণুর প্রতিরূপ। সুতরাং অণুগুলির লম্বা অক্ষটি উপগোলকের ব্যাসার্ধের সঙ্গে লম্বভাবে থাকে। একই ছবিতে আমরা কতকগুলি 'পট্টল' বা পাট করা অংশও দেখতে পাচ্ছি। এগুলি আঁটিবাঁধা অণু দিয়েও তৈরী হয়ে থাকতে পারে কিংবা ভাঁজযোগ্য অণুর কেলাসও হতে পারে। এই ধরনের কেলাসের অস্তিত্ব সম্ভবতঃ পলিমারের গঠনের সবচেয়ে বেশী কৌতূহলোদ্দীপক এবং সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য তথ্যগুলির অন্যতম।

নিম্নলিখিত অনন্যসাধারণ আবিষ্কারটি হয় কুড়ি বছর আগে। দ্রবণ থেকে বিভিন্ন পলিমার জাতীয় বস্তুর কেলাস পৃথক করা হচ্ছিল। গবেষকরা অবাক হয়ে দেখলেন যে, বিভিন্ন প্যারাফিনের দ্রবণ থেকে একই আকৃতির, ঘোরানো সিঁড়ির মতো চেহারার, কেলাস পাওয়া যাচ্ছে। কেলাসের এরকম পাকা প্যাস্ট্রি-প্রস্তুকারকের হাতে তৈরী প্যাস্ট্রির মতো চেহারা হয়েছে কেন (চিত্র 9.5) ?

95 পৃষ্ঠায় কেলাস উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনার সময়ে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা উল্লেখ করিনি। মনে করুন একটি কেলাসের বিকাশশীল কোনো তল পরমাণু দিয়ে পুরোপুরি ভর্তি। এমন কোনো জায়গা খালি নেই যা নতুন পরমাণুকে যথেষ্ট জোরে আকর্ষণ করতে পারে। অনুরূপ ক্ষেত্রে হিসেবমতো বিকাশের গতি বাস্তবে যা দেখা যায় তার তুলনায় অনেক অনেক কম হতো। তত্ত্বের এবং বাস্তবের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের শেষ পর্যন্ত অবসান হল ঃ দেখা গেল যে, বিকাশশীল কেলাসে স্ক্রু-স্থানচ্যুতি থাকলে বিকাশের এই রকম দ্রুতগতি সম্ভব। যখন স্ক্রু-স্থানচ্যুতি থাকে তখন তলগুলি এমনভাবে বিকশিত

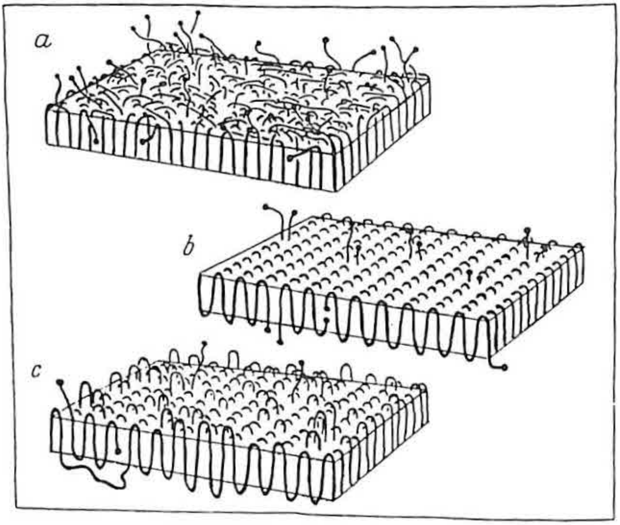


চিত্র 9.5

হয় যে, যে ধাপগুলিতে নতুন পরমাণু সহজেই সংযুক্ত হতে পারে সেগুলি কোনো সময়েই কেলাসের পার্শ্বরেখায় সরে এসে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না। স্ক্রু-স্থানচ্যুতি পদার্থবিদ্‌দের এইভাবে উভয়সংকট থেকে রক্ষা করায় তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। বিকাশের গতির সমস্যা যেমন পরিষ্কার হয়ে গেল তেমনি উদ্ঘাটিত হয়ে উঠল প্যারাফিনের ঘোরানো-সিঁড়ি বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ। এই ধরনের প্যাঁচানো পিরামিড অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় এবং তাদের অস্তিত্বে অবাক হওয়ার কিছুই নেই।

কিন্তু অবাক হওয়ার কিছু নেই যখন আমরা ছোট ছোট অণু দিয়ে গড়া কেলাসের কথা বিবেচনা করি। এই ধরনের কেলাসের ক্ষেত্রেই উপরোক্ত ব্যাখ্যা পুরোপুরি প্রযোজ্য : অণুর মাপ, ধাপগুলির উচ্চতা এবং কেলাসের বেধ এমন মানের যারা পরস্পরের বিরোধিতা করে না।

কিন্তু যখন পলিমারের ক্ষেত্রেও কেলাস বিকাশের একই রকম ছবি দেখতে পাওয়া যায় তখন প্রথমে ধাঁধার সৃষ্টি হয়। বস্তুতঃ পলিএস্টারের একটি স্তরের বেধ 100 Å থেকে 120 Å এবং অণুগুলির দৈর্ঘ্য 6000 Å। উপরোক্ত তথ্য থেকে কি সিদ্ধান্ত টানা যায়? কেবলমাত্র একটি ব্যাখ্যাই যুক্তিগ্রাহ্য : এই সব কেলাসে অণুগুলি ভাঁজ করা অবস্থায় থাকে। অণুগুলির নমনীয়তার জন্য তাদের সহজেই ভাঁজ করা যায়। বাকী থাকে শুধু চিত্র 9.6-এ প্রদর্শিত তিনটি নক্‌শার মধ্যে সবচেয়ে বেশী উপযুক্তটিকে বেছে নেওয়ার জন্য চিন্তাভাবনা করা (এই রকম চিন্তাভাবনা আজকের দিনেও করা হয়)। নক্‌শাগুলির মধ্যে যেটুকু পার্থক্য তা গৌণ চরিত্রের। কিন্তু এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ সঙ্গে সঙ্গে



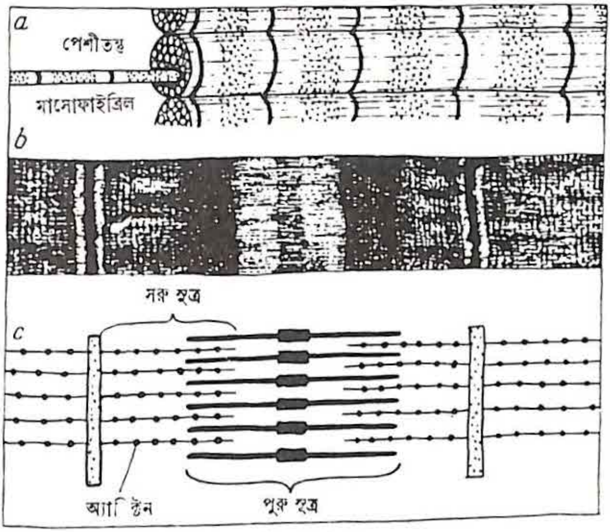
চিত্র 9.6.

আপত্তি করবেন। বলবেন, "কি করে পার্থক্যকে গৌণ চরিত্রের বলছেন ? উপরের নক্শায় এক একটি অণু এলোমেলোভাবে প্রতিবেশী অণুদের ডিঙিয়ে ভাঁজ হয়ে আছে ; দ্বিতীয় নক্শায় একটি অণুই বারেবারে ভাঁজ হয়ে নিজের প্রতিবেশী তৈরী করেছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নক্শার মধ্যে তফাত এই যে, মধ্যের কেলাসটির তল নীচের কেলাসটির তুলনায় বেশী মসৃণ।"

বিশেষজ্ঞই সঠিক ঃ পলিমার অণুগুলির ঘনসন্নিবিষ্ট হওয়ার প্রণালীর তাৎপর্য অপরিসীম এবং তা বস্তুটির ধর্মকে মৌলিকভাবে প্রভাবিত করে। যদিও পলিইথিলিন, নাইলন এবং ঐ জাতীয় পদার্থ, বেশ কয়েক দশক আগে সংশ্লেষিত হয়েছিল, তবু তাদের অধিআণবিক (supramolecular) গঠন সম্পর্কে পর্যালোচনার এবং অণুগুলিকে ঘনসন্নিবিষ্ট করার পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণার কাজ আজকের দিনেও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা চালিয়ে যাচ্ছেন।

মাংসপেশীর সঙ্কোচন (Muscular Contraction) **ঃ**

অতিকায় অণু জীবদেহের মধ্যে কিভাবে ব্যবহার করে তা প্রদর্শন করার জন্য একটি উদাহরণ দিয়ে আমরা অতিকায় অণু সম্পর্কে আমাদের আলোচনা শেষ করবো।



চিত্র 9.7

জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, কার্যকরী প্রত্যঙ্গগুলির আকৃতির (যেমন হাতের আকৃতি কিংবা পাতার আকৃতি) সঙ্গে তাদের কার্যের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা তাঁদের অন্যতম কর্তব্য।

পদার্থবিদ্‌রা জীবদেহের মধ্যে যে সব প্রক্রিয়া চলছে সেগুলিকে পরীক্ষা করার জন্য বস্তুর গঠন এবং প্রাকৃতিক সূত্র পরীক্ষা করার পদ্ধতিগুলি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং আণবিক স্তরে জীবনকে বোঝাবার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। আধুনিক যুগে জীবকলার (tissue) গঠন খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করা যায়। একবার গঠনের প্রশ্নটি পরিষ্কার হয়ে গেলে, জীব-বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াগুলির নক্‌শা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়ে উঠবে।

মাংসপেশী সঙ্কোচন সম্পর্কে তত্ত্ব এই বিভাগে এক তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি। জীবকলা দুধরনের তন্তু দিয়ে তৈরী : একটি সূক্ষ্ম অন্যটি স্থূল (চিত্র 9.7*a*)। স্থূল তন্তুগুলি মায়োসিন নামে পরিচিত প্রোটিন অণু দিয়ে তৈরী। পদার্থবিদ্‌রা প্রমাণ করেছেন যে, মায়োসিন অণুগুলির চেহারা দণ্ডের মতো যার প্রান্তগুলি মোটা। স্থূল তন্তুগুলির মধ্যে মাঝামাঝি জায়গায় অণুগুলি তাদের মোটা লেজের সাহায্যে বাঁধা থাকে (চিত্র 9.7*c*)। সূক্ষ্ম তন্তুগুলির মধ্যে থাকে অ্যাক্‌টিন (actin), যার গঠন দুটি দানাভরা সুতো দিয়ে তৈরী ডবল

হেলিক্সের (double helix) মত। স্থূল তন্তুগুলি পিছলে হেলিক্সের মধ্যে চলে এলে মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয়।

মাংসপেশী সঙ্কোচন কৌশলের সব খুঁটিনাটি জানা গেছে, কিন্তু আমরা তা এখানে আলোচনা করতে চাই না। মাংসপেশী সঙ্কোচনের সঙ্কেত আসে স্নায়ু থেকে। সঙ্কেতের আবির্ভাব হলে ক্যালসিয়াম পরমাণু মুক্ত হয় এবং তারপর তন্তুর এক অংশ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে অন্য অংশে আসে। ফলে অণুগুলি পরস্পরের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং শক্তি পরিমাপের পরিপ্রেক্ষিতে এক সারি অণুর অন্য এক সারি অণুর মধ্যে পিছলে ঢুকে যাওয়ার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। চিত্র 9.7-এ গঠনের দুইটি নকশার মধ্যে একটি ইলেকট্রন ফটোমাইক্রোগ্রাফের অনুকৃতিও (চিত্র 9.7*b*) সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

আমার আশঙ্কা, মাংসপেশী সঙ্কোচন কৌশল সম্পর্কে বিশদভাবে যে গবেষণা চালানো হয়েছে, আগের কটি পৃষ্ঠার আলোচনার সাহায্যে পাঠকেরা সে সম্পর্কে খুবই সামান্য ধারণা গড়ে তুলতে পারবেন। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র পাঠকদের কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত করা। যদি চান, এই বইটির শেষ পৃষ্ঠায় আলোচিত বিষয়বস্তুকে, “পদার্থবিদ্যা—সকলের জন্য” সিরিজে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে এমন একটি নতুন বইয়ের মুখবন্ধ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন, যে বইয়ের মধ্যে জৈবিক পদার্থবিদ্যা (biological physics) সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
USSR, 129820, Moscow, I-110, GSP,
Pervy Rizhsky Pereulok, 2, Mir Publishers

FOR ACQUIRING MIR BOOKS, PLEASE CONTACT

10.25

সকলের জন্য পদার্থবিদ্যা